রবীন্দ্রনাথকে স্মরণের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর রচনাবলী পাঠ। প্রতিবারের মতো এবারও ১লা মে থেকে এক পক্ষ কাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে (আট ভাগের একভাগ কম দামে) রবীন্দ্রনাথের যে কোনো বই পাওয়া যাবে। সিগনেট বুকশপে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

আমরা মনে করি—কবির জন্মদিন উপলক্ষ্য করে সাধারণভাবে বাংলা কবিতার অন্যান্য গ্রন্থও এই সময় সংগ্রহ করা যায়। কেননা রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই বাংলা কবিতার আবর্তন। এবং বাংলা কাব্যের সচল ধারাকে রক্ষা করাও ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করা। কবিপক্ষে সিগনেট বুকশপ থেকে নিম্নলিখিত কবিদের অধিকাংশ গ্রন্থও এক অষ্টমাংশ কম মূল্যে বিক্রয় করা হবে : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অবিনাশ রায়, অমিয় চক্রবর্তী, অশোকবিজয় রাহা, অসীম রায়, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কৃষ্ণদাস আচার্যচৌধুরী, গোলাম কুদ্দুস, জগন্নাথ চক্রবর্তী, জসীমউদ্দীন, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, জীবনানন্দ দাশ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, নরেশ গুহ, পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মোহিতলাল মজুমদার, মৃণালকান্তি দাশ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, রাম বসু, রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যম ভট্টাচার্য, সমর সেন, সরযূপতি সিংহ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, সুশীল রায়

বৈশাখ : : ১৩৫৯

একবিংশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ চতুর্থ সংখ্যা

শান্তি-সংস্কৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	গোপাল হালদার	১
কবিতাগুচ্ছ	অরুণ মিত্র	১১
	অজিত দত্ত	
	ইকবাল	
	মৃগাঙ্ক রায়	
	শঙ্খ ঘোষ	
	মূর্তজা বশীর	
	রাম বসু	
পরিচয়-এর কুড়ি বছর	হিরণকুমার সান্যাল	২০
নূতন চীনের সংস্কৃতি	নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৩
'কল্লোল' যুগ ও অচিন্ত্যকুমার	অচ্যুত গোস্বামী	৪২
ভারতের জাতিসমস্যা ও তাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ	সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৪৮
শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের উপন্যাস	সুধীরচন্দ্র রায়	৫৬
মৃত্যু-প্রসঙ্গে সুকান্ত	অরুণাচল বসু	৭১
রাজধানীর কাহিনী	অনামী	৭৬
হীরা (গল্প)	আরাতাও সার্ঠে	৮০
বৃষ্টির গান	সলিল চৌধুরী	৯৮
সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী	অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০২
	যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	
	অতুল বসু	
	প্রভাতকুমার দত্ত	
এসো শান্তির জন্যে	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১১৭

প্রচ্ছদপট : মুর্শিদাবাদের রেশমী বালুচর শাড়ি থেকে, আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে প্রাপ্ত

ছবি : পিকাসো, গোপাল ঘোষ, সূর্য রায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়,

ফোটো : হিরণকুমার সান্যাল

●

সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস, ৭৭।১ সিমলা স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত ও ৯১, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।
কার্যালয় : ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

গোপাল ঘোষ

সূর্য রায়

হিরণকুমার সান্যাল

একবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড,
নববর্ষ সংখ্যা: বৈশাখ, ১৩৫৮

শান্তি-সংস্কৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

গোপাল হালদার

নব-প্রতিষ্ঠিত "নিখিল ভারত শান্তি-সংস্কৃতি সমিতি" (অল ইণ্ডিয়া কালচারাল কমিটি ফর্ পীস্) এবারকার পঁচিশে বৈশাখ (৮ই মে, ১৯৫১) রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালনের জন্য ভারতের সংস্কৃতি-সেবীদের নিকট আবেদন করেছেন। সমিতির দিক থেকে এই তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠান। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

এই পৃথিবীতে যখন 'সভ্যতার সংকট' আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, আণবিক অস্ত্র সভ্যতার নিয়মে ধিক্কৃত নয়, জীবাণুযুদ্ধও সভ্যতার বিধিবিধানে অস্বীকৃত হয় না, তখন শুধু একবার নয়, বারবার স্মরণ করবার দিন এসেছে শাশ্বত কালের এই সত্য—"কবিরাই, শিল্পীরাই পৃথিবীর বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা, শ্রেষ্ঠ শাসক পৃথিবীর।" রাজা-রাজড়াদের কীর্তি ও অকীর্তি তো প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রপরিচালকদের কূটনৈতিক কারবারের নৌকা লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের যে সম্ভারে জাতির জীবন-ঘাটা বোঝাই করে তোলে বা যেভাবে অতলে তলিয়ে দেয় জাতির ভাগ্য, তা-ও ইতিহাসে অগোচর নয়। কিন্তু বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক যাত্রাপথে কীইবা তাদের কীর্তি ও অকীর্তি? সমস্ত ইতিহাসের মহৎ সাক্ষ্য এই—'তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে।' সেই ছন্দটি কবির দান, তাতেই মানুষের যাত্রাপথ সানন্দে স্বীকৃত; জীবনের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক সৃষ্টিতে উজ্জ্বল, নব নব অনুরাগে নবায়মান। "কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা"।

"কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সজ্জিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি।"

সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের মানুষ ভালোবেসেছে শান্তি। এ-দেশের মানুষকে

এ-দেশের কবি ও কলাকার সেই পরিচ্ছন্ন বিধানেই জীবনকে স্বীকার করতে শিখিয়েছেন, যে-বিধানের মূল সত্য—শান্তম্, শিবম্, সত্যম্। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিধানের স্বীকৃতির সঙ্গে তার বিকৃতির অভাব নেই। শান্তি, শিব ও সত্য তাদের নিকট বিশেষ করে একটা পারমার্থিক সাধনা হয়ে উঠেছিল, ততটা সমাজের বাস্তব আদর্শ হয়ে ওঠেনি। তাই তো এই ইতিহাস এমন ট্রাজিডির বেদনায় মর্মান্তিক। কিন্তু তাই বলে এই বিধান মিথ্যা নয় যে, সমাজে ও জীবনে শান্তি, কল্যাণ ও সত্য মানুষের পরম আশ্রয়; তারই বনিয়াদে ভারতে রচিত হয়েছে মানবিকতার সাধনা।

সভ্যতার ট্রাজিডিও আজ কম ভয়ঙ্কর নয়। তাই এই সভ্যতার মধ্যখানে যে শাশ্বত বিধান তার কবি আর ভাবুকেরা রচনা করে গিয়েছেন—যে-বিধানকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে তার সৃষ্টি—সত্যম্, জ্ঞানম্, আনন্দম্, বিশ্বভুবন-জোড়া মানুষের এই প্রকাশের রাজ্য—সেই বিধানকে আজ কবির কাব্যে, বৈজ্ঞানিকের তপস্যায়, কর্মীর সাধনায় সকল দিক দিয়ে স্বীকার করার আয়োজনও সভ্যতারই দায়ে পরম প্রয়োজন। কবি, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব এই জ্ঞানকে, কল্যাণকে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আপন আপন সাধনায়, আর মানুষের মানবত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা সভ্যতার সকল বিকৃতির ঊর্ধ্বে। এ-যুগে মানুষের এই মহৎ নিয়তিকে এমন করে কে আর অভিনন্দিত করেছেন এই 'পঁচিশে বৈশাখের' শুভ-জাতক রবীন্দ্রনাথের মতো?

পঁচিশে বৈশাখ তাই ভারতের কেন, পৃথিবীরই পক্ষে শান্তি-সংস্কৃতির এক মহোৎসবের দিন।

(১)

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের নাম 'শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথের স্ব-রচিত সাধনপীঠ 'বিশ্ব-ভারতী'—'যত্র বিশ্বঃ ভবত্যেকনীড়ম্'—রবীন্দ্র-সাধনার এই দিকটি নিতান্ত অবান্তর বা আকস্মিক নয়। কবির প্রত্যেকটি মহৎ আয়োজন ও মহৎ পরিকল্পনায় এই শান্তির বাণী, মানুষে মানুষে মৈত্রীর বোধন সুস্পষ্ট। তার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। কি বিশ্বলীলায় বিমুগ্ধ কবি হিসাবে, কি কর্ম-কঠিন সংসারের মানুষ হিসাবে, তিনি সৃষ্টিকেই আপনার ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন। যা-কিছু ধ্বংস-সাধক, যা-কিছু বিকৃত, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী মনের বিরাগ প্রকৃতিগত। সুস্থ সৃষ্টিশীল সকল মানুষের পক্ষেই তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রকৃতিগত বিরাগ কবির সচেতন

সাধনায় ও জীবনদর্শনেও পরিণত হয়েছিল—সে-ইঙ্গিতও আছে তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে, 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাতেও তা সুস্পষ্ট।

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুভব করেছিল 'একটি অখণ্ড তাৎপর্য'। "যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেন না এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই।" আসলে এ শান্তি পূর্ণাঙ্গ নয়, এ দৃষ্টিও সম্পূর্ণ নয়। মাতৃগর্ভের শিশু মায়ের সত্তাতেই সত্তাবান থাকে, আপন সত্তায় নয়; এও তেমনি—প্রকৃতিলীন ও নিশ্চেতন রসতন্ময়তা। মাতৃগর্ভ ছেড়ে সেই মানব-শিশু কিন্তু ভূমিষ্ঠ হয় বিশিষ্ট হয়, হয় নতুন প্রাণ। সে-পর্বকেও রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, "এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা।...এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।" তখনো সেই শিশু-সত্তা জানে না আপন বৈশিষ্ট্যকে; সে তখনো প্রকৃতির লীলাসহচর মাত্র—সৃষ্টির দ্বৈতলীলার সহকারী নয়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে প্রায় 'চিত্রা' পর্যন্ত কবি এমনি লীলাবিমুগ্ধ কবি-কিশোর।

অবশ্য প্রকৃতির বুকে এই যে শান্তি বিরাজমান, এ শান্তির অর্থ নিস্তব্ধতা নয়, নিশ্চলতা নয়,—সে বিরাট নদী চির-চঞ্চল, আর সেই আলোড়িত বস্তু-পুঞ্জকে ছেয়ে আছে বিরাট সুষমা (হার্মনি)। এই গতিময় বিশ্বে শান্তির অর্থ তাই গতির স্বাচ্ছন্দ্য, সুষমা। শিশু-প্রকৃতি তারই সহজ আস্বাদনে স্বচ্ছন্দ।

কিন্তু এই বিশ্ব-সুষমার মধ্যে মানুষ এক সচেতন ও সক্রিয় শক্তি। মানুষের উপরে তাই একদিকে দাবি নিখিল বিশ্বের—প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য নবায়মান সামঞ্জস্যে তার কর্ম ও চেতনা সার্থক হোক, হোক মানুষ সৃষ্টির প্রত্যক্ষ সহযোগী। অন্যদিকে তার ওপর দাবি মানুষের আপন জীবনগতির—তার আপন কর্ম ও চেতনার সংযোগে মানুষের গতিপথ হোক স্বচ্ছন্দ; আত্মক্ষয় ও আত্মঘাত থেকে মানুষ মুক্ত করুক আপনাকে, শান্তিতে সুষমায় তার সৃষ্টিশক্তি লাভ করুক অখণ্ডিত প্রকাশ। সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে এই দাবিরই ক্রম-পরিপূরণ চলেছে, কিন্তু সেই মহৎ পরিণতি এখনো মানুষের অনায়ত্ত। মানুষের ইতিহাস এখনো আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বে খণ্ডিত; তাই মানুষ আসলে এখনো তার প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—যেখানে বাধা-বিঘ্নে জীবনের গতি অস্বচ্ছন্দ, সৃষ্টিপদে পদে খণ্ডিত।

এই খণ্ডিত প্রয়াসের স্বরূপ মানুষের সংসারে বাস করে কবি-প্রাণ আরও তীব্রতর ও গভীরতর করেই অনুভব করে। প্রকৃতির সুষমা-সুন্দর রূপও কবিকে মানুষের সংসারের এই সাধারণ ভালোমন্দময় দ্বন্দ্ব ভুলিয়ে দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তাই শেষ হয়ে গেল 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা'। 'এবার ফিরাও মোরে'—প্রকৃতির লীলাসহচর কবি সেদিন প্রার্থনা করলেন তাঁর কবি-নিয়তির কাছে,—'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'। কিন্তু তখনো সে কষ্টের স্বরূপ কি তিনি উপলব্ধি করেছেন? সে-কবিতা পাঠ করলে সন্দেহমাত্র থাকে না তাঁর আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতায়, কিন্তু সন্দেহ থাকে তাঁর কবি-দৃষ্টির স্বচ্ছতায়। তথাপি 'আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি'। মানুষের এই ব্যবহারিক জগতে না দাঁড়িয়ে কোন মানুষেরই উপায় নেই। এই সংঘাতের মধ্যে না দাঁড়ালে কবি-প্রতিভার আরও মুক্তি অসম্ভব। 'আঘাত সংঘাতে'র এই অভিজ্ঞতায় কবি-চিত্ত নব-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারল। তাঁর স্বকীয় ধর্মস্মৃতিতে এ-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিবম্-এর বোধ: "বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে ঐক্যটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্; সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না, এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।"

এই 'শিবকে জানার বেদনা'—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির পক্ষে প্রথমাবধি অবশ্য তত সহজ ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন এই বেদনায় তাঁর কবিপ্রকৃতি প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। 'এখন থেকে দ্বন্দ্বের, দুঃখ বিপ্লবের আলোড়ন'—এই 'নতুন বোধের অভ্যুদয়'। রবীন্দ্র-কাব্যে এই পর্বের দান ভাবে ও ছন্দে ঐশ্বর্যময় অথচ সর্বাধিক মাধুর্যাভিষিক্ত।

কিন্তু এখানেও একটি অস্পষ্টতা রয়েছে। কবি-চেতনা বিশ্বজোড়া ইতিহাসের মধ্যে 'পাগলের' নৃত্য দেখে গতিবিমুগ্ধ আপনাকে তখনো সান্ত্বনা দিতে চান—সে পাগল ভয়ঙ্কর। 'সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জলিয়া উঠে।" ভয়ঙ্করের এই স্বীকৃতির মধ্যে—এমন কি 'পাপের' এই আবিষ্কারের মধ্যে কবিচিত্তের যতখানি বেদনাবোধ আছে, ততখানি বিরোধিতার শপথ

তখনো নেই। কারণ, কবি জানেন, "এই 'খ্যাপা দেবতার' যখন পরিচয় পাই তখন রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।" অবশ্য 'বলাকা'র কাল থেকে আরম্ভ করে 'পুরবী' ছাড়িয়ে এ-বোধ ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিশ্বনৃত্য আর সহজ নেই। তাই ক্রমেই আর অত সহজে কবিচিত্তে তার প্রকাশও জেগে উঠতে পারল না—সত্য সত্যই যখন মানুষের মধ্যে এই পাপ অসাধারণ আকারেই ক্রম-প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রতিভাও দিনের পর দিন স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল 'শান্তম্, শিবম্, সত্যম্'-এর গতি-পথ জীবন-যাত্রায় স্বচ্ছন্দ নেই, মানুষের ইতিহাস-মধ্যে 'শিবকে' এই দিনে অতি সহজে আয়ত্ত করবার অবকাশ নেই—অন্তত সে-মানুষের নেই যে মানুষের দরদী, এবং কবি হিসাবে সৃষ্টিকে যে জানে জীবনধর্মরূপে। কারণ, নিখিলকালে যাই সত্য হোক, অতি সত্য এই যে, আজ সভ্যতার সংকট-মুহূর্ত।

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গ-মন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

মনুমেণ্টের বেদিতলে নিয়ে দাঁড় করাল কবিকে হিজলির বন্দিশালার নিরস্ত্র বন্দিহত্যার প্রতিবাদে—

একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরি—

অন্তর মথিত করে জাগল 'প্রশ্ন':

ভগবান্, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে…
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

অতি সহজ ছিল যাঁর নিকটে একদিন এই সত্য—'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি অকুণ্ঠিত অন্তরেই স্বীকার করলেন,

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি !…

দেখলেন—

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,—
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

সেই অম্ল-রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ জানালেন :

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি—

ইতিহাসের মহৎ সত্য সেদিন সৃষ্টি-সন্ধ কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল : 'ওরা কাজ করে'।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।

যে-রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ বালকের মতো 'খেলিবার বাঁশি' নিয়ে বিশ্বজোড়া শান্তি-সুষমায় আপনার কবি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন, অশীতি বৎসরে পরিনির্বাণের মুখে এসে তিনি রেখে গেলেন তাঁর মোহভঙ্গের খেদ আর তাঁর শেষ আশ্বাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখে :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব,...আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

সেই 'শান্তম্' আর নেই, আছে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। মানুষের প্রতি বিশ্বাসও বুঝি টেঁকে না? কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই বিশ্বাসের বনিয়াদ—'ওরা কাজ করে'। অপরাজিত মানুষের অভিযান। বিশ্ব-সংকটের মধ্যে দিয়েও রূপায়িত হচ্ছে মানুষের এই অভিযান:

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।...

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে শান্তির আদর্শ এইরূপে ব্যক্তি-জীবন ও ধ্যান-লোকের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে ও বাস্তব সাধনায় মূর্ত হতে চেয়েছে। তাঁর কল্পনামুগ্ধ অধ্যাত্ম-চেতনা সুপ্রশস্ত মানবিকতায় এভাবে শেষ অবধি সংহত হয়েছে।

(২)

রবীন্দ্রনাথের নিকটে তাই শান্তি শুধু যেমন নিষ্ক্রিয় আদর্শ বা অধ্যাত্ম-চেতনা নয় তেমনি মাত্র একটা নেতিবাচক আদর্শ বা যুদ্ধবিরতিও নয়। শান্তি যুদ্ধের সর্বপ্রকার কারণ থেকেও বিরতি, শান্তি মানুষের মানবিকতার স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি। মানুষে মানুষে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের পথে যা-কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করছে—হোক তা জাতির, হোক তা বর্ণের, হোক তা ধর্মের, হোক তা অর্থের—রবীন্দ্রনাথের মতে তা-ই অশান্তির হেতু। এ সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামই মানবিকতার সংগ্রাম, আর তা-ই রবীন্দ্রনাথের শান্তি-সংগ্রাম।

স্বভাবতই এই সংগ্রাম অনির্দেশ্য ভাববাদ মাত্র নয়। জীবনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যারূপে তিনি যার সম্মুখীন হয়েছেন, সুনির্দিষ্ট বাণীতে তিনি তাঁর বিরোধিতাও করেছেন।

ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সহজভাবেই রবীন্দ্রনাথের শান্তি-সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে প্রথমত ইওরোপীয় সভ্যতার পররাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ তার করাল নখদংষ্ট্রা নিয়ে তখন দেখা দিয়েছে ভারতে, চীনে, পারস্যে, নিগ্রোজাতির বিরুদ্ধে তার জঘন্য অত্যাচারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তখনো কবির চোখে অনেকাংশে একটা জাতীয় দম্ভ মাত্র। অবশ্য বুয়র যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি বুঝেছেন 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'। তবু সেই স্বার্থের স্বরূপ তাঁর নিকট সুপরিচিত নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের দিনে তাই 'বলাকা'র যুগেও তিনি আশা পোষণ করেছেন মানুষের

সমুত্থানের। 'ন্যাশনালিজমের' বক্তৃতাবলীতে দেখা যায় একটি সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট—জাতীয়তা আপনার উৎকটতায় কেমন করে সাম্রাজ্যবাদিতায় পরিণত হয়। কিন্তু তখনো তাঁর নিকট স্পষ্ট নয়—বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের যোগাযোগ, শোষণ ও শাসনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম'-এর মূল তত্ত্ব। সে-তত্ত্ব তখনো কবির নিকট কেন, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতিবিদদের নিকটও অজ্ঞাত। কিন্তু সোভিয়েটের জন্মে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এ-তত্ত্ব ক্রমে বিস্তার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও তা গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেন নি—তা তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি', নোগুচির নিকট লেখা চিঠি এবং মিস্ র‍্যাথবোনের নিকট লেখা চিঠি থেকে স্পষ্ট। অবশ্য এ-কথা তিনি পূর্বাপরই উপলব্ধি করেছিলেন যে, যতক্ষণ সাম্রাজ্য-স্বার্থ প্রবল থাকবে ততক্ষণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংগ্রামও থাকবে; ততক্ষণ স্বাধীনতা-কামী জাতিদের মুক্তি-সাধনাও নিষ্কণ্টক নয়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের অর্থই যুদ্ধ—শান্তির অপমৃত্যু। "মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ব্যাপ্ত তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের (যুদ্ধের) নিবৃত্তি হবে না।"

পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে বা স্বাধীনতার সংগ্রামকে কখনো তাই শান্তির প্রতিকূল বলেও জানেন নি। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' দেখে তিনি ক্ষুব্ধ। কিন্তু আনুষ্ঠানিক অহিংসাবাদ ও প্যাসিফিজমেও তাঁর আস্থা নেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যে বিশেষ পথটি গ্রহণ করতে চেয়েছেন সেটি বিশেষ করে আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথ, আবেদন-নিবেদনের পথ নয়; সৃষ্টিমূলক জাতীয়সাধনার পথ, ধ্বংসমূলক বিদ্রোহের পথ নয়। এ রাজনীতিকে বলা যায় সৃষ্টিমূলক রাজনীতি 'ক্রিয়েটিব্ পলিটিক্স্।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহকে—ভাঙার দিককেও—গৌণ বা ভ্রান্ত মনে করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এ রাজনীতি পরবর্তীকালের 'গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্ম-তালিকা' থেকে স্বতন্ত্র-জাতের—আদর্শেও বটে, পদ্ধতিতেও বটে তা স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর মধ্যযুগের সামন্ত আচার-নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তিনি 'মানুষের অধিকারে' (রাইটস অব ম্যান'-এ) বিশ্বাসী। তাই নারীর অমর্যাদা, নিম্নবর্ণের অমর্যাদা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—এ সবই তাঁর বিবেচনায় ঠেকেছে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ; আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। শুধু তাই নয়, তিনি আধুনিক যুগের

শিল্পবিজ্ঞানে আস্থাশীল, বিজ্ঞানের দানে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। অথচ এ সত্ত্বেও প্রাচীনের মোহ তাঁর মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল, তা নয়। প্রথমত, তিনি মনে করতেন ভারতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লী-সমাজের (ভিলেজ কমিউনিটি-র) ভিত্তিতেই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, তিনি বুঝতে চান নি যে, এ-দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় শুধু সামন্তবাদী কুসংস্কার (জাতিভেদ, নারীর অপমান, আচার-নিয়মের দাসত্ব, ইত্যাদি) নয়, সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থাও—কৃষকের বিপ্লবেই ভারতীয় বিপ্লব সমারব্ধ হতে পারে। তৃতীয় একটা অর্ধসত্য ধারণাও তাঁর অনেকদিন ছিল—ভারতের মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তারা নির্জিত। "সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে আছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতি, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই।" কিন্তু পরবর্তীকালে এ-সত্য তিনি বুঝেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ এই সামন্তযুগের অশিক্ষা-কুশিক্ষাকে পোষণই করে, তা-ই তার স্বার্থ।

ফ্যাশিজমের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনদর্শন আরও বেশি বাস্তব ও স্বচ্ছ হয়ে উঠতে বাধ্য হল। আর ঠিক সেই দিক থেকেই সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শন করে তাঁর সেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানবিকতা আরও বেশি দৃঢ় আশ্রয়ের সন্ধান পেল। তিনি রাশিয়ার মানব-প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে দেশে ফিরে এলেন ;—বুঝলেন মানুষের ইতিহাসে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছে। সে অভ্যুদয় শুধু 'মানুষের' নয়,সাধারণ মানুষের। তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্যের সংশয়জাল ছিন্ন করে অবশ্য তিনি গর্কী বা রোলাঁর মতো নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না ইতিহাসের এই 'নবজাতক'কে—সবল কণ্ঠে ডাক দিতে পারলেন না এই সাধারণ মানুষকে সভ্যতার উত্তরসাধকরূপে। জানলেন 'ওরা কাজ করে' ; জানলেন না--ওরা আর সভ্যতার ভার-বাহক মাত্র নয়, ওরাই সভ্যতার আজ উদ্ধারকর্তাও। তাই, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"—এই স্বীকৃতির মধ্যে যে-সংশয় আছে তা তিনি অতিক্রম করলেন মহামানবের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে—

ঐ মহামানব আসে···

এ মহামানব আসলে পৃথিবীর সাধারণ মানব—সেই যারা কাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে এ কথা ঘোষণা করতেও রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আর দ্বিধা থাকত না—যখন তিনি দেখতেন

এশিয়ার দেশে দেশে এই মুক্তি-সংগ্রামের প্রসার, তাঁর অতি-শ্রদ্ধার চীনে পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা, পূর্ব ইওরোপের বহু বিপর্যস্ত জগতে অবশেষে মানুষের মুক্তি ;—আর দেখতেন রবীন্দ্র-দর্শনের ছাত্র অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মতো পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জুড়ে 'সাম্যবাদের সৃষ্টি-পরিকল্পনা', এবং দেখে বুঝতেন সভ্যতার সংকট-মুহূর্ত অবশেষে বিশ্বশান্তির উদ্যোগ-মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ;—জগতের সাধারণ মানুষ আজ সত্যই অগ্রসর তার 'মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে'। সেইখানে তারাই এই শান্তি-সংগ্রামের প্রথম যোদ্ধা ও কবির সৃষ্টি-সাধনার প্রধান উত্তরসাধক।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

অরুণ মিত্র

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা জলজলে দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার, আদর করবার, ফুলেফলে কাকলীতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা বুকের দগদগে ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাবরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার ওপার জুড়ল কান্নার কল্লোলে। হাওয়ায় বসে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বন্দির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ধরে না, সান্ত্বনা ধরে না। ছেলেভুলোনো আসরে কাঠপুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গি শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ ঝড়ের উল্লাস। তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা স্রোতোলিনী নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙীনের চকমকির ফুলকি আর রাজবাগিচায় জঙ্গলের হিংস্র চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে ?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

কখন ?

কবিকণ্ঠ

অজিত দত্ত

নীড়ের সংকীর্ণ গণ্ডি মাঝে মাঝে করি অতিক্রম,
আহার মৈথুন নিদ্রা বিবর্জিত অনাবেগ দেশে।
বিদ্বেষ জিঘাংসা স্বার্থে সুগঠিত শতঘ্নী বন্ধম
যেখানে নিরর্থ সবি, কখনো কখনো সেথা এসে'
বীতরাগে, বীতভয়ে এ-সংসারে করিতে বিচার
মৃত্যুর প্রচ্ছায়ে বসি' মুক্তি যদি পাই মুহূর্তেক,
ধন্য তবে কবিজন্ম, ধন্য সত্য পানে অভিসার,
অর্ধ আত্মা পাপী যদি, পাপাতীত এখনো অর্ধেক।

হিংসার দেখেছি নগ্ন বিষদন্ত, দস্তোদর স্ফীতি,
ভ্রাতৃরক্তে কলংকিত সিংহনাদ শুনেছি বিস্ময়ে
রাক্ষসী ধর্মের ভক্ষ্য দেখি আজ স্নেহ-প্রেম-প্রীতি,
মনুষ্যত্ব ধর্মভ্রষ্ট, তবু বাঁচি এ-সবল লয়ে।
আজো প্রাণে আশা জাগে, মেঘাচ্ছন্ন নিশ্ছিদ্র অমারো
অন্তিম বিনাশ আছে উষার আরক্ত চিতাগ্নিতে,
জীবনের প্রাপ্য যত লুপ্ত আজ শেষ চিহ্ন তারও,
তথাপি প্রাণের দীপে যত আলো সবি হবে দিতে।

মানুষের প্রাণে গড়ি মানুষের প্রাণের জল্লাদ,
জনধ্বংসী রাজ্য করি উপভোগ গ্লানিময় সুখে,
মানুষের ধর্মে জন্মি ধর্মদ্রোহে করি সিংহনাদ,
তথাপি, মানুষ ব'লে, কিছু প্রীতি আজো বহি বুকে।

সেটুকু সম্বল শুধু যুগান্তের এ হিংস্র নিশায়—
সেটুকু শাশ্বত হোক্ কবিকণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদে,
কৃষ্ণযুগে জন্ম যার, এই ব্রত বহে সে আত্মায়,
তারি কণ্ঠে বাঁচে আলো অন্ধকারে বিশ্ব যবে কাঁদে।

আমরা পীড়িত, ক্লিষ্ট, সঙ্গীহীন, তথাপি আমরা
স্নেহ প্রীতি সখ্য নিয়ে কাব্য রচি, এ মোদেরি কাজ।
আমরা জানি না রাজা, ধর্ম কিংবা শাস্ত্র ভাঙা-গড়া,
হৃদয়ের ধর্ম জানি, স্নিগ্ধ, মুগ্ধ, প্রণয়ে নিলাজ।
প্রাণের প্রস্তর যুগে যদি পারি কখনো পাষাণে
মনুষ্যধর্মের অনুশাসনের লিপি দিতে এঁকে,
তবেই সার্থক জন্ম, মৃত্যুঞ্জয়ী তৃপ্তি তবে প্রাণে
তবেই নির্দোষ মোরা নিরপেক্ষ নির্মম বিবেকে।

হে কবি, আহ্বান করি, মনুষ্যত্ব ক্লিষ্ট পিষ্ট যবে—
তব ক্ষীণকণ্ঠে আনো জীবনের অধিকার দাবি,
জীবন সংগ্রাম যদি, বলো এই জীবন-আহবে
একমাত্র অস্ত্র মোর আনন্দের মঞ্জুষার চাবি।
বলে কিংবা স্বার্থে কারো মানি না বিকৃত অধিকার
পৃথিবীরে ভুলিবার ছলে মম গড়িতে শ্মশান;
বলো—'আমি ভালোবাসি' এই মন্ত্র কবচ আত্মার
জীবনে যে হিংসা আনে প্রেমেরে সে করে অপমান।

প্রত্যক্ষ

ইক্‌বাল

ওঠো! আমার বিশ্বের গরিবগুলোকে জাগিয়ে দাও।
নড়িয়ে দাও বুর্জোয়াদের প্রাসাদ-তোরণ, দুর্গ-প্রাচীর।
বন্দী আত্মার রক্তকে টগ্‌বগিয়ে দাও নিশ্চয়তার অঙ্গীকার দিয়ে।
নির্জীব চড়ুই পাখি শক্তি পাক শিকরা-বাজের সঙ্গে লড়বার।
গণতন্ত্রের যুগ আসছে:
তোমার চোখের সামনে থেকে মিটিয়ে ফেলো পুরনো আলেখ্য।
যে-খেত থেকে চাষার জন্তে জীবিকার কোন ব্যবস্থা নেই
সে-খেতের প্রতিটি শস্যকণাকে জালিয়ে দাও।
স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝখানে কেন এত ব্যবধান?—
দূর করে দাও গীর্জা থেকে তার পাদ্রীগুলোকে।
আল্লাকে একটা 'সিজ্‌দা' আর ঠাকুরের পায়ে ছুঁটো প্রণতি
(যথেষ্ট নয়)—
বরং, নিভিয়েই ফেলো মন্দির-মসজিদের দীপগুলোকে।
অগদল পাথরের দেওয়াল আমার অসহ্য—আমি ক্লান্ত:
আমার জন্তে বরং আরেকটা মাটির প্রাসাদ তৈরি করো।
নতুন সভ্যতা কাঁচ-শিল্পের কারখানা—
প্রাচ্যের কবি আজ বিদ্রোহের পাঠ শিখতে চায়।

[বাল্‌-এ জিব্রিল: ১৪৯]

অনুবাদক: নোমান বাসির

অগ্নি

মৃগাঙ্ক রায়

১

প্রশ্ন কিছু নেই। শুধু তোমার
অপরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।
কতকাল, সে যে কতকাল! কতকাল আমি তোমার
দেহের বিস্ময়ের কাছে
নত হয়ে আছি। তুমি অনন্ত, কন্যা,
আমার কল্পনা তুমি।

আমার দিন এবং রাত্রি, রাত্রি এবং
রাত্রিশেষের মৃদু আলো দিয়ে
তোমাকে আবৃত করে আছি।
তোমার শ্রমরী যে বিশাল সমুদ্রকে
বেষ্টন করে আছে,—দিগন্তে আলোর উৎসার থেকে
দিনশেষের অন্ধকার অন্ধকার রাত্রি পর্যন্ত
তার ভাষার কাছে
আমি স্তব্ধ হয়ে আছি।

২

দিন গেল, দিন যায়। সন্ধ্যা হলে
পুকুরের শান্তজলে তিমির-গুণ্ঠন নামে
তীর-তরুর। মেঘবর্ষার মেঘ জমে
আকাশের কোণে কোণে।
পিঙ্গল চোখের দিগন্ত দেখে
কলসীতে ঢেউ ওঠে কিশোরী কন্যার।
এখানে ওখানে কারা ভয়ের মূর্তি তুলে ধরে,
বিচিত্র সুন্দর সাপ বিষাক্ত ফণা তুলে
শিষ দেয়; প্রতিদিন ভোর হলে
বহু মানুষ মৃত্যু কামনা করে।

ধীরে ধীরে তোমার অপরূপ দেহের ভাষা
স্তব্ধ হয়ে যায়, রূপ বিবর্ণ হয়ে যায়
তোমার শরীর। অবশেষে
তোমার কুৎসিত মুখের দিকে
আর তাকাতে পারি না।
তোমার চোখের ভয়ংকর দৃষ্টিহীনতার দিকে
আর চোখ তুলতে পারি না।

৩

তাই এমন রক্তিম আগুন
জেলেছি। রক্তমুখ তীরের মতো
অজস্র শিখা জেগে উঠেছে সে আগুন থেকে।
তার অসহ রূপ হিরণ্যকান্তি সূর্যের মতো। আমি সেই
উজ্জ্বল সুন্দরকে সৃষ্টি করেছি।
জানি, একদিন এই আগুনের মধ্যে
তুমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

ঘরে-বাইরে

শঙ্খ ঘোষ

এই সেই অনেকদিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে—
যে-দিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখে
ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
বৎসরের পর বৎসর একখানি ক'রে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলীর মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ দুরবলোক্য তর্জনী—
তাকিয়ে মনে হয়,
আশা নেই আশা নেই—
আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম,
আর সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ
যে মারে সেই বাঁচে।
অন্তত মায়ের মুখে তাকিয়ে এ-ছাড়া আর কোন্ আশা?

আমি জানি, মায়ের এ দম্ভ ঘুচবে না কোনো দিন
—অফুরানের সংসারকে ফুলিয়ে দেবার দম্ভ।
এ-দুঃসাহসিক স্পর্ধা তার ভঙ্গুর পদক্ষেপেও কী-আশ্চর্য প্রখর ফোটে!
কিন্তু তবু
তবু তার আঙুলের পদ্মমুদ্রার বঙ্কিমভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ—
আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সেই আদিম হা-কপাল শিরশির ক'রে ওঠে:
আর পারি না,
তোমরা বরং এই দুর্দম ভার গ্রহণ করো, আমি দেখি,
কী আলাদিনের প্রদীপে খরচ কুলোয় বারংবার।
আর ভগবান,
সংসারের কোন্ সাধটা-বা মিটলো এই অফুরান ঘানি টেনে টেনে?

এমন ললিতসন্ধ্যা সোনার পদ্মপ্রদীপ ছোঁয়াবে শান্ত ছেলের মাথায়
(হায় রে শান্তি)
ধানের শিয়রে পায়রা
(হায় রে শান্তি)
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোন্খানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে—
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই!

তারপর
সারাদিনের ক্লান্তি মিশে মিশে
সেই অস্বচ্ছ দিনান্তে ভয় নেমে ভীষণ
বাহির কৈল ঘর।

আর দেখব না সে-মেয়ের লাঞ্ছিত শাপদগ্ধ চোখ।
যার এক চোখ হাওয়ায় শস্যগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির—
খর্বকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্যবন্ধন থেকে
কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়, দেয়ালে লেগে লেগে রক্তের মতো নিশ্বাস টলছে।
আরেক চোখে ভীষণ নির্লিপ্ত ক্ষমা নীরব থেকে থেকে
কী-উপেক্ষা কী-উপেক্ষা ঢেলে লজ্জাতুর ক'রে তুলছে যৌবন।

ওগো পসারিনী, যৌবন নীলাম ক'রে ঘাটে ঘাটে
আমাকে এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিদ্ধ ক'রো না যৌবনবতী,
আমি তোমার বন্ধু।

এই অজস্র বলি (মাগো!)—
বালির বুকে বুকে কবর বিছিয়ে নেয়—
কতোদূর থেকে তৃষ্ণা এসে এসে সমুদ্র ছুঁতে পায় না—
আর মায়ের যন্ত্রণা।

এ-কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা?

পারবে না

মুর্তজা বশীর

দাও আমার এই বুকটাকে
ভোঁতা শাবল দিয়ে গুঁড়িয়ে দাও
যেমন ক'রে তোমরা ভেঙেছো শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ।
তোমাদের লোহার নাল লাগানো বুটের তলায়
আমার পাঁজরগুলোকে ধসিয়ে দাও
যেমন দিয়েছ স্মৃতিস্তম্ভের তলায় উৎসর্গীকৃত কচি মেয়েটির
গলার একমাত্র হার।
দাও দেয়ালের গায়ে তীক্ষ্ণ ফলকে গেঁথে দাও
আকাশের দিকে উদ্ধত আমার এই হাত।
স্পন্দমান আমার এই উষ্ণ হৃদয়
টুকরো টুকরো করো সঙীনের খোঁচায়।

তবু পারবে না মুছে ফেলতে
বুলেটবিদ্ধ ছাত্র আর রিক্সাওয়ালার,

প্রেসম্যান আর চাপরাশীর রক্তে ভাসানো
আমার বাংলা ভাষা।
বঙ্কিম-আলাওল, রবীন্দ্র-নজরুলের,
পদ্মা-মেঘনার ঢেউয়ের তালে গাওয়া মাঝির,
খেত আর খামারের খুশির আবেগে গাওয়া চাষীর,
দোল্‌নায় শোয়ানো শিশুর পাশে ঘুম পাড়ানো মায়ের
মুখের ভাষা
তোমরা কিছুতেই মুছে দিতে পারবে না—
পারবে না ভাঙতে
যেমন করে ভেঙেছো শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ।

প্রাণের মঞ্জীর

রাম বসু

কতদিন চেয়ে আছি পাহাড়ের দিকে, ওই প্রান্তরের দিকে
কত রাত্রে শুনেছি নিশির ডাক, হাওয়ার গান
দেখেছি, বনভূমিকোলে নিবিড় মায়ের মতো বিস্তৃত দিগন্ত
রাত্রিমা থেকে রাত্রিমায় উন্মীলিত স্তব্ধতার কেয়া
ফেনার মুকুট পরা নক্ষত্র-মুখ তরঙ্গের ঘোড়সোয়ার
অস্পষ্ট আঁধারে তোলে অস্ফুট চুম্বনের সাড়া
সকালে দেখি, শালীধান পরিণত, সলজ্জ স্তম্ভিত
মহুয়ার ডাল থেকে সহৃদয় সখীর মতো হাওয়ার নির্দয় কৌতুক।

আমি অনেকদিন দেখেছি অপরিমিত সত্তার গভীরে
নক্ষত্র-খচিত আকাশের পটে পাহাড়ের পেশল শরীর
অজন্তার রূপসী মূর্তির মতো নদীর মদির ভঙ্গিমা
মাটির রহস্যময় টানে শস্য সমুদ্রে গাঁথা।

চোখ ফেটে জল এসেছে আমার
অপরূপ পৃথিবীতে কী রুদ্ধ কর আমাদের

অক্ষয় সৌন্দর্যের দেশে কী ভয়াবহ অপচয়
জীবনকে মনে হয় অন্ধ উর্বশী ভিক্ষুক আর শহর
গহ্বরের আর্দ্র আঁধারে আহত জন্তুর আর্তনাদ ;
সমস্ত যন্ত্রণা বুকে তুলে পাহাড়ের মতো বাঁচতে পারি না তো
মনে হয়, সেই ইচ্ছার অন্তর্দাহ
বর্ষার পাহাড়ী নদীর মতো পাড়ের গায় ভাঙে।

তার পরেও যখন পাথরের কঠিন মুখে বসন্ত ঝরে
প্রলয়-পিণাকী মহাদেবের চোখে প্রেমের বিহ্বলতার মতো
উমার উষ্ণ অনুরাগের ছায়ায় শ্যাম শিখা অরণ্যে কাঁপন
মহুয়ার মদির আঁধারে শিহরিত প্রথম রোমাঞ্চ,
আমের মউলে দিশাহারা পৃথিবী যৌবন উপান্তে নির্ভীক কুমারী
আর পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলা হরিণের মতো ঝর্ণা,
সেই আকাশজোড়া ভাললাগার লয়ে, দেখলাম
আজকের পাঁক ঠেলে, অন্তহীন দুঃখের দাহ থেকে
ওরাং তার সঙ্গিনীর খোপায় পরাল শালের ফুল
কানে কানে ডাকল, শালের মঞ্জীর।

শালের ফুলে আকাশের ধূসর সীমা, সীমায় সন্ধ্যাতারা
বাতাস তার মুখে একরাশ কুচি ফুল ছড়িয়ে ডাকল, শালের মঞ্জীর
সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল ধুলায় পাতায় রক্তের কণায়
আকাশে মাটিতে বাজল ভালবাসার সুর
তার সুঠাম সুশ্রী মুখে নামল পৃথিবীর প্রথম নারীর লজ্জা
পলাশের বিহ্বল আগুন, তার নির্দোষ চোখের বিস্ময়ে
পরিচ্ছন্ন গোধূলি আকাশ।

আমাদের রক্তের বোবা উচ্ছ্বাস তবে কি জাগল পলাশে চাঁপায়
আমাদের অকথিত ভালবাসায় মাতাল হ'ল কি শালের মঞ্জীর
পৃথিবীর নাড়িতে পাথরে জড়িয়ে থাকা আদিমতম ভাললাগা
তাই কি দূর বিষুব রেখা-সঞ্চারী বলীয়ান উষ্ণ উত্তাপ
সঞ্জীবিত তাই কি অরণ্যের ডাক নক্ষত্রের গান রাত্রির পাহাড়
দুঃখে, ঝোঁকে, অন্যায়ের বিষে তাই কি বাঁচায় টান শ্বেত-করবী ?

আমি তাকিয়ে দেখেছি পাহাড়ের দিকে আর প্রান্তরের দিকে
ঝড়ে জ্যোৎস্নায় শুনেছি পলিমাটির পৃথিবীতে সমুদ্রের ডাক
আকাশ মুখ শস্যের উদার উল্লাস
শিকড়ে রক্ত ঘাম মাটির নোনতা স্বাদ, আর
দ্রাঘিমা থেকে দ্রাঘিমায় ব্যাপ্ত নৈঃশব্দ্যের সত্তায় ঢাকা
শালের শরীর, মানুষের আদিমতম ভাল লাগা
যেন মাটির উত্তপ্ত গভীরে ধর দেওয়া বিরাট ভুঁই চাপা।

তাজমহল ভি. ভেরেশ্চাগিন
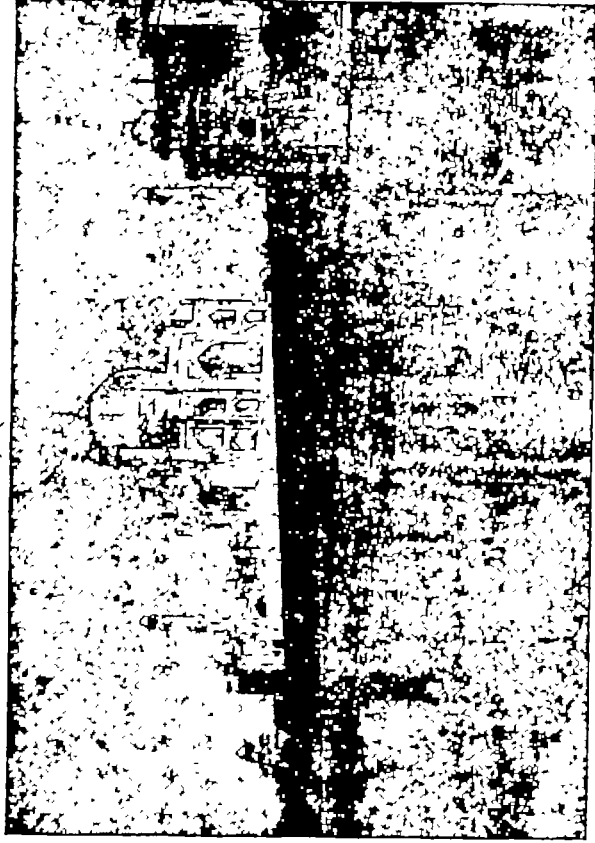
[তাসের সৌজন্যে]

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

[কৈফিয়ত : ইতিপূর্বে গোপালবাবুর কাছে কানমলা খাওয়ার কথা কবুল করেছি (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৮)। অতঃপর গত মাঘ সংখ্যায় তথ্য-ও-তত্ত্বঘটিত গুরুতর ত্রুটির জন্যে ফাল্গুন সংখ্যায় পাঠকগোষ্ঠীতে ধূর্জটিবাবু আমাকে তিরস্কার করেছেন। তিরস্কারের অধিকার তাঁর আছে, অজুহাতও পেয়েছেন, কিন্তু 'মাত্র আধ ঘণ্টা' সময়ের মধ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করতে হয়েছে বলে আমি এ-যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়েছি।

তথ্যের ত্রুটি এই : পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে ধূর্জটিবাবুর ওপর 'ভার পড়েছিল' রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি ও ডিউই, বারবুস, ড্রাইজার-এর রাশিয়া-বিষয়ক বইগুলি আলোচনার। ধূর্জটিবাবু জানিয়ে দিয়েছেন এই উক্তি অতথ্য। কেননা ভার নিয়েছিলেন তিনি 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' হ'য়ে। কথাটা 'ছোট' এবং 'ব্যক্তিগত' হ'লেও এতে নাকি সাব্যস্ত হয় যে রসসাহিত্যে হাত পাকানোর ফলে 'মাত্র বস্তুনিষ্ঠ' হতে আমাকে বেগ পেতে হয়। অবশ্য হয়, কিন্তু রস-সাহিত্যে যদি বা হাত পাকিয়ে থাকি তো তার কুফলে নয়। ঐ দুয়ে যে কোনো বিরোধ নাই তার প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার পক্ষ থেকে ধূর্জটি-বাবুর এই প্রতিবাদ রসিকজনের উপভোগ্য হয়েছে।

অতঃপর তত্ত্বের বিকার। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় সুধীন করেছিল মালরো প্রভৃতি ফরাশি লেখকদের একগাদা বইর সমালোচনা। সুধীন-মালরো প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করেছিলাম :

"সম্পাদকীয় পরিভাষা খুব পরিষ্কার নয়, তাই সম্পাদকীয় পক্ষপাতের সূত্র ধরে ঐ যুগের মালরো সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা হয়তো সংগত হবে না।" ছাপাখানার ভাঁতুতে 'পক্ষপাতের' কথাটি উবে গিয়ে আমার ঐ বাক্যটি একটু বেখাপ্পা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পর লিখেছিলাম "সুধীন দত্ত অজ্ঞাতসারে ফ্যাসিবাদ অবলম্বন না করলেও যে মনোবৃত্তি থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি।"

এই ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক শুরু হ'লে তার শেষ হবার সম্ভাবনা কম। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই : এখন যে সব মতবাদের চেহারা আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট, পরিচয়-এর আদিযুগে ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে তখন

তারা ছিল আবছায়ার মতন। গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয়-এর কোনো ইডিয়লজি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকেই ছিল আইডিয়ার ব্যবসায়ী ; ধূর্জটিবাবুর এই কথা মানি। এই ব্যবসায়সূত্রে ঐ সব আবছায়ার প্রতিঘাতে বিভিন্ন মনে বিভিন্ন সাড়া জাগিয়েছিল। তারই বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যে 'আংশিক মার্কসবাদ'-এর মোহে যে বিকার ঘটেছে তাই হয়েছে ধূর্জটিবাবুর আধঘণ্টাব্যাপী উত্তাপের কারণ। এই মোহমোচনের উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করেছেন তাঁর মোহমুদ্গর। এই মুদ্গরের মধ্যেও মোহের উপাদান অত্যন্ত স্পষ্ট ; কিন্তু তা শিরোধার্য করলাম এই আশায় যে, ভূতগ্রস্ত সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টায় যদিও সমধিক বিপদ ঘটতে পারে তবু এ-ক্ষেত্রে হয়তো বা বিষে বিষক্ষয় হ'য়ে আমি মোহমুক্ত হতে পারি।]

সাত

মহারথী রথী ও পদাতি

দ্বিতীয় সংখ্যার অর্থাৎ ১৩৩৮ সনের কার্তিক মাসের পরিচয় বেরিয়েছিল পুজোর প্রাক্কালে, তাই পরিচালকবর্গ চেষ্টা করেছিলেন 'বিশেষ' সংখ্যার মতো সাজিয়ে এটিকে পাঠকদের হাতে দিতে। তাঁদের চেষ্টা যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ প্রথম সংখ্যার প্রায় দেড়া বহরে আলোচ্য সংখ্যাটিতে এমন সব বিশিষ্ট রচনার সমাবেশ তাঁরা করতে পেরেছিলেন বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে এর আগে বা পরে যার তুলনা বিরল। পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীতে ঐ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত (রীতিবিচার : প্রবন্ধ), অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ভারতের ভাস্কর্য : সচিত্র প্রবন্ধ) ও দিলীপকুমার রায় (কবিতা ও পাঠকগোষ্ঠী)। প্রথম সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল শুধু একটি বীরবলী পত্র ; দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'নীললোহিতের স্বয়ংবর' গল্পটি বেরিয়েছিল তাঁর নিজের নামে। পুস্তক পরিচয় বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু। এ ছাড়া ছিলেন পরিচয়-গোষ্ঠীর নিয়মিত লেখকেরা প্রায় সকলেই আর চারুচন্দ্র দত্ত। চারুবাবুর 'পুরনো কথা' আরম্ভ হয় এই সংখ্যা থেকে।

পরিচয়-এর এই সংখ্যায় আরেকটি নতুন লেখক হাতেখড়ি করেন ; তিনি ধূর্জটিবাবুর ছোট ভাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিমলা তখন সবে পাস করে বেরিয়েছে, কিন্তু বাংলা গদ্যরচনায় এখন তার যে-হাতযশ হয়েছে তার

বেশ আভাস পাওয়া যায় 'প্রাচীন ভারতে নাগরক জীবন' নামে যে-প্রবন্ধটি ঐ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাতে। বিমলাপ্রসাদের সঙ্গে ঐ সব মহারথী রথীদের পিছু পিছু সামান্য পদাতি হিসাবে আমিও প্রবেশ করেছিলাম পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীতে দুটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ ও একটি সমালোচনা লিখে। সমালোচ্য বইটি ছিল 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'। সমালোচনার জন্যে বইটি আমরা প্রকাশকের কাছে পাইনি, নীরেনের পরামর্শে এটি কেনা হয়েছিল। এই রকম বই কিনে সমালোচনা আমরা প্রায়ই করতাম; নইলে নতুন কাগজকে বই যোগাবে কে?

তর্কে-বিতর্কে ব্যাগ্রসংহারে হাত্ পাকালেও কাগজে-কলমে ঐ রকম দুঃসাধ্য ব্যাপারে অগ্রসর হতে আমি যথেষ্ট আশঙ্কা বোধ করেছিলাম। নীরেনকে এই কথা জানিয়ে বললাম, "বইটির বিষয় গুরুতর, সুতরাং আমার মতন কম পড়াশোনা করা লোকের পক্ষে এ-বই হাতে নেওয়া ঠিক হবে না"। নীরেন অভয় দিয়ে বলল, "তাতে কি হয়েছে? তোমার রসবোধ আছে; তুমি একেবারে ফার্স্ট প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ থেকে লিখবে।" অভয় পেয়ে আমি লিখলাম:

"কোনো শিল্পসৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে তাহাকে দেশকালের গণ্ডী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যেই তাহার স্বরূপের সন্ধান করিতে হইবে"।

ফার্স্ট প্রিন্‌সিপল্‌স্-এর দৌড় আর কতদূর হবে? অতএব যার কাছে আমার এই প্রথম সাহিত্যিক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলাম, তাকেই আজ এটি উপহার দিচ্ছি আমার স্বকীয় অধিকারের দাবি একেবারে লুপ্ত করে। ঐ আটপাতা-ব্যাপী রচনাটিতে ভালমন্দ আরো অনেক কিছু লিখেছিলাম। আমার মোট বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার ছিল আমার একেবারে শেষ কথায়:

"সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজে সাফল্যের জন্য যে দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন বিশ্বপতিবাবুর রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না।...তাই তাঁহার লেখা পড়িবার সময় বারম্বার মনে হয় যেন গলদ্‌ঘর্ম গুরুমহাশয় নির্বোধ ছাত্রগণকে দুরূহ পাঠ্য বুঝাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।"

রসচক্র

এই জাতীয় মধুর মন্তব্য প'ড়ে লেখক বা তাঁর বন্ধুবর্গের বিশেষ খুশি হওয়ার কথা নয়। বিশ্বপতিবাবু ও তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের তখন রসচক্র

নামে একটি আড্ডা ছিল; এর দলপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন ঐ দলে। সমালোচনাটি ছাপা হবার অল্পদিন পরেই কবিশেখরের লেখা একটি প্রতিবাদ পৌঁছল পরিচয়-সম্পাদকের হাতে। ছোটখাটো সাহিত্যিক রচনায় কবিশেখরের হাত পাকা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর বহুল প্রশংসা শুনেছি। এই প্রতিবাদটিও ছিল সুলিখিত ও মোটের উপর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সমালোচনার সমালোচনা হিসাবে এটি একটু দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। তাই সম্পাদক তাঁকে অনুরোধ জানালেন লেখাটি কেটেছেঁটে খাটো ক'রে দিতে। কবিশেখর তা না ক'রে অন্য একটি কাগজে প্রতিবাদটি ছাপিয়েছিলেন।

রসচক্রের সঙ্গে পরিচয়-এর আর একবার সংঘর্ষ ঘটেছিল কিছুকাল পরে। এই সংঘর্ষের দ্বৈত নায়ক ছিলেন একদিকে রসচক্রের গোষ্ঠীপতি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অপর দিকে তরুণ লেখক নির্মলচন্দ্র মৈত্র। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নির্মল মৈত্রের আবির্ভাব হয়েছিল অল্পকালের জন্যে, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ধারালো কলম পাঠকদের চমক লাগিয়েছিল। এখন তিনি সরকারি চাকরিতে ও বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলনে এমনি বিজড়িত হয়েছেন যে শত চেষ্টাতেও তার কাছে দু'লাইন লেখা আদায় করা অসম্ভব। নির্মল মৈত্রের লেখা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'রবি-দীপিতা' বইটির সমালোচনা ছাপা হয়েছিল চতুর্থ বর্ষের পরিচয়-এর চতুর্থ সংখ্যায়।

ঐ সমালোচনাটির দুটি অংশ এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। সুধীন দত্তের গুরুগম্ভীর বাক্যসংযোজনের সঙ্গে নির্মল মৈত্রের খরধার ভাষা মিলিয়ে দেখলে পাঠকেরা বুঝবেন পরিচয়-এর সমালোচনা-নীতি ছিল কতখানি ব্যাপক। 'বলাকা'-প্রসঙ্গে 'রবিদীপিতা'র লেখকের প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের ওপর সমালোচকের মন্তব্য :

"ভাষা এবং ভাবের এই অপ্রত্যাশিত উৎপাতে বিশৃঙ্খলবাক গ্রন্থকারের প্রকৃতিস্থতা বিষয়েই পাঠকের সন্দেহ জন্মে; সুতরাং প্রকৃতির অপ্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে ভাবিবার সময় অতি অল্পই থাকে।"

'রবি-দীপিতা'র সমালোচকের চরম মন্তব্য :

"'রবি-দীপিতা' শেষ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি আখ্যান মনে পড়িল। নীলাচলে থাকিবার সময় মহাপ্রভুকে কিছুকাল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদান্তব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। সাতদিন শুনিয়াও তিনি

ভালমন্দ কিছু বলেন নাই; ইহাতে বিস্মিত হইয়া সার্বভৌম তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে:

"প্রভু কহে, মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি;
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি।

*　　*　　*

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল;
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া;
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)"

"আমাদের কথাও তাই। আমরা মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ, ডক্টর টম্‌সন, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সকলের রবীন্দ্র-ভাষ্যই কোনোরকমে বুঝিতে পারি, চেষ্টা করিলে হয়ত বা রবীন্দ্র-সূত্রও বুঝিতে পারি, কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভাষ্য আমাদের সাক্ষরতা সম্বন্ধেই সন্দেহ, চিত্তে বৈকল্য আনিয়া দেয়। প্রকাশকের তাগিদ বই এই বই প্রকাশিত হইতে পারিত না ইহাই সান্ত্বনা, সুতরাং প্রকাশকের নিবেদন সার্থক।"

পরিচয়-এর পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের লাঞ্ছনা এই প্রথম নয়। এর আগে প্রথম বৎসরের শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'কবি-পরিচিতি' পুস্তকে অধ্যাপক মহাশয়ের 'বর্ষাকাব্যে ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের হাত থেকে বেরিয়েছিল:

"অধ্যাপক মহাশয় কাব্য-রসিক তাহাতে সন্দেহ নাই—শুধু দুঃখ হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূতের বোঝা তিনি নামাইতে পারেন নাই। (প্রমথ) চৌধুরী মহাশয়ের মতো পাণ্ডিত্যের সহিত বৈদগ্ধ্যের সহজ সম্মিলন তিনি করিতে পারেন নাই, তাই প্রবন্ধটির পূর্ব-অংশ সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য এবং উত্তর-অংশ উপভোগ্য হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয়ের

বক্তব্যের আকর্ষণে নয়—উদ্ধৃত অংশসমূহ ও তাহাদের অনুবাদের জন্য।"

ইংরাজিতে যাকে বলে ডিবাংকিং সেই কাজে তরুণ পরিচয় প্রবৃত্ত হয়েছিল অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে ও বেপরোয়াভাবে।

নিরপেক্ষ সমালোচনা : দলীয় বিরোধ

দল ও মত-নির্বিচারে বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন, উদিত, উদীয়মান ও অনুদিত সকল লেখককে লেখকগোষ্ঠীতে টানবার চেষ্টা করেছিল পরিচয়; এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক না হওয়ার কারণ প্রথম থেকেই পরিচয়-এর সঙ্গে একাধিক নামকরা লেখক ও তাঁর ভক্তবৃন্দের ঐ জাতীয় সংঘর্ষ।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়-এর বিরোধ কী ভাবে হ'ল এর আগেই তার বিবরণ দিয়েছি। প্রথম সংখ্যায় নীরেনের 'শেষ প্রশ্ন' সমালোচনায় ফলে যে-বিরোধের সূত্রপাত, দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যায় 'তরুণের বিদ্রোহ' ও 'স্বদেশ ও সাহিত্য' এই দুটি বই-র সমালোচনা ক'রে তা তীব্রতর করলেন জীবনময় রায়। এই দুটি প্রবন্ধের বইয় কথা আজ প্রায় লোকে ভুলে গিয়েছে। শরৎবাবু বই দুটিতে তাঁর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতামত অসংকোচে ব্যক্ত করেছিলেন; অসংকোচের মাত্রা একটু বেশিই হয়েছিল, ফলে অনেক সারবান কথার সঙ্গে তিনি এমন অনেক কথা না ব'লে পারেন নি যা এখনকার এবং তখনকারও বিচারে অচল। জীবনবাবু এই সব সদুক্তি কদুক্তি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যও যে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে করেছিলেন তার প্রমাণ নিচের এই উদ্ধৃতি:

"শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং 'ট্রুথের' গোলমাল করেছেন, দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। আসল কথা রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষত রাগপ্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একটা নাটকোচিত স্বদেশিয়ানার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলো অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি ক'রে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কথাগুলির লক্ষ্য শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি শরৎবাবু লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে। ব্যাপারটির ইতিহাস এই। গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে

পৌঁছেছে তখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে দেশে ফিরলেন তাঁর সার্বভৌম সহযোগিতার বাণী প্রচার ক'রে ; গান্ধিজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র মতবিরোধ প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা', 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে। গান্ধিজী দেশবাসীকে বলেছিলেন বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করতে। তাই ভারতবর্ষময় 'বিদ্যাপীঠ' স্থাপন ক'রে চেষ্টা হয়েছিল জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচলনের। এই কাজে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এক সময়ে অগ্রণী, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই প্রচেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার পরিচয় পেয়ে তার প্রতিবাদ না ক'রে পারেন নি। এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র—'শিক্ষার মিলন'-এর উত্তর রচিত হলো তাঁর 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প না বলে পারছি না। কলকাতায় ঐ সময়ে যে 'বিদ্যাপীঠ' স্থাপিত হয় তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কিরণশঙ্কর রায়। এই কাজে আশীর্বাদপ্রার্থী কিরণশঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, "নামটি ভালোই হয়েছে। বিদ্যাকে তোমরা সত্যি পিঠ প্রদর্শন করেছ।"

শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ'-এ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মনের অন্তর্নিহিত রবীন্দ্রবিরোধ। এই বিরোধ কয়েক বৎসর পরে আর একবার প্রকাশ পেয়েছিল 'তরুণ সাহিত্য' প্রসঙ্গে। তরুণ সাহিত্যে আদিরসের ছড়াছড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ দুচারটি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নরেশবাবুর ক্ষিপ্ত হবার কারণ ছিল ; এই কারণ ভূরিভূরি পাওয়া যায় তাঁর তখনকার একাধিক নভেলে। শরৎবাবু একরকম অকারণেই নিজের গায়ে পেতে নিলেন তরুণদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। এ হ'ল একদিক। আর একদিকে নিজের চোখে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎবাবুর ভক্তির প্রাবল্যের একাধিক নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত আবেগ রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে ছিল বিরল।

মোট কথা, পরিচয় একাধিক দলের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি না করে পারে নি। যে-পত্রিকার প্রধান অঙ্গ সমালোচনা, সে-পত্রিকার পক্ষে এই জাতীয় বিরোধ এড়িয়ে চলা একরকম অসম্ভব ছিল। পরিচালকদলের সাধ্যমত চেষ্টা ছিল পরিচয়-এর সমালোচনা যাতে একেবারে পক্ষপাতশূন্য হয়। এ-বিষয়ে লেখকদের ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্বাচিত রচনায় সম্পাদক কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করতেন। আমাদের সকলেরই মত ছিল দরকার হলে কাউকেই ছেড়ে

কথা বলব না। এই নীতির একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমরা মেনে নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে : Others abide our question, thou art free। আসল কথা, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে কলহটা খুব সমীচীন হয় না। নীরেন নির্ভীক, তাই এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল সে একলা।

নিরপেক্ষ সমালোচনা-নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল প্রায় ঘরোয়া ঝগড়া।

নতুন লেখকের সন্ধানে পরিচয়-এর পরিচালকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না; তেমনি অক্লান্ত উদ্যমে তাঁরা চেষ্টা করতেন নামকরা লেখকদের টেনে এনে পরিচয়-এর আসর গরম করতে। যথাক্রমে আমাদের আড্ডায় আবির্ভাব হ'ল বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কল্লোল-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের। প্রথম সংখ্যাতেই বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা যে ছাপা হয়েছিল তা আগেই লিখেছি। বুদ্ধদেব বসুর দুটি বইর সমালোচনা ক'রে গিরিজাবাবু রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ খেতাব লাভ করলেন; পরিচয়-এর পরিচালক মহলে তাঁকে ধরে নেওয়া হ'ল বৌদ্ধ (রবীন্দ্রনাথের অর্থে)-সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ ব'লে। সুতরাং ঐ গোষ্ঠির অন্যান্য বইর সমালোচনার ভার একাধিকবার গিরিজাবাবুকেই দেওয়া হয়েছিল। পুরনো পরিচয় উল্টে দেখছি প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় গিরিজাবাবু সমালোচনা করেছিলেন তিনটি বইর: অচিন্ত্য-কুমার সেনের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'; অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'অসমাপিকা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'অকর্মণ্য'।

এর পর চতুর্থ সংখ্যায় বোধহয় পাঠকদের মুখবদলের জন্যে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই চারজন লেখকের 'রেখা-চিত্র', 'ইতি', 'পুতুল ও প্রতিমা' ও 'বধূবরণ', যথাক্রমে এই চারটি বইর সমালোচনা করলেন সুধীরকুমার চৌধুরী। তারপর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় দেখছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র সমালোচনার নিচে আবার 'গিরিজাপতি ভট্টাচার্য' স্বাক্ষর। "কে কবে পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল আর তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সেই থেকে ব্যর্থতা সর্বময়,—এই হ'ল 'প্রথমা'তে নিদারুণ বিলাপের প্রধান কারণ।···কিন্তু হাসানো যেমন সোজা কাঁদানো তেমন নয়; কেননা কাঁদাতে হলে মানুষের অন্তঃস্থলে পৌঁছাতে হয়। 'প্রথমা'র কবিতা সেই অন্তঃস্থল পর্যন্ত যায়নি···।" এই জাতীয় সমালোচনা পড়ে লেখকের বা তাঁর বন্ধুদের

খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছিল এই সমালোচনাটি ছাপা হবার আগেই।

ব্যাপারটি সংক্ষেপে হ'ল এই। বুদ্ধদেববাবু সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এই 'প্রথমা' কিংবা তাঁদের গোষ্ঠীর কোনও লেখকের লেখা অপর কোনও একটি বইয়ের সমালোচনার ভার তাঁদেরই একজনের ওপর দিতে। যতদূর মনে পড়ে ঐ বইটি 'প্রথমা'। সম্পাদক স্বভাবতই তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন অন্য যোগ্য সমালোচক না থাকলে হয়তো এ অনুরোধ তিনি রাখতে পারতেন কিন্তু যে-ক্ষেত্রে লোকাভাব ঘটেনি সে-ক্ষেত্রে দলের লোকের হাতে লেখা নিজেদের বইয়ের সমালোচনা নিরপেক্ষ হলেও সুশোভন হবে না। এই নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি। এর পর পরিচয়-এর আড্ডা ও লেখকগোষ্ঠি এই উভয় আসর থেকে বুদ্ধদেব বাবু সবান্ধবে প্রস্থান করলেন।

এই বিরোধ ঘটবার আগেই প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৩৯ সালের বৈশাখের পরিচয়-এ ছাপা হয় তাঁর 'স্বপ্ন-দূত' কবিতাটি।

হে স্বপ্নের নীরব দেবতা!
চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন নেপথ্যের অভিনয় করো প্রযোজন।
আঁধার-রহস্য-পরে তুমি ফেলো আলোকের শিখা,
নিরুদ্ধ বাসনা সব মায়াস্পর্শে করো উন্মোচন;
যখন মনের কথা বলিতে হৃদয়ে লাগে ব্যথা,
তীব্র আত্ম-নিপীড়নে যন্ত্রণায় কাটে জাগরণ—
তুমি আন মুক্তির বারতা।

আজি মোর তোমার সকাশে
একটি প্রার্থনা আছে। রজনীর অন্তিম প্রহরে,
অনেক চেষ্টায় যবে তন্দ্রায় জড়াবে আঁখি তার—
মোর মূর্তি ধরে তুমি যাবে তার শয়ন-শিয়রে,
দেখিবে সন্ধান ক'রে তার অন্তরের অন্ধকার।
—রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে; চুলগুলি চঞ্চল বাতাসে
এলোমেলো হ'য়ে যায়, ন'ড়ে ওঠে ঠোঁটের কিনার।
তুমি গিয়া দাঁড়াইয়ো পাশে।

কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয় ডি-জি-রসেটির Love's Nocturne. বুদ্ধদেব বাবু অনুবাদ করেননি, তবে সম্ভবত রসেটির ঐ কবিতাই তাঁর 'স্বপ্ন-দূত' কবিতার প্রেরণা।

সদল বুদ্ধদেব বসুর প্রস্থানে পরিচয়-এর ক্ষতি হয়েছিল কি না সে-কথা আলোচনা করে আজ লাভ নেই। তবে বুদ্ধদেববাবুরা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই খুশি হতাম। যাই হোক পরিচয়-এর আসর তখন বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে; আমাদের শুক্রবারের আড্ডা বসছে মাসে একবার করে বালিগঞ্জে প্রবোধ বাগচীর নতুন বাড়িতে। দু-একবার আমার বাড়িতেও বসেছে। চারুবাবুর নিমন্ত্রণে আমরা যেতাম তাঁর হাজরা রোডের বাড়িতে। মুখের কথায় বা লেখায় মজলিশ জমাতে তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। পরিচয় যেমন কাউকে ছেড়ে কথা কয়নি তেমনি বাংলা দেশের পাঠক ও সমালোচকেরা পরিচয়কে ছেড়ে কথা বলেন নি। এর ব্যতিক্রম ছিল কেবল চারুবাবুর 'পুরনো কথা'। সম্প্রতি মাত্র ঊনআশি বছর বয়সে পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে চারুবাবুর দেহাবসানের সঙ্গে মনে হয় যেন বাংলার মজলিশী যুগের অবসান ঘটল। পাঁচজনের সভা জমাতে যিনি ওস্তাদ ছিলেন তিনি পাঁচজনের সঙ্গে না জড়িয়ে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখেন। এই পরিচয় তাই মুলতুবি রইল আগামী সংখ্যার জন্য।

[ক্রমশ

নূতন চীনের সংস্কৃতি

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাকৃতিক জগতে ঋতুচক্র নানা পরিবর্তন লইয়া আবির্ভূত হয়। গ্রীষ্মের রুদ্র তপস্যার পর আসে বর্ষার বিরাট সম্ভাবনা। আবার শরতের পরিপূর্ণ পরিণতি ও হেমন্তের ক্ষীয়মান সৌন্দর্য উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী শীতঋতুর রিক্ততায় আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু সুন্দরী পৃথিবী এই রিক্ততা ও কঠোর ত্যাগের সাধনার ভিতর দিয়াই বসন্তের আগমন সম্ভব ও সার্থক করিয়া তোলে। ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাপকভাবে আলোচনা করিলে জাতির জীবনেও ঋতুপরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্টই ধরা পড়ে। ১৯৩১ সালের জাপানী আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৯ সালে বর্তমান জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত চীনদেশে আত্মরক্ষার সংগ্রাম ও বিপ্লবের তাণ্ডব জাতীয় জীবনকে মথিত করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জ এই অনিশ্চয়তাকে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়েই অদূরদর্শী পর্যবেক্ষকের অজ্ঞাতসারে চীনের সাধারণ মানুষ রুদ্র-তপস্যায় মগ্ন ছিল এবং তাহারই ফলস্বরূপ জাতির জীবনে একটি বিরাট সম্ভাবনার সূচনা হইল। চীনে নবজীবনের প্লাবন আজ কূলে কূলে আশার বার্তা পরিবেশন করিতেছে। তাই চীনের ধর্ম, অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি আজ নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম উপদেশ-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—'ন হি মনুষ্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। কিন্তু এই পরম সত্য আমাদের দেশে কেবল মাত্র বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় যুগে যুগে আমরা এই নীতি-বাক্যকে অস্বীকার করিয়াছি। তাই দারুণ অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিভেদমূলক সামাজিক উৎপীড়ন, রাষ্ট্রনৈতিক স্বৈরাচার আমাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। নব্য চীনের রাষ্ট্র-নায়ক ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণ এই উদার মানবিকতাকেই সংস্কৃতির মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষকে তাঁহারা সর্বোচ্চ সত্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে সর্বক্ষেত্রে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাই চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল কথা।

চীন দেশে সংস্কৃতি মানুষের জন্মগত অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রেণীনির্বিশেষে জনগণের জীবন যাহাতে সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত ও সুন্দর হইয়া উঠে তদুপযোগী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা সমাজ ও সরকার কর্তব্য হিসাবে মানিয়া লইয়াছেন। দেখিলাম, চীনের প্রতিটি শহরে শ্রমিকদের জন্য 'কালচারাল প্যালেস' বা সংস্কৃতি-সৌধ স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শ্রমিকের সুস্থ আনন্দ, সৌন্দর্যানুভূতি লাভ ও ব্যক্তিগত অনুশীলনের সুযোগ রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে সংগীত, পাঠাগার, বক্তৃতা, আলোচনা-বৈঠক, চিত্র-প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনকে আনন্দমুখর ও সৃষ্টিধর্মী করিয়া তোলা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা ক্রমে ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। প্রতি গ্রামে না হইলেও, দুই তিনটি গ্রাম-সমষ্টির জন্য একটি করিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে।

সত্য ও সুন্দর, জ্ঞান ও আনন্দের সাধনার মধ্যেই সংস্কৃতির প্রকাশ ও পরিণতি। কিন্তু এই সাধনার প্রাথমিক উপকরণ হইতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হইলে সংস্কৃতি জাতীয় জীবনে প্রসার লাভ করিতে পারে না। চীনের আর্থিক উন্নতি ও নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এই সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হইয়া উঠিয়াছে; তাই সাধারণ মানুষের জীবন সংস্কৃতির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। চীনের বর্তমান সংস্কৃতি ধনীর ভাববিলাসের বা বাহাদুরি দেখাইবার বস্তু নয়। তাহা সকল মানুষের নিত্যসঙ্গী; জীবনের বিরাট সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সক্রিয় জীবনদর্শন।

যে-কোন দেশের সংস্কৃতি জাতিমানসেরই পূর্ণ প্রকাশ। জাতির মানসিক গঠন শিক্ষার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং শিক্ষার সহিত জাতীয় সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য। শিক্ষাই সংস্কৃতির ভিত্তি ও বাহন। সেই জন্য বর্তমান চীনের শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করিলে চীন সংস্কৃতির সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতীয় শুভেচ্ছা-দলের অন্যতম সভ্য হিসাবে চীন ভ্রমণের সময় ও-দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণের সহিত চীনের সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ভাষার অধ্যাপক উড়িষ্যাবাসী শ্রীপ্রহ্লাদ প্রধান, পিকিং-এর নিকটবর্তী চিং হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ চৌ, শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক চ্যাং

(ইনি বর্তমান গণ-পরিষদের সদস্য), পিকিং-এর সন্নিকটস্থ ইয়েন চিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, টিয়েনসিনের নিকটবর্তী নানাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক, হ্যাং চৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ক্যানটনের পীপলস ইউনিভারসিটি বা গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ক্যান্টনের সুনইয়াটসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসমেত কয়েকজন অধ্যাপকের সহিত বিভিন্ন সময়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। পিকিং অবস্থানকালে নিখিল চীন লেখক ও শিল্পী সংঘের আহ্বানে একই দিনে অনুষ্ঠিত দুইটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। চীনের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক এই সভা দুইটিতে অংশ গ্রহণ করিয়া চীনের সাহিত্য ও চারুশিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনা হইতে মাও সে-তুঙ প্রবর্তিত নূতন সাংস্কৃতিক আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাগুলি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

মাও সে-তুঙ একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক ও কবি। তিনি সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে-মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা সম্ভ্রমের সহিত প্রণিধানযোগ্য। মাও সে-তুঙ বলেন যে শিক্ষাধারাকে জাতীয় ও বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন। এই তিনটি নীতির পৃথক আলোচনা আবশ্যক।

জাতীয় শিক্ষার দুইটী দিক আছে। প্রথমত, শিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহার দ্বারা শিক্ষার্থী জাতির রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে বাস্তব উপলব্ধি, শ্রেণীনির্বিশেষে জনগণের আর্থিক উন্নতি সংবিধান, সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত। চীনের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও সংস্কৃতি এই আদর্শগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনপদ্ধতির ভিতর যাহা কিছু বরণীয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সেই সকল মূল্যবান জাতীয় আদর্শের সংরক্ষণ চীনের বর্তমান সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা আন্দোলনের একটী প্রধান বিশেষত্ব।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পুরাতনের অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হইতে পারে। তাই শিক্ষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে, আজও অনেক শিক্ষাবিদ আছেন যাঁহারা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও জীবন পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বদ্ধপরিকর। প্রাচীন আদর্শগুলিকে বর্তমান

পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অস্বীকার করেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের দরুন অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তদনুসারে জাতীয় আদর্শকে নূতন রূপ দিতে হয়—এই সত্য তাঁহারা কার্যত মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্ণধারগণ বিবর্তনে বিশ্বাসী, তাঁহারা মনে করেন যে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় চীনকে আধুনিক জগতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। তাই উদার মানবিকতার ভিত্তিতে তাঁহারা শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবপন্থী বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে আগ্রহশীল। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগে তাই তাঁহারা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক-মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন সাম্যমূলক সমাজ গঠনে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক জীবনদর্শনের বিজ্ঞান-সম্মত সুসামঞ্জস্য সাধন চীনের বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট দিক। প্রাচীন আদর্শকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া গ্রহণ বা বর্জনের সাধনায় চীনের বুদ্ধিজীবীরা আজ ব্যাপৃত আছেন। চীনের আধুনিক সংস্কৃতি সচেতনভাবে সমন্বয়ধর্মী।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির আর একটা দিকও লক্ষ্যণীয়। চীনে তরুণ-তরুণীরা বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়াছে। পিকিং, ইয়েন চিং, চিং হুয়া, নানাকাই, হ্যাং চৌ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠাগারে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন যে শতকরা ৭৫টি ছাত্র-ছাত্রীই বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। চীন সরকারই আজ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দিতেছেন। ইহার একটি বিশেষ কারণ আছে। চীন সরকার ও যুবসমাজ উপলব্ধি করিয়াছে যে বিজ্ঞানের অবহেলাই প্রাচ্যের অধোগতির মূল কারণ। মধ্যযুগের শেষভাগেও এশিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের তুলনায় অগ্রসর ছিল কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশগুলি বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাই নব্যচীন বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে। চীনের যুবসমাজ আজ বলিতেছে যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বলে তাহারা দেশের কৃষি ও শিল্পসম্পদ বাড়াইয়া সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে।

তৃতীয়ত, মাও সে-তুঙের মতে শিক্ষা গণতান্ত্রিক হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষা এমন রূপ গ্রহণ করিবে যাহার সাহায্যে শিক্ষিত ব্যক্তি জনসাধারণের সমস্যাগুলির সমাধানের সুষ্ঠু উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। চীনের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের প্রতি যে-অবিচার চলিয়াছে তাহার কুফল অল্পসময়ে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব নহে। এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য শিক্ষিত শ্রেণীকে এই সকল নিপীড়িত শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা অভাব-অভিযোগের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইতে হইবে; তবেই জাতির দ্রুত উন্নতি সম্ভব। অর্থাৎ যে জাতীয় ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মন সংস্কৃত হইয়াছে তাহাকে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার কথা। তাই দেখিতে পাইলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অবসর সময়ে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে বয়স্ক-শিক্ষা প্রসারের ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে কৃষকদের ভিতর নানাপ্রকারের জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ইয়াং-সি কিয়াং ও হোয়াং হো নদের বাঁধগুলি রক্ষাকল্পে কৃষকদের সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। Unity of theory and practice অথবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আহৃত জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে জনসেবায় ব্যবহার চীনের শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান সূত্র।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলি প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে নিখিল চীন লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক আহূত সাহিত্যিক বৈঠকের কথা স্মরণ হইতেছে। এই বৈঠকে চীনের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষ্যে বিদেশাগত বিভিন্ন মিশনের সদস্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চীনের প্রগতিশীল প্রবীণ সাহিত্যিক ম তুন্। ইনি এবং চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কো মো জো চীনের গণসাহিত্যের প্রবর্তক লু সুনের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী। ম তুন 'মধ্যরাত্রি' ও 'দুর্নীতি' নামক দুইখানি যুগান্তকারী উপন্যাসের লেখক। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ও নিখিল চীন সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের সহকারী সভাপতি চৌ ইয়াং ও ঐ সমিতির অন্যতম সহকারী সভানেত্রী ঔপন্যাসিকা মাদাম তিঙ লিঙ এই সভায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। চীনের অন্যান্য প্রায় সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকেরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কেবলমাত্র কো মো জো কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় আসিতে পারেন নাই।

ঔপন্যাসিক ম তুন, সমালোচক চৌ ইয়াং ও মাদাম তিঙ লিঙ চীনের লেখক ও শিল্পীদের সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন। মাদাম তিঙ লিঙ-এর ভাষণ এই সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মাও সে-তুঙ ১৯৪২ সালে ইয়েনানে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আদর্শ সম্বন্ধে যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চৌ ইয়াং বলেন যে চীনের গণসাহিত্য ও গণশিল্প জনসাধারণের জীবনধারা হইতেই অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক জীবনাদর্শের সমন্বয় সাধন করিয়া একটি উন্নততর সাংস্কৃতিক আদর্শে উপনীত হইতে প্রয়াস পায়। তিনি আরও বলেন যে কোন সমাজ বা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের প্রকৃত জীবনালেখ্য সাহিত্য ও শিল্পে রূপায়িত করিবার পূর্বে নয়াচীনের লেখক ও শিল্পীগণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের অভিপ্রায়ে সেই সমাজ বা গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল দিনপাত করেন। মাদাম তিঙ লিঙ-এর 'সূর্যালোকে সান কান নদী', চাও শো লীর 'লীর গ্রামের নূতন রূপ' কৃষক-জীবনের অপরূপ আলেখ্য। চাও মিং লিখিত নাটক 'লাল ঝাণ্ডার গান' ও 'চলিষ্ণু শক্তি' নামক উপন্যাস শ্রমিক জীবনকে মুকুরিত করিয়াছে। এই কয়টি পুস্তকই প্রত্যক্ষতা-লব্ধ-অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

কৃষক, শ্রমিক ও মুক্তি ফৌজের সৈনিকেরাও সাহিত্যে ও ছায়াচিত্রে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া সার্থক রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রমিক তিয়েন চিন লিখিত 'চালকের জীবনী' এবং মুক্তি-ফৌজের সৈনিক লী কোয়াং ইয়াং প্রণীত উপন্যাস 'জীবন্ত মানুষের পুতুল' এই শ্রেণীর সাহিত্য।

১৯১৯ সালে ৪ঠা মে তারিখে চীনে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগীয় ভাবধারার আংশিক অবসান ঘটে; জাতীয়তা ও পাশ্চাত্য আদর্শ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। লেখকেরা প্রাচীন (classical) ভাষা পরিহার করিয়া সহজবোধ্য জনসাধারণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান। সমালোচক-প্রবর চৌ ইয়াং বলেন যে এই সকল অতি মূল্যবান পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ যুগের লেখকরা গণজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে প্রাণবন্ত বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পিকিং বৈঠকের ভাষণে মাদাম তিঙ লিঙ বিপ্লব-পূর্ব চীন সাহিত্যকে টবের ফুল বা roof garden flower বা ছাদের বাগানের ফুলের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর সাহিত্য

স্বল্পপ্রাণ, কারণ ইহা জনসাধারণের চিরন্তন জীবন-লীলা হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রবর্তক লু স্থন নূতন বস্তুনিষ্ঠ ভাবধারা চীন-সাহিত্যে আনয়ন করেন। লু স্থনের 'উন্মাদের ডায়েরী' ও 'আহ কি-উএর জীবনকাহিনী' বৈপ্লবিক বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। নূতন সাহিত্যের চর্চা ব্যাপক করিবার জন্য লু স্থন কো মো জো'র সহকারিতায় চীনের প্রগতিশীল সাহিত্য-গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেন। মাদাম তিঙ লিঙ এই সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। লু স্থন, কো মো জো এবং মাদাম তিঙ লিঙ প্রভৃতি যে-আন্দোলন শুরু করেন তাহাই পূর্ণতালাভ করে মাও সে-তুঙের ১৯৪২ সালের ইয়েনান নীতিতে। চীন সংস্কৃতির ইতিহাসে মাও-এর এই ভাষণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জাতীয় সংস্কৃতিকে বিরাট মহীরুহের সহিত তুলনা করা যায়। বিরাট মহীরুহ যেমন নিজ জন্মভূমি হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া বলসঞ্চয় করে তেমনি জাতীয় সংস্কৃতি জনসাধারণের অনন্ত জীবনলীলা হইতে বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। আবার বিরাট মহীরুহ যেমন অনন্ত আকাশ-বাতাসে বিশাল বাহু ও সংখ্যাতীত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অসীম আকাশ-বাতাস হইতে জীবন-রস সংগ্রহ করে, তেমনি প্রাণবান্ জাতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি হইতে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা আয়ত্ত করে এবং জাতীয় জীবনের জারক-রসে তাহা পরিপাক করিয়া একটি সমৃদ্ধতর সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে থাকে। চীনের নবসংস্কৃতি জাতীয় ভাবধারা ও আন্তর্জাতিক ভাবধারার সমন্বয়ে ক্রমে বিশালতা লাভ করিতেছে। সংগীত ও চিত্রকলা, সাহিত্য ও দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অন্যান্য যে-সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক আদর্শ চীনকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার ভিতর রাশিয়ার নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুশকিন, তুর্গেনিভ, লিও টলস্টয় ও গর্কি হইতে আরম্ভ করিয়া শলোকভ, এহরেনবুর্গ পর্যন্ত যাবতীয় রুশীয় লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি চীন লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে রুশীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ শুরু হইয়াছে বলা চলে না। গণজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ও বস্তুনিষ্ঠ সত্যসাধনা চীন লেখক সমাজকে বিচারহীন অসার্থক অনুকরণের ভ্রম হইতে রক্ষা করিয়াছে।

নিখিল চীন লেখক ও শিল্পী সমিতির আমন্ত্রণে পিকিংএ স্বাধীনতা

উৎসব উপলক্ষে যে সাহিত্য বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সমালোচক চৌ ইয়াং ও মাদাম তিঙ লিঙ চীনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্থান সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিলেন। বিপ্লবের পূর্বেকার কথা। তখন মাও সে-তুঙ কমিউনিস্ট সরকারের নেতা হিসাবে ইয়েনানে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তখন মাদাম তিঙ লিঙ-এর একটি রচনা ইয়েনানের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মাদাম তিঙ লিঙ তখন ইয়েনান হইতে ২০ মাইল দূরে কর্মব্যস্ত ছিলেন। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পরেই মাদাম তিঙ লিঙ-এর হাতে একখানি নিমন্ত্রণলিপি পৌঁছাইল। নেতা মাও সে-তুঙ তিঙ লিঙ লিখিত রচনা আলোচনা করার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া মাদাম তিঙ লিঙ বলিলেন, চীন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন এবং সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির কাজে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া থাকেন। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উৎকৃষ্ট রচনার উদীয়মান লেখকদিগকে বাছাই করিয়া সাহিত্যসাধনায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও নিখিল চীন সাহিত্যিক ও শিল্পী সমিতির যুক্ত পরিচালনায় চীনে একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও শিল্প গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।* স্থানীয় সরকারগুলি উদীয়মান তরুণ লেখকদিগকে এই গবেষণাগারে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়া থাকেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শিল্পী ও লেখকেরা জনসাধারণের জীবনের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাহাদের মধ্যে কিছুকাল সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন। শিল্পী ও লেখকগণ যে-সময় সৃষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত থাকেন তখন সরকার তাঁহাদের পরিবার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। সাহিত্যিকের লেখা শেষ হইলে তাহা স্থানীয় লেখক সঙ্ঘে প্রেরিত হয় এবং তাঁহারা রচনার সমালোচনা করিয়া দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া দেন। লেখক সঙ্ঘ সরকার পরিচালিত অথবা ব্যবসাদারী দৈনিক বা মাসিকপত্রে রচনাটি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। রচনা জনসাধারণের মনঃপূত হইলে পুস্তকাকারে সরকারী ছাপাখানা বা বেসরকারী ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইতে পারে। যাহারা পেশাদারী লেখক বা সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য উপরোক্ত

*এই প্রতিষ্ঠানটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়'—এ 'সংস্কৃতি সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। এই 'নতুন লেখকদের ইস্কুল' সম্বন্ধে শ্রীমতী তিঙ লিঙ-এর কাছ থেকে আরো বিস্তৃত তথ্যে সমৃদ্ধ একটি রচনা আমরা আশা করছি। সম্পাদক

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পিকিংএ পেশাদারী শিল্পী ও লেখকদের জন্য, সামার প্যালেস বা গ্রীষ্ম-প্রাসাদে কতকগুলি বাসগৃহ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এখানে লেখকেরা বা শিল্পীরা মনোরম ও জনবিরল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর নিজ মনে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

পেশাদারী সাহিত্যিক ছাড়া চীনে আরও দুই শ্রেণীর লেখক ও শিল্পী আছেন। প্রথমত, কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিক শ্রেণীর লেখক ও শিল্পী এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানের কালচারাল স্কোয়াড বা সংশ্লিষ্ট শিল্পী-লেখক গোষ্ঠী। পূর্বলিখিত সাহিত্যিকদ্বয়, তিয়েন চিন ও শীন কোয়াং, যথাক্রমে কৃষক ও সৈনিক শ্রেণীভুক্ত।

চীনে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহিত্য ও চারুশিল্প বিষয়ে অপরিসীম উৎসাহ দেখা যায়। দৈনিক সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাবর্গের নিকট হইতে নানা চিঠিপত্র পাইয়া থাকেন। চীনের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা জনগণের সরকার ও জনসাধারণের নিকট হইতে যে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন তাহা যে-কোন দেশের সাহিত্যিকের পরম কাম্য।

'কল্লোল' যুগ ও অচিন্ত্যকুমার

অচ্যুত গোস্বামী

এক

আজকের দিনের কলকাতা শহরের অনেক ভাল ভাল লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করলেও 'কল্লোল' পত্রিকার দু-একখানা কপিও মেলা দুষ্কর। কিন্তু আশ্চর্য, মাত্র বছর পঁচিশ-ত্রিশেক আগে এই পত্রিকাখানি সমসাময়িক বিস্তর লেখকের উৎসাহ-উদ্দীপনার, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে বহু ভাল ভাল 'ভদ্রলোকের' নৈশ সুনিদ্রায় দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বাঙলাদেশের সাহিত্য-জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কোন সময়েই একসঙ্গে এত জন শক্তিশালী লেখক এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে এতখানি আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন নি। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠীর। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কয়েকজন লেখক আজও বর্তমান এবং সুপরিচিত; কিন্তু একটি বিশিষ্ট যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং উপলক্ষণের সমবায়ে 'কল্লোল'-এর প্রকাশকালের কয়েক বছরে যে-একটি সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস আজকে অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকের কাছে এই যুগের তাৎপর্য অবহেলা করার মতো জিনিস নয়। তার খানিকটা মালমশলা মিলবে অচিন্ত্যকুমারের "কল্লোল যুগ" বইখানাতে।

এক হিসাবে বলা চলে, বাঙলাদেশে বুর্জোয়াধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির যে-প্রয়াস 'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে প্রথম সূচিত হয়েছিল, 'কল্লোল' যুগ তারই প্রান্তসীমায় অবস্থিত। মধ্যযুগীয় সংস্কারে পীড়িত ঔপনিবেশিক দেশে বুর্জোয়াধর্মী সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও তার সমস্তগুলি লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেরি হচ্ছিল। সেই শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ করে একটি চক্রের আবর্তন শেষ করলেন 'কল্লোল' যুগের লেখকেরা। এই লেখকদের শক্তির উৎস এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা— এই দুই মিলিয়ে তাঁদের যা দেওয়ার ছিল তা পাওয়ার পর বাঙলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থানকালের এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল যাতে প্রগতিশীল বুর্জোয়া চিন্তাধারার থেকে আর কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে এল; আর 'কল্লোল' যুগের যে-লেখকেরা আজও বেঁচে রয়েছেন তাঁরা তাঁদের পরিণত

বুদ্ধি আর মন নিয়ে আজ তাঁদের এককালের অপরিণত মনের ফসলের দিকে শুধু তাকিয়েই রয়েছেন আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন। কোন লেখক-বিশেষের জীবনের পরিণতি নয়, একটা গোটা যুগের লেখকদের এই পরিণতি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের একটি গভীরতম ট্র্যাজিডি, যার তাৎপর্য গভীরভাবে অনুশীলন-সাপেক্ষ এবং শিক্ষাপ্রদ।

চৌরিচৌরার তুচ্ছ ঘটনাকে অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করে আমাদের সংগ্রামী নেতা গান্ধীজী ১৯২১-এর অত বড় আইন-অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করলেন। সেই প্রচণ্ড জাতীয় আন্দোলনের এই অপঘাত মৃত্যুতে গণমানসে সেদিন বিরক্তির কোন সীমা ছিল না; এবং পরবর্তী কয়েকটি বছর তারই ফল হিসাবে হতাশা-নিরাশায়, মারামারি-দলাদলিতে দেশের আকাশ-বাতাস একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আমাদের ক্লিষ্ট জাতীয় মানসে একটি ঘোষণা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছিল: "আমরা পারি—পারি সংগ্রাম করতে, মৃত্যুবরণ করতে।" ১৯২১-এর ব্যর্থ আন্দোলন আমাদের মনে এই যে সাহস এনে দিয়েছিল তা সেই সঙ্গেই এনে দিয়েছিল অপরিমিত আশা। আজ ভুলে গেলে চলবে না যে এই কয় বছরের মধ্যে যে-জনমত তৈরি হয়েছিল তারই চাপে ১৯২৯-এ দক্ষিণপন্থী নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চরম লক্ষ্যকে সামনে রেখে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্ম আমাদের গণ-মানসের এই যে প্রস্তুতি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'কল্লোল' যুগের সাহিত্য-আন্দোলনকে বিচার করলে এই যুগকে বোঝা অনেকটা সহজ হবে। যদিও আলোচ্য লেখকেরা এ-কথা শুনলে লাঠি নিয়ে মারতে ওঠাও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটা যোগাযোগ আবিষ্কার করা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়, সেখানে একই চিন্তাধারা এবং প্রেরণা দুটি ভিন্ন রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। যদিও পূর্ববর্তী সাহিত্যের মতোই 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকে কদাচিৎই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবু আমাদের চোখ এড়ায় না যে নজরুলের মতো চরমপন্থী বিদ্রোহী কবি এই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্যতম, এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয়। কঠিন অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকাটিকে সচল রাখার পিছনে 'কল্লোল'-এর লেখকদের যে-ত্যাগস্বীকার ও সুগভীর বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন বারবার

বলতেন, "আমরা কেউ বিয়ে করব না, একটা ব্যারাক-বাড়িতে একসঙ্গে থাকব আর সাহিত্যচর্চা করব"—এ আমাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক নয়; তখনকার আবহাওয়াতেই ছিল এই জিনিস। অথচ, নির্বিঘ্ন সাহিত্যসাধনার জন্য বিয়ে করব না বলে পণ করেছিলেন কারা? তাঁরাই—যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নরনারীর যৌন ব্যাপারে সমস্ত আবরণ এবং সংস্কারকে বর্জন করে তার অকুণ্ঠ প্রকাশের সমর্থক ছিলেন। যাঁরা এই যুগের লেখাকে তরলমতি লেখকদের চপলচিত্ত সাহিত্য বলে মনে করেন তাঁদের এই কথাটা স্মরণে রাখা দরকার।

'কল্লোল'-এর লেখকেরা পত্রিকা প্রকাশের সময় এবং তার অনতিপরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করেন তার পিছনে যে কোন বিদ্রোহাত্মক প্রেরণা ছিল তা আজকে অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর হওয়াও বিচিত্র নয়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের পূর্ববর্তী সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা নরেশচন্দ্রের কয়েকখানা বইতে, প্রচলিত সমাজনীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার অসামঞ্জস্য নিয়ে যে-আলোচনা হয়ে গিয়েছিল, 'কল্লোল'-এর লেখকদের মধ্যে তার চেয়ে অধিকতর বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার প্রকাশ তো পাই-ই না, বরং সেই জিনিসটার আরো বিস্তৃত আরো বস্তুতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ যদি আশা করি, তাতেও নিরাশ হতে হয়। কিন্তু এই লেখকদের রচনায় সুস্পষ্ট বিদ্রোহের কোনরূপ প্রকাশ না পেলেও নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রচুর ছিল—যে-লক্ষণগুলি শিশুসুলভ হলেও, ধীর-স্থির চিন্তা আর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘাতসহ না হলেও, চরমপন্থী ছিল। তার সহজ প্রমাণ হল তাঁদের লেখার সুস্পষ্ট রোমান্টিসিজম।

'কল্লোল' যুগের লেখকরা পূর্ববর্তী লেখকদের চেয়ে বেশি পরিমাণে মধ্য-যুগীয় অনুশাসনকে অস্বীকার করে, জাতি-ধর্ম-পরিবেশের বাধা থেকে মুক্ত, উদ্দাম, আবেগবান এবং শরীরী প্রেমের রোমান্টিক চিত্র বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত করলেন। অনেক সময়ে এই প্রেম জোরালো, আবেগময় রূপ নিয়েছে, যদিও অস্থায়িভাবে। অনেক সময়ে বা, বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর লেখায়, নায়ক রোমান্টিক হলেও, তার philandering বা একের পর এক 'প্রেম' করে চলার নেশা ইতিমধ্যেই একটা ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া বিকৃতির আভাস প্রকাশ করেছে। এই সব প্রেমের চিত্রে লেখকেরা যদি সমাজকে উপস্থিত করতেন, তবে সমাজের সঙ্গে নায়ক-নায়িকার ঘাতপ্রতিঘাত এবং পরিণামে

সার্থকতা বা ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে একটি পূর্ণ বিদ্রোহ-চিত্র এবং সেই সঙ্গে একটি বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারা প্রকাশ পেত। (বুর্জোয়া সাহিত্যে ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই নায়কের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহের রূপটা বেশি প্রকাশ পায়)। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার মানস-ক্ষেত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই প্রেম ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। অনেক চরিত্রের ভিড় যে-সব বইতে হয়েছে লেখকেরা সেখানে যাযাবরপন্থী; বিচিত্র জীবনের অজস্র সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণার কাহিনীর স্রোত লেখকের মনে যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করছে তাতেই তাঁদের রোমান্টিসিজমের চরম স্ফূর্তি। এই যে কূপমণ্ডুক রোমান্টিসিজম্, এই যে সমাজের ক্ষেত্রে কোন সামান্যতম বিদ্রোহ বা প্রতিবাদকে লিপিবদ্ধ করার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা, একে আড়াল করার জন্য এই লেখকেরা 'শিল্পের জন্যই শিল্প'-নীতির ধুয়া তুলেছিলেন, যাকে তাঁরা অনেক সময়ে 'শিল্প আমার জন্যই' বলতে আরও ভালবাসতেন—তাতে ব্যক্তিমানসের মুক্তির প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে বলে নয়, সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানসের আত্ম-কণ্ডূয়নের বেশি সুবিধা হয় বলে। কাজেই, 'কল্লোল' যুগের রোমান্টিসিজমের পিছনে ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক গণচেতনা যা জুগিয়েছিল চরমপন্থী বিদ্রোহ-লক্ষণ, আর সামনে ছিল বিশ্বজোড়া মন্দার বাজারে সাম্রাজ্যবাদের শোষণে ক্লিষ্ট, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় আস্থাহীন জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বিধাগ্রস্ত, সতর্ক পদক্ষেপ, যার জন্য এই বিদ্রোহ-লক্ষণ কোন সুষ্ঠু বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে নি। তৎকালীন দোলাচল কংগ্রেসী রাজ-নীতিকে বিশ্লেষণ করলে সেখানেও এই খানিকটা প্রগতিশীল খানিকটা প্রতিক্রিয়ার কবলভুক্ত, পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার প্রকাশ মিলবে।

এই বিদ্রোহ-লক্ষণ তাহলে কোন পরিপূর্ণ সমাজনৈতিক বা রাজনৈতিক বিদ্রোহে রূপ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত সাহিত্যরীতিতে খানিকটা বিপর্যয়সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যের শুচিবায়ুগ্রস্ত ঐতিহ্য শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যে নরনারীর দৈহিক ব্যাপারটাকে আক্ষরিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। 'কল্লোল'-এর সমসাময়িক লেখকরা সর্বপ্রথম সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরীরকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দান করে 'শনিবারের চিঠি'র বিরাগভাজন ও পরবর্তীকালের লেখকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছিলেন। সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রে এই লেখকদের দ্বিতীয় অবদান চলিত ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ। চলিত ভাষা যে লিখিত ভাষার চেয়ে বেশি ধারালো এবং সাবলীল হতে পারে এবং লেখককে অনেক বেশি প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়,—এই

আবিষ্কার তাঁদের ; এবং এইভাবে প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ ভাষার ক্ষেত্রে যে নতুন পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তাঁরা তাকে পরিণত রূপ দান করেন।

আর একটি ক্ষেত্রে 'কল্লোল'এর লেখকেরা উজ্জ্বল উত্তরাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বপ্রথম অবহেলিত শ্রেণীকে স্থান দেন, এবং এই ব্যাপারে 'কল্লোল' পত্রিকার চেয়ে 'সংহতি' আর 'উত্তরা'ই বেশি অগ্রণী ছিল। অবহেলিত শ্রেণীকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার পিছনকার মূল প্রেরণা ছিল রোমান্টিক। দুঃখ-দৈন্যের চিত্রে কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তিই না সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠবেন? অবশ্য শুধু দরদ আর সহানুভূতি নিয়েই যে তাঁরা অবহেলিত শ্রেণীর কাছে গিয়েছেন তাই নয়। তা হলে চোর, পকেটমার, ভিখিরি, লাইসেন্স-পাওয়া বা লাইসেন্সহীন বারবণিতার কাছে বেশি না গিয়ে তাঁরা সংঘবদ্ধ মজুর শ্রেণীর কাছে বেশি যেতে পারতেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ অর্থাৎ ফ্যাক্টরির মজুর শ্রেণী বড় বেশি স্পষ্ট আর বাস্তব—তার রোমান্টিক সম্ভাবনা কম। পক্ষান্তরে ভিখিরি বা চোরের জীবনকে ঘিরে রয়েছে একটা গভীর রহস্যের জাল ; সেখানে খানিকটা বাস্তবের সঙ্গে খানিকটা কল্পনা মিলিয়ে নিলে অনেক বিচিত্র রস-সৃষ্টির উপকরণ মেলে। এই রসসৃষ্টি ও রস-বৈচিত্র্যের উপকরণ সংগ্রহই সেদিনকার মূল প্রেরণা ছিল ; এবং আসলে এটিও একটা সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রের বিদ্রোহ। কারণ, ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসুন্দর হীনজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

'কল্লোল' যুগের লেখকদের সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুর পরে এইবার আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে একটি বিদ্রোহাত্মক পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের থেকে এবং তৎসংক্রান্ত দায়িত্বের থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ফলে এই সাহিত্যিকদের অকাল মৃত্যুর পথ তৈরি হয়েছিল। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, এমন কি অর্থনীতিকে মিলিয়ে জীবনের যে জটিল সমগ্রতা, সেই সমগ্রতাকে একটি একক সত্তা হিসাবে না দেখে জীবনকে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদির কতকগুলি স্বতন্ত্র বিভাগের সমষ্টি হিসাবে দেখার যে বুর্জোয়া ভ্রান্তি, তারই অবধারিত ফল হিসাবে এই লেখকেরা বিদ্রোহ-লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও, যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হয়েও কোন সুস্থ সবল জীবনবোধকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর সেই কারণেই তাঁদের সাহিত্যে শুধু

অভিনব উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে, অভিনব কাঠামোই তৈরি হয়েছে, প্রাণসঞ্চার হয় নি। প্রথম জীবনে তাঁরা অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যত বড় প্রতিভারই অধিকারী হোন, তাঁকে অতিক্রম করে যেতে না পারলে তাঁদের সাহিত্যিক জীবনে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এবং সেই অতিক্রমণের প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে, বোধহয় ১৯৩৮-৩৯ সালের দিকে, বিভিন্ন লেখায় এই সাহিত্যিকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে গ্রহণ করে ভক্তির আতিশয্যে তাঁকে সাহিত্যের শেষ কথা বলে বর্ণনা করেছেন; সেই সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে নিজেদের দীর্ঘ সাহিত্যসাধনায় তাঁরা এমন কিছু উপস্থিত করতে পারেন নি যাকে রবীন্দ্রোত্তর বলা যায়।

'কল্লোল' যুগের লেখকদের শেষ পরিণতির কথাও একটু উল্লেখ না করলে চলে না। 'কল্লোল' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে ১৯৩০-এর কংগ্রেসী আইন-অমান্য আন্দোলনও পরাজয়ের ভিতর দিয়ে শেষ হল। ১৯২১-এর আন্দোলনের পরবর্তী কালের তুলনায় এবারকার হতাশা-নিরাশা হয়েছিল অনেক বেশি। বিশ্বব্যাপী মন্দার অংশীদার হিসাবে ভারতের আর্থিক অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে 'কল্লোল'-এর লেখকেরা কয়েক বছর অবিশ্রাম লিখে চললেন। কিন্তু তাঁদের প্রথম যৌবনের রোমান্টিসিজমের ধার এবং সজীবতা ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে এল। সাহিত্যরীতি সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নেওয়ার পর তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ঝিমিয়ে এল, কাজেই সেদিক দিয়েও আর উৎসাহের কোন সুযোগ রইল না। শেষের দিকে তাঁরা বিকৃত মনের আধা-ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু সেও অল্পকালের জন্য। শীঘ্রই দেখা গেল, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। আগের চেয়েও অবাস্তব এবং কৃত্রিম বিষয়বস্তু নিয়ে ফাঁকা আসরে প্রবোধ সান্যাল তখনো লিখে চলেছেন। আর পরিমাণে অনেক কম হয়ে গেলেও লেখার অভ্যাসটা আজও বজায় রেখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ভারতের জাতিসমস্যা ও ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে স্তালিনের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর তার ভিত্তিতে প্রায় সমস্ত দেশের মার্কসবাদী পত্র ও পত্রিকাগুলিতে অনেক আলোচনা হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে মার্কসবাদী এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে খুব বেশি কিছু করা হয় নাই। মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে 'মার্কসবাদী বঙ্কিম বিচার' প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় নীরেন্দ্রনাথ রায় এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঠিক কাজই করেছেন।

আমাদের পক্ষে স্তালিনের প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব রয়েছে দুই দিক থেকে। প্রথমত, স্তালিন অনেকগুলি সূত্র নির্দেশ করেছেন যা মার্কসবাদের সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে, মার্কসীয় বিচার ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যাপারে, অনেক নতুন অবদান দিয়েছে। অন্যান্য দেশের মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকাতে প্রধানত এই দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিকটির গুরুত্বও যথেষ্ট। তা হ'ল স্তালিনের নির্দেশিত পথে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার সম্ভাবনা। গত নভেম্বর সংখ্যা সোভিয়েট লিটারেচারে অ্যাকাডেমিসিয়ান ভিনোগ্রাদফের "Soviet Linguistic on a New Path" নামে প্রবন্ধটি এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য ক'রবে।

মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের সম্বন্ধে গবেষণার কাজে দুইটি দিকের প্রতি নজর রাখতে হবে। একটি হ'ল গবেষণার তত্ত্বগত দিক এবং অপরটি হ'ল ব্যবহারিক দিক। দুইটি দিকই পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তত্ত্বগত দিকের একটি অঙ্গ হ'ল মার্কসীয় বিচার ও বিশ্লেষণ তথা অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ ও তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা। এটি না হ'লে জ্ঞানের যে-কোন শাখাতেই মার্কসীয় গবেষণার কাজ বেশিদূর এগোতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ভাষাতত্ত্ব (জ্ঞানের যে-কোন শাখার সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য) সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত অ-মার্কসীয় গবেষকদের যে-সব সিদ্ধান্ত, অনুমান ও অবদান সঞ্চিত হয়েছে সেগুলির সঠিক সমালোচনা এবং পর্যালোচনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসকে মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার ক'রে দেখতে হবে। নতুবা সত্যকার মার্কসীয় গবেষণা সম্ভব নয়।

ব্যবহারিক দিক বলতে কী বোঝায়? গবেষণার উদ্দেশ্য কী হবে, গণ-আন্দোলনের অগ্রগতিতে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা কিভাবে সাহায্য করবে, কতটুকু মূল্য দেওয়া চলে তাকে—এই সব প্রশ্ন ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে জড়িত। এই প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব না দিলে গবেষণার পরিপ্রেক্ষিত অস্পষ্ট থেকে যাবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকলে তার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার নিবিড় সম্বন্ধের কথা উপলব্ধি ক'রে তবেই সে-কাজে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাবে।

প্রথমটি অর্থাৎ তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার অধিকার আমার নেই। যাঁরা এ-বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা এগিয়ে আসলে সত্যকার পথিকৃতের কাজ করতে পারবেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা লিখতে চাই। ভিনোগ্রাদফের উক্ত প্রবন্ধে তিনি একটি কথা বলেছেন যা থেকে আমি ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনার পথনির্দেশ খুঁজে পেয়েছি। ভিনোগ্রাদফ বলেছেন যে, ভাষাতত্ত্বের সাধারণ তত্ত্বকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার থেকে কোনমতেই বিচ্ছিন্ন করা চলে না। সোভিয়েট ইউনিয়নে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজ সোভিয়েটের জাতিগত নীতির (national policy) সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির ভাষার বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে স্তালিনের শিক্ষাকে ভিত্তি করেই সোভিয়েট ইউনিয়নে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়।

বহু জাতির দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন। বহু জাতির স্বেচ্ছামূলক এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে মিলনের মাধ্যমে গ'ড়ে উঠেছে সোভিয়েট মহাজাতি। সোভিয়েটের সংস্কৃতি বহুজাতিক—বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি এক, কিন্তু আধারের (form) দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়বস্তু সমাজতান্ত্রিক কিন্তু আধার জাতীয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার সময়ে বিকাশের দিক দিয়ে বিভিন্ন জাতি খুবই অ-সম অবস্থায় ছিল। অনেকের কোন লিখিত ভাষা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সম্পদের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে। কোন জাতির ভাষাকে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া দূরে থাকুক, যাদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না তাদের জন্য লিপি সৃষ্টি ক'রে ভাষার বিকাশকে দ্রুত করেছে। তাই

দেখা যায় সমাজতন্ত্রের পরিবেশে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি ফলেফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

নতুন চীনেও সমস্ত জাতি ও উপজাতিকে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও যে-সব পশ্চাৎপদ জাতি ও উপজাতির লিখিত ভাষা ছিল না তাদের জন্য নতুন লিপি সৃষ্টির দ্বারা তাদের বিকাশে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু হ'ল এক এবং অভিন্ন অর্থাৎ নতুন গণতান্ত্রিক এবং আধার ভিন্ন অর্থাৎ জাতীয়।

ভারতবর্ষও বহুজাতির দেশ। এখানেও জাতিক ও তথা সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি নিতান্ত অ-সম স্তরে রয়েছে। বহু উন্নত এবং সমৃদ্ধ ভাষা-ও-সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতির পাশাপাশি এমন বহু জাতি ও উপজাতি রয়ে গেছে যারা বিকাশের দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে। তাদের অনেকের কোন লিখিত ভাষা নেই। মার্কসবাদীদের কাছে এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ। জনগণতান্ত্রিক ভারতে প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি মিলিত হবে স্বেচ্ছায় ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে। প্রত্যেক জাতি ও উপজাতিকে তার নিজস্ব ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ এবং সাহায্য দেওয়া হবে। এখানেও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি হবে বহুজাতিক, বিষয়বস্তু জন-গণতান্ত্রিক এবং আধার জাতীয়।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের এই সাধারণ সূত্রটি মেনে ও ঘোষণা ক'রে নিশ্চিন্ত বসে থাকা চলতে পারে না। কারণ ভারতের রঙ্গমঞ্চে যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সংঘাত চলছে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে তাদের নীতিও পরস্পর-বিরোধী। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর নীতি হ'ল পশ্চাৎপদ জাতি ও উপ-জাতিগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে প্রতিবেশী উন্নততর জাতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। পশ্চাৎপদ জাতি ও উপজাতির ভাষা সম্বন্ধেও শাসক-গোষ্ঠী সেই একই নীতি অনুসরণ করছে। জাতিতে জাতিতে ঝগড়া বাধানো, এক জাতির লোকদের অন্য জাতির শাসক এবং আমলাতন্ত্রের অধীন ক'রে রাখা, ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলির সম্বন্ধে ভারতের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ক্রমশ সচেতন হ'য়ে উঠছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নীতির একটি দিক অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। তা হ'ল অনুন্নত উপজাতিগুলির, এক কথায় যারা আদিবাসী

ব'লে পরিচিত তাদের জাতীয় অস্তিত্ব এবং ভাষা সম্বন্ধে শাসক-গোষ্ঠীর নীতি।

শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে যে-সব কাজ করা হয় সেগুলির সম্বন্ধে অনেকেরই নজর পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কি হয়তো সচেতন ভাবে শাসকগোষ্ঠীর নীতি অনুসরণ করছে না এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যখন কার্যত শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নীতির আধার হয়ে পড়ে তখন তা' নজর এড়িয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এই সব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কার্যকলাপ তত্ত্ব বা মতবাদের রূপে দেখা দেয়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভারতীয় 'আদিম জাতি সেবক সংঘ' ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ করে। সংঘের দ্বারা প্রকাশিত "Tribes of India" বইটির প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই সব উপজাতিদের যত অল্প সময়ে সম্ভব প্রদেশ বা রাজ্যের সাধারণ জনসংখ্যার মধ্যে মিশিয়ে নিতে হবে। অবশ্য হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে তাদের বর্তমান জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদিতে যতটা সম্ভব কম ব্যাঘাত ঘটিয়েই মিশিয়ে ফেলতে হবে। খুব মোলায়েম ভাবে কথাটি বলা হলেও তার মোদ্দা অর্থ দাঁড়ায় উক্ত উপজাতিদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদদের সর্বাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নামে বইতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোর প্রসঙ্গে তিনি ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন যে অনুন্নত অনার্যভাষী উপজাতিদের ভাষাগুলি ক্রমশ প্রতিবেশী উন্নততর আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কার্যত পশ্চাৎপদ জাতি ও উপজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপের নীতিকে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই ধরনের মতবাদ বা তত্ত্বগত প্রচারের ফলে অনেক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যক্তিও বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। সুতরাং আদর্শগত সংগ্রামের এই ক্ষেত্রেও মার্কসবাদীদের এগিয়ে আসতে হবে। ভাষাতত্ত্বের মার্কসীয় গবেষণার সাহায্যে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল জাতিগত নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে।

ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আদর্শগত লড়াই চালাতে হলে প্রথমেই কয়েকটি

প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। সেই প্রশ্নগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। (১) যে সব জাতি বা উপজাতি খুবই পিছনে পড়ে আছে, যাদের ভাষা খুব অনুন্নত, তাদের ভাষাকে বিকশিত ক'রে তোলার নীতি জন-গণতান্ত্রিক ভারতে অনুসরণ করা হবে কেন? এখনই বা কেন আমরা প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির ভাষা বিকাশে উৎসাহদান এবং সাহায্য করার নীতি নিয়ে লড়াই করব? (২) জন-গণতান্ত্রিক ভারতকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পথে কি ঐ নীতি বাধা সৃষ্টি করবে না? অর্থাৎ ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করবে না? (৩) মার্কসবাদীরা বলেন যে সারা দুনিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে বিভিন্ন ভাষার বদলে একটি সার্বজনীন ভাষা গড়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ভাষা, এমন কি যেগুলি হয়তো বিলুপ্তির পথে, তাদেরও বাঁচিয়ে রাখতে ও পুনরুজ্জীবিত করতে চাই কেন? (৪) অতীতে অনেক ভাষা উন্নততর ভাষার সংস্পর্শে এসে দ্বিতীয়টির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহলে সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে আমরা অস্বীকার করতে চাই কি?

স্তালিনের নির্দেশিত সূত্রগুলি এই সমস্ত প্রশ্নের সহজ অথচ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ জবাব দেয় এবং সমস্ত সন্দেহের নিরসন করে।

কোন জাতির ভাষা হ'ল সেই জাতির জনগণের সমবেত সৃষ্টি। বহু শতাব্দী ধরে ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণ যৌথভাবে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি করে। তাদের যুগযুগসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত হয় এবং ভাষাকে ক্রমে নিত্য-নূতন সম্পদে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। ঐতিহাসিক সামাজিক পরিস্থিতির বিশেষত্বের দরুন প্রত্যেক জাতির বিকাশের প্রক্রিয়ায় যে-বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয়, মননভঙ্গির যে-বিশেষত্ব গড়ে ওঠে সেগুলির সাক্ষ্য ভাষা তার নিজের অঙ্গে বহন করে। ভাষার এই প্রকৃতির দরুনই তার জীবনীশক্তি খুব প্রবল এবং প্রতিরোধশক্তি বিরাট। জোর ক'রে কোন ভাষাকে বিলোপ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে তা' দীর্ঘকাল ধরে প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালাতে পারে।

জাতির জীবনের সূত্রপাত থেকে অগ্রগতির প্রত্যেক ধাপে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিত্যলব্ধ সম্পদকে তারা আপনার করে নেয় নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং জন-গণতান্ত্রিক ভারতে প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির জন-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হ'লে, তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ

ক'রে তুলতে হলে, তাদের নিজ ভাষার মাধ্যমেই সে-কাজ পূর্ণ হ'তে পারে। নতুবা সে-সংস্কৃতি তাদের জীবনের গভীরে শিকড় বিস্তার ক'রে প্রাণরস সংগ্রহে সমর্থ হবে না। অন্য পক্ষে জাতীয় আধারের সহায়তায় জন-গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু যে-পরিমাণে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির জীবনে স্থায়ী আসন করে নেবে সেই পরিমাণে তাদের মধ্যে মিলনের সেতু প্রশস্ত হবে, যোগাযোগ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হবে। যাঁরা আধারের পার্থক্যকে বড় করে দেখে কৃত্রিম উপায়ে বা জোর করে সেই পার্থক্য দূর করতে চাইবেন তাঁরা ততই বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিকে পরস্পরের থেকে দূরে ঠেলে দেবেন, ঐক্যের বদলে বড় ক'রে তুলবেন বিভেদকেই। প্রগতিশীল ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিষয়বস্তুর ঐক্যকে বড় ক'রে দেখবেন, আধারের পার্থক্যকে নয়। সংক্ষেপে এই হ'ল প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর কমরেড স্তালিন খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন, খোলোপভের চিঠির জবাবে। সেই সূত্রগুলি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভাষাতত্ত্ববিদদের হাতে অমোঘ অস্ত্র তুলে দিয়েছে। অতীতে যখন একটি ভাষা অন্য একটির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই ঘটনা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ক'রলে কী দেখা যায়? দুটি ভাষা পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে, জাতিগত দ্বন্দ্ব, জাতিগত অত্যাচার, এক কথায় বিজেতা ও বিজিত জাতির সম্বন্ধের অঙ্গ রূপে। সেখানে জবরদস্তি করে একটা ভাষা অন্যকে গ্রাসের চেষ্টা করেছে। সেখানে দুইটি ভাষার মিশ্রণ হয়েছে সংঘাতের মধ্য দিয়ে—একটির জয়ে ও অপরটির পরাজয়ে। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও জয়পরাজয় হঠাৎ নির্ধারিত হয় নাই। বিজিতের ভাষা বহুদিন ধ'রে আত্মরক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধ চালায় এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'লেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না। উন্নততর ভাষার অঙ্গে নিজের ছাপ, রীতিনীতি, শব্দ ইত্যাদি রেখে যায়।

জাতিগত অত্যাচার, ঔপনিবেশিক নীতি, জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিবেশে দুটি ভাষার মিশ্রণ হয় একমাত্র এইভাবে। আর যে-পরিবেশ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেখানে জাতিগত অত্যাচার এবং দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে—বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাষা যেখানে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে সহযোগী হিসাবে—সেখানে এর বিপরীত প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হয়। প্রত্যেক জাতির ভাষা পরস্পরের বিকাশে সাহায্য ক'রে, সম্পদ বিনিময়ের

যারা একে অন্যকে সমৃদ্ধ ক'রে এবং এইভাবে পরস্পরের হাত ধ'রে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে মহামিলনের পথে এগিয়ে যায়। সে-মিলনকে কৃত্রিম উপায়ে বা জবরদস্তি করে ত্বরান্বিত করা যায় না। ইতিহাসের নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই তা ঘটবে সমস্ত দুনিয়াতে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পর। প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়বস্তুর অভিন্নতা এবং প্রত্যেকের মধ্যে নিবিড় সহ-যোগিতার পরিণতি হিসাবেই তা' ঘটবে।

সুতরাং সমস্ত দুনিয়াতে একদিন এক ভাষা হবে ব'লে আজ জবরদস্তি করে কোন জাতি বা উপজাতির ভাষাকে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে প্রশ্ন তুলতে পারেন তাঁরাই যাঁরা ইতিহাসের নিয়মের বিরুদ্ধে, যাঁরা জাতিগত অত্যাচার ও ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের আদর্শে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গবেষণা করেন অথবা ক'রবেন।

প্রগতিশীল ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ক'রবেন প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির স্বাধিকার, তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়ে। ভাষার বিকাশের ইতিহাসকে অধ্যয়ন ক'রবেন সেই ভাষাভাষী জাতির বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে। তাহলে তাঁর দৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ স্পষ্ট। তিনি ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে পরিচিত হবেন, জন-গণের অতীত ইতিহাসের নতুন নতুন দিক তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি জাতির জনগণের অন্তরে পৌঁছে দেবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারবেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে ও নতুন চীনে এই ভাবেই ভাষাতত্ত্বের গবেষণা চলেছে।

শুধু ভবিষ্যতের জন্যই নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান অধ্যায়েও এই ধরনের গবেষণার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসী সরকারের ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তো বটেই। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিস্তৃত করা এবং তাদের মধ্যে থেকে নেতৃস্থানীয় কর্মী গড়ে তোলার জন্যও এ কাজ অপরিহার্য। কেননা নেতৃস্থানীয় কর্মী গড়ে ওঠার জন্য তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার।

কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে যাঁরা গবেষণার কাজে অগ্রসর হবেন তাঁদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হ'তে বাধ্য। তাঁরা বাস্তবকে উপলব্ধি

ক'রতে অসমর্থ হবেন, সুতরাং তাঁদের বিশ্লেষণ হবে অবৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব-বিরোধী। পশ্চাৎপদ উপজাতির ভাষা বিলোপের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা' নামে বইটিতে। একটি হ'ল উন্নততর আর্যভাষার সংস্পর্শে এসে দক্ষিণ অথবা কোল ভাষীদের ভাষার বিলুপ্তির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দ্বিতীয়ত তাঁর নিজেরই কথায় প্রমাণ হয় যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধ'রে এই প্রক্রিয়া চলেছে, আজও পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। পরিসমাপ্তি ঘটতে আরও দুই তিন শতক সময় লাগবে ব'লে তিনি অনুমান করেন। অথচ এই দৃষ্টান্তের মধ্যে থেকে কী সত্য ফুটে ওঠে? ফুটে ওঠে এই যে পশ্চাৎপদ কোলভাষীরা সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে উন্নততর আর্যভাষার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে—আজও নিজেদের ভাষাকে বিলুপ্ত হ'তে দেয় নাই। প্রবন্ধের আয়তন বেশি না বাড়িয়ে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ ক'রছি। সুনীতিবাবু বলেছেন আসাম, বাঙলা ও নেপালের সমতল ভূমিতে ভোটচীন-ভাষীরা ক্রমে আর্যভাষী হয়ে পড়ছে। এখানেও বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত সত্য থেকে দূরে সরে গেছে। ভোট-চীন-ভাষীদের ভাষার আর্যীকরণের প্রতিক্রিয়ার পটভূমি হ'ল জাতিগত শোষণ ও অত্যাচার। আর্যভাষী উন্নততর জাতির লোকেরা ভোটচীন-ভাষীদের সংস্পর্শে এসেছে জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিগত শোষণের পতাকা নিয়ে। তাই সেখানে ভাষার আর্যীকরণের প্রক্রিয়া চলেছে স্বাভাবিক ও শান্ত পরিবেশে নয়—জাতি-এবং-ভাষাগত দ্বন্দ্বের পরিবেশে। সেখানেও ভোটচীন-ভাষীদের ভাষার প্রতিরোধ প্রবল। আজও তারা সম্পূর্ণ পরাজয় মেনে নেয় নাই। নেপালের সমতল ভূমিতে ভোট-চীনগোষ্ঠীর ভাষাভাষী নেওয়ারীরা আর্যভাষা নেপালী শিখলেও নিজেদের ভাষাকে সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছে। নেওয়ারীর প্রাচীন সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে নেওয়ারী ভাষায় আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা হ'চ্ছে!

অনুন্নত আর্যভাষী উপজাতিগুলির ভাষার সঙ্গে প্রতিবেশী উন্নততর আর্যভাষাগুলির যে-দ্বন্দ্ব চলেছে তার শেষ হবে কী ভাবে? কী ভাবে শেষ হবে তা' নির্ভর করে ভারতের মাটিতে আজ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব চলেছে তার পরিণতির উপর। আমরা জানি যে প্রগতির শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উপরোক্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে অনুন্নত আদিবাসীদের ভাষার আর্যীকরণে নয়, হবে তাদের ভাষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, উন্নতির পূর্ণ সুযোগে, জন-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনায়।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের উপন্যাস

সুধীরচন্দ্র রায়

বাঙলা কাব্য বা উপন্যাসে বাঙলাদেশের শিক্ষায়তনের ছবি বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বিদ্যালয়ের ডানপিটে বা বেপরোয়া ছেলেদের নিয়ে হয়তো বা লেখা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও বিদ্যালয়ের প্রভাব কম। যতদূর সম্ভব ইস্কুল-জীবনকে বর্জন করেই ছেলেদের চরিত্র কল্পিত।

যে-কোন কারণেই হোক আমাদের সাহিত্যিকেরা বিদ্যালয়কে বড় সুনজরে দেখেন নি। মুকুন্দরামও নন। সেখানে শিক্ষকের অত্যাচার কিংবা ঔদাসীনতা ব্যক্তিমনকে খর্ব করে এই কথাই সরবে স্বীকৃত। কিন্তু কোথায় অত্যাচার, অত্যাচারের মূল কারণ কি, কেনই বা শিক্ষকেরা উদাসীন, ঔদাসীন্য কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে—তার কথা কোথায়ও দেখতে পাইনে।

হয়তো অনেক শিক্ষাবিদ্ বলবেন, অত্যাচার বা ঔদাসীন্যের কারণ নির্দেশ করা তো অতি সহজ; কারণটা হচ্ছে, শিক্ষকেরা আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে! এর সঙ্গে দু-একটা সংস্কৃত শ্লোক জুড়ে দিয়ে বলা হবে—কলিযুগে এইরূপ ঘটবে, এ-কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু সে যাই হোক, ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব অত সহজ বিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না।

বাঙলাদেশে বিভূতিভূষণই এই বিষয় নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর পথের পাঁচালী আর অনুবর্তন, দুটি উপন্যাসই, শিক্ষাজীবন নিয়ে সুবিস্তৃতভাবে লেখা। এই দুইটি উপন্যাসে শিক্ষাজগতের সম্পর্কে যে-আলোচনা তিনি করেছেন, তার মূল ধারাগুলি আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বলতে চেষ্টা করব।

অনুবর্তন

অনুবর্তন লেখা শিক্ষকদের জীবন নিয়ে। শিক্ষকদের জীবনের প্রারম্ভকাল বহু পূর্ব থেকে শুরু হলেও, যবনিকা তোলা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে আর স্থান নির্বাচন করা হল কলকাতা শহর। শহর আর পল্লীর চেহারায় এমন কি তার বিদ্যালয়, শিক্ষক আর ছাত্রদের সম্পর্কেও বহু পার্থক্য থাকলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষকদের অবজ্ঞাত সমাজকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে বোধহয় 'অনুবর্তন'ই প্রথম এবং একক রচনা।

এই উপন্যাসে ছাত্রদের দিক কিংবা স্কুল কর্তৃপক্ষের দিক সম্বন্ধে বিশেষ

কিছু বলা হয় নি। চরিত্রের মধ্যে হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেব, বদু মাস্টার, নারাণবাবু, শ্রীশবাবু, ক্ষেত্রবাবু, বই-লিখিয়ে রাখাল মিত্তির, নতুন টীচার রামেন্দুবাবু, মিস্টার আলম আর মিস সিবসন।

ইস্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক হিসাবে নারাণবাবু আর ক্লার্কওয়েল সাহেবের নামই বিশেষ ক'রে বলতে হয়। ছেলেদের ভালো করবার আগ্রহ নারাণবাবুর মজ্জায় মজ্জায় এবং তাঁর ছোট্ট নোট-বইয়ে। যখনই ছাত্রদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখেছেন, তখনই তিনি সে-কথা নোট-বইয়ে লিখে রাখছেন। ইংরেজি গ্রামারে কেউ ভুল করল, অমনি তিনি লিখলেন, 'অমুক ছেলেটি গ্রামারে অমুক ভুল করে'। কোন নিন্দায় তিনি নেই, প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। জীবনে কোথায় এক দুঃখ আছে, তারই প্রভাবে স্নেহ আর সহানুভূতি চতুর্দিকে শাখা মেলে রয়েছে।

চুনিকে তিনি বাড়িতে পড়ান। ভালোও বাসেন। চুনি কি করে ভালো হবে, তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করবে—এই কথাই তাঁকে মশগুল ক'রে রেখেছে। কিন্তু দেখা গেল, সব কিছুকে ছাড়িয়ে তাঁর চুনি ক্রমেই কঠিন সমস্যাপূর্ণ চরিত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হয়, নারাণবাবু ভেবে পান না।

আসল কথা, নারাণবাবু শিক্ষক হিসেবে আদর্শবাদী, কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না। গ্রামারের ভুল বা চরিত্রের দুরন্তপনাকে সংশোধন করা দরকার, একথা যত নিষ্ঠার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক, সদিচ্ছার দ্বারা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, অক্সফর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্লার্কওয়েল সাহেবও এ বিষয়ে কার্যকরভাবে খুব বেশি কিছু ভাবেন বলে মনে হয় না। নারাণবাবু বাঙলাদেশের নিষ্ঠাবান শিক্ষক, কিন্তু বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্লার্কওয়েলও এমন বাঙালী ব'নে যাচ্ছেন—এটি যেন কেমন লাগে। অন্তত একটি শিশুর মানসিক সমস্যার সমাধান করতে পারা গেছে এমন প্রমাণ যদি থাকত তবে হয়তো ইস্কুলটা অমনভাবে ধ্বংসের মুখে যেত না। মিস্ সিবসনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু মিঃ আলমের মতো আমরাও মনে করি, ক্লার্কওয়েলের কোন প্রয়োজন নেই। নিপুণ পরিচালকের অভাবে নারাণবাবু এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলেন, নারাণবাবুর চরিত্রের সত্যকার ট্র্যাজেডি এই জায়গাতেই।

মনোবিদ্যার মতে, চুনি যে খুবই একটা কঠিন ছেলে (difficult child) এমন মনে হয় না। দুরন্তপনার মধ্যে, সে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, শিক্ষক-

মহাশয়ের চা-প্রদানের মধ্যেও বৈষয়িকতা দেখায়, নারাণবাবুর স্নেহকে স্বীকার করে না, মানুষের অন্তরের দিকে তার নজর কম, মায়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে, পরিশেষে, সে ইস্কুলের পরীক্ষায় নকল করে। বাঙলাদেশের যে-ঘরের ছেলে পরবর্তীকালে ডেপুটি হবে কিংবা নিজের কার্মে বসবে—চুনি সেই ঘরেরই একটি বিশেষ ছেলে। কাজেই দেখা যায়, চুনির এই বৃত্তির মূলে তার গৃহের পরিবেশ। আর, গৃহের পরিবেশ সম্বন্ধেও তো আমরা বেশ জানি। মাঝে মাঝেই বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত গৃহশিক্ষকের কাজের হিসাব নিতে আসেন। এই আওতায় এমন ছেলেই দেখা যাবে। বিভূতিবাবু, বাঙলাদেশের গৃহ-শিক্ষকদের নিয়োগকর্তার একেবারে সত্যকার মনের ছবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু ক্লার্কওয়েল সাহেবের কর্তব্যটিকে তিনি নির্দেশ করতে পারেন নি।

অস্নফর্ড পর্যন্ত আমাদের যাবার দরকার নেই, বাঙলাদেশে শিক্ষাবিদেরাও জানেন, এ অবস্থায় ইস্কুল আর গৃহকে অনুবদ্ধ ক'রে শিক্ষায়তন চালানোই আদর্শ বিদ্যালয়ের মাপকাঠি। চুনির বাবার কাছে ক্লার্কওয়েল সাহেবের এমন ধরনের চিঠিই আসা উচিত ছিল। এ কথাও অনস্বীকার্য, ক্লার্কওয়েল সাহেব সে অবস্থায়ও ব্যর্থ হতেন, কিংবা চুনিকে চুনির বাবা অন্যত্র হয়তো ভর্তি করে দিতেন। কিন্তু সেখানেই ক্লার্কওয়েলের চরিত্রের সত্যকার দিকটি প্রকাশ পেত।

ক্লার্কসাহেব কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। শিক্ষকদের সম্বন্ধে কমিটিতে তাঁর দরদ প্রকাশের অন্ত নেই। ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট। এমন কি শূন্তকদেরও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমোশন ডেকে গেলেন। প্রহসন হলেও তিনি অনুষ্ঠানের নিষ্ঠায় বিশ্বাসী। সবই সত্য, কিন্তু সত্য নয় যে তিনি আদর্শ প্রধান-শিক্ষক। শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কম। শিক্ষকেরা ত্রুটি করলে তাঁর দরজা খুলে ধরেন শিক্ষককে বেরিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ঐ হুকুমনিষ্ঠা একটি সৈন্যবিভাগের ইংরেজ দিয়েও হতে পারত। ইংরেজ শিক্ষাবিদের চরিত্র ঐরূপ হওয়া বেমানান! পয়সা-কড়িবিষয়ে ক্লার্কওয়েলের মন কিরূপ তা লেখক স্পষ্ট করেন নি। তবে তিনিও টুইশানি করেন। আর্থিক সমস্যাকেই মেটাতে তিনি সিবসনকে ছেড়ে দিলেন। সিবসনের প্রতি মমত্ব তাঁর আছে, কিন্তু ইস্কুলের উন্নতির দিকে তিনি উদাসীন নন। জানি না, সিবসনের অন্যত্র চাকরি না জুটলে ক্লার্কওয়েল কী করতেন! সমাজের এই অবস্থার সঙ্গে ক্লার্কওয়েলের তেমন পরিচয় হয় নি বলেই ক্লার্কওয়েল অতখানি কর্তব্যনিষ্ঠ থাকতে পেরেছেন কি না কে বলতে পারে! কাজেই

দেখা যাচ্ছে, প্রধানশিক্ষকের চরিত্রনিষ্ঠাটুকু এসেছে সম্পূর্ণভাবে সুবিধাজনক সামাজিক পরিবেশে : তাঁর বিদ্যা থেকে যেটুকু আসা উচিত ছিল, তার তিলমাত্রও আমরা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। কাজেই লেখকের এইরূপ সাহেবী-মাস্টারকে আবির্ভাব করানোর মূলে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক আলোকচিত্রশিল্পীও নন, সিনেমার গল্প-লিখিয়েও নন যে, হয় ছবির যথাযথ রূপ ফুটবে, নয় গোঁজামিলের চমকপ্রদ ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবিষ্ট হবে।

বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে শিক্ষাজগতের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে শিক্ষকদের জীবনযাত্রাকেই দেখাতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এই দিক দিয়ে যদুমাস্টার আর ক্ষেত্রবাবুর চরিত্র খাঁটি বাঙালী-শিক্ষকের ধরনে। বাংলাদেশের যে-কোন ইস্কুলে যে-কোন অবস্থায় এঁদের দেখা যাবে।

যদুবাবু নিতান্ত পরিচিত মাস্টার। মনে হয় যেন এমনি এক মাস্টারের কাছে আমরাও পড়েছি। সামান্য-সামান্য লোভ, কাজে ফাঁকি দেওয়ার অবধারিত অভ্যাস, তেজস্বিতার জলন্ত মূর্তি কিন্তু কর্তৃপক্ষের সামনাসামনি হয়ে কেঁচো, অভাবের এক বিতৃষ্ণকর জীব এই যদুমাস্টার। এতৎসত্ত্বেও সরলতা-বর্জিত নয়। কিন্তু সরলতা থাকলেও, ছেলেপুলে না থাকলেও সংসারের ভার বহনে তিনি অক্ষম। অক্ষম, কারণ বিদ্যালয়ের আর টুইশানির বৃত্তিতে তাঁদের কলকাতায় দুজনের জীবনযাত্রাও চলে না। অথচ যে-ভাবে থাকেন, তাতে দুনিয়ায় আর কোন দেশের শিক্ষক কেন, বাঙলাদেশেরই আর কোন চাকুরে এমনভাবে থাকতে ভীত হত। এরই উপর যখন যুদ্ধ লাগল তখন যেন ছাতুর হাঁড়িতে আঘাত পড়ল। দিনের পর দিন জীবনের একমাত্র সঙ্গী পত্নীকে অবহেলিতভাবে আত্মীয়বাড়িতে রাখতে বাধ্য হলেন। তাই যদুবাবু দু-চার পয়সা চুরি করলেও, ছাত্রদের খাবার বরাদ্দ থেকে রুটি-তরকারি চুরি করে খেলেও—পাঠকের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতি আদায় করে ছেড়েছেন। শত ত্রুটি সত্ত্বেও ইস্কুল কর্তৃপক্ষও তাঁর মৃত্যুতে ছুটি দিতে বাধ্য হয়। হাজার হলেও যদুমাস্টারের দল আত্মত্যাগী কারণ এত অভাবেও যে স্কুল ছেড়ে যায়নি, না খেতে পেয়েও নিয়মমত হাজিরা বহিতে যে সই মেরেছে —এমন ব্যাপাবটি দেশের আর কোন লোকদের দিয়ে হতে পারত না। এরা নবকুমার।

ক্ষেত্রবাবু গৃহস্থ মানুষ; অভাব আছে তবু ঘরণী না থাকলে চলে না। বাধ্য হয়ে হোমিওপ্যাথি করতে হয়। শিক্ষকের মর্যাদানুযায়ী সংযত প্রেমও

আছে। এঁরও দুঃখের অন্ত নেই। আসল কথা শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই অদৃষ্টের এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে।

কিন্তু কেন এমন হয়, ঔপন্যাসিক সে-কথা লুকিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র বলতেন, তিনি সমস্যা তুলে ধরেছেন মাত্র, সমাধান তিনি করতে যান নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র তবু সমাধানের দিকে বহুবার প্রকাশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিশেষ করে, সমস্যাই এমন ব্যাপ্তভাবে দেখিয়েছেন যে সমাধানের পথ খুঁজতে দেরি হয় না—কারণ সমস্যার উৎস তাঁর উপন্যাসে বড় স্পষ্ট। অথচ বিভূতি-ভূষণের চরিত্র যতই কৌশলী হাতের হোক, তাঁদের দুঃখের সত্যকার উৎস কোথায়—সেকথা তিনি বিশেষ বলতে চেষ্টা করেন নি। এই জন্যই শিক্ষকদের সমস্ত দুরবস্থা দেখেও আমরা মনে করি ঐসব জীবনের এইটিই নিয়তি, একে এড়াবার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

তাই তো ইস্কুলটা ভেঙে যায়, সকলের ইচ্ছা সত্ত্বেও ছাত্রদের চরিত্রগঠন হয় না। এমন কি, চরিত্রে নিষ্ঠা থাকলেও, এত দারিদ্র্যবরণ করে শিক্ষকবৃত্তি আঁকড়ে থাকলেও, তাঁদের দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। তাঁরা ছুটির আগে ঘড়ির কাঁটা দেখবেনই। ক্লার্কওয়েল সাহেব কেন, বিলাতের পাবলিক স্কুলের নামজাদা পরিচালক হলেও, তাঁদের মধ্যে কর্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণা যোগাতে পারবেন না। কারণ উৎসাহ তাঁরা পান না। মানব ও শিশু চরিত্রের জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তাঁদের জোটে না।

পরছিদ্রান্বেষী মিঃ আলমের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার না থাকলেও, নতুন শিক্ষক রামেন্দুবাবুর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। রামেন্দুবাবুর ন্যায়নিষ্ঠা, মিতভাষিতা শিক্ষকদের মধ্যে সাময়িক উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তাঁকে দিয়ে স্কুলের কোন কিছু লাভ হ'ল না। ক্লার্কওয়েল সাহেব তাঁর সমালোচনাকে গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু রামেন্দুবাবু বিদ্যালয় পরিচালনার দিক দিয়ে তাঁকে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। তাঁর অবস্থা ভালো, হয়তো বা শিক্ষকতা তাঁর শখ বা বিলাস মাত্র। কিন্তু শিক্ষকতা কেন তাঁর বিলাস হ'ল? কেন শিক্ষকতায় তিনি আনন্দ পান—সে সম্বন্ধে লেখক একেবারে নীরব। রামেন্দুবাবুকে সব দিক দিয়ে সহ্য করা যায় কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব-বাদিতার মনোবিকার অসহ্য। অসামাজিক লোককে দিয়ে সমাজের কোন লাভই হয় না। রামেন্দুবাবুর চরিত্রধর্মে মহাজনী বৃত্তি প্রকট। বড় প্রাচীনপন্থী তিনি। অথচ আধুনিক যুগের কোন মানুষকে উপন্যাসের

কোঠায় এমনভাবে দেখতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বাঙলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে এমন করেই স্বার্থপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ক'রে তুলছে। রামেন্দুবাবুকে দেখলে মনে হয় বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালীর অপূরই পরবর্তী পরিণাম মাত্র। সমাজ, সামাজিকতাকে অগ্রাহ্য করে ভদ্রলোক এগিয়ে চলছেন যেন। 'একা আমি পড়ে রব কর্তব্য সাধিতে' প'ড়ে প'ড়ে এমন মানুষই তৈরি হয়। কাজেই রামেন্দুবাবু শিক্ষকদের ভরসাস্থল হ'তে পারলেন না। ক্লার্কওয়েল সাহেব মিঃ আলমের কথা শুনতেন, তার এক কারণ ছিল। মিঃ আলম কানভাঙানি দিতে পারতেন। শিক্ষকদের মধ্যে কারও গোপন কথা তাঁর মারফত ক্লার্কওয়েল জানতে পারতেন। কিন্তু তিনি রামেন্দুবাবুকে সমীহ করবেন কেন বোঝা যায় না। না আছে অস্মিতা রামেন্দ্রবাবুর, না আছে সংগঠন শক্তি। চরিত্রের এই বড় দিক দুটিতেই তিনি অপরিণত, আবার আদর্শ শিক্ষক হবার মতো শিক্ষকতা-বৃত্তি কিংবা শিক্ষানীতি তাঁর কিছুই জানা নেই। কাজেই আর যাই হোক রামেন্দুবাবু ইস্কুলের পক্ষে যদুমাস্টারের অভাবও পূরণ করতে পারেন না।

বিদ্যালয়কে ঘিরে এই যে শিক্ষকদের অনুবর্তন-এর বিশেষ কারণ কিন্তু পাওয়া গেল না। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারলেও, সুযোগ ঘটলেও এঁরা শিক্ষকতা ছাড়তে পারেন না; এর অন্তর্নিহিত আকর্ষণ কী তা লেখক স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। আর্থিক সমস্যাই যে প্রধান, সে-কথা লেখক সোজাসুজি স্বীকার করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। অথচ পণ্ডিত মশাই দলত্যাগ করলেন, ক্ষেত্রবাবুও বেশিদিন থাকবেন ব'লে মনে হয় না।

লেখক বাঙলার ইস্কুল-ব্যবস্থার একটা বড় ত্রুটির দিক নির্দেশ করেছেন। ইস্কুল যদি চলে তবে পরিচালকবর্গ আছে, যদি না চলে তবে কর্তৃপক্ষ 'দিল্লী থেকে দূরে'। যখন বিদ্যালয়-জীবনে দুর্বিপাক এল, তখন শিক্ষকেরা উপবাসকে বরণ করে গ্রামে সরে গেলেন—কিন্তু ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ এতটুকু ভাবনায় পড়লেন না, কেমন ক'রে এই বিপদ কাটানো যায়। ক্লার্কওয়েল সাহেবও রাঁচি পাড়ি দিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই সময়ই তো কাজ। স্কুল হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক বা ছাত্রদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব খুব কমই। সমাজের চাহিদা থেকে, জাতির গঠনের দিকে নজর রেখে, স্কুল পরিচালিত হয়, কাজেই বিদ্যালয় পরিচালনার অন্তিম বৃত্ত রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই। কর্তৃপক্ষ সেই কেন্দ্রের দিকেই তখন ছুটবে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষের মতো স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বাঙলাদেশের অধিকাংশ স্কুলের ভাগ্যেই এই

কর্তৃপক্ষ। তাঁরা শিক্ষকদের ছাড়িয়ে দেবার বেলায় বাজেট কষতে তৎপর, নিয়োগের বেলায় গোপনে হাত চালান—কিন্তু যখন বাজেটী-বুদ্ধি একান্ত দরকার তখন তাঁরা দার্শনিক সেজে হাওয়াগাড়িতে স্বীয় চিন্তায় মগ্ন। শিক্ষককে বেতন দিয়ে ছাত্রদের পড়বার সুযোগ জুটল, ছাত্র না থাকলে শিক্ষকের বেতন জুটবে না। এই ঢালাই নির্দেশ যে-কেউ বোধহয় দিতে পারে। এর বেশি কিছু কর্তৃপক্ষ করতে চান না। এই জন্যই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ-দেশে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে প্রাইভেট টুইসানির কেন্দ্রস্থল হিসাবে।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বাঙলাদেশের ইস্কুলের সত্যকার চেহারা। লেখক এই দিকটিকেই বিশেষভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত দায়িত্ব আর সুখদুঃখ নিয়েই ইস্কুলের ছেলেদের আর শিক্ষকের জীবনযাত্রা চলে। একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো। একটি টাকা-ওয়ালা লোককে ধ'রে কোনক্রমে দালান তৈরি করা, আর কৃতজ্ঞতায় তাঁর কিংবা স্ত্রীর নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা—এইগুলিই হ'ল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক করণীয়। তারপর দেশের দুরবস্থার দিকে নজর করে শিক্ষকদের বেতনের হার ক'মে শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; পরিশেষে সময় মতো ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ইস্কুলের সমস্ত কাজ নির্বাহ করাই যেন বিদ্যালয়ের সব কিছু।

বাঙলার আর কেউ বিদ্যালয়ের এই চেহারাকে তুলে ধরেন নি। এই জন্যই বিভূতিভূষণ এ বিষয়ে অগ্রণী লেখক। ক্লার্কওয়েল সাহেবের ইস্কুলটিই এই অনুবর্তন উপন্যাসের যেন নায়ক। শিক্ষা-বিজ্ঞান-ও-পদ্ধতির খুব খুঁটিনাটি দিক না থাকলেও অনুবর্তনের এই প্রচেষ্টা সার্থক।

পথের পাঁচালী

পথের পাঁচালীকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অপরাজিতকে বাদ দেওয়া যায় না। পথের পাঁচালীর সময় নির্ণয় করা একেবারে কঠিন নয়। তখনও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি মোহ ছিল তবে ধীরে ধীরে সে-মোহ কেটে যাচ্ছে কারণ সংস্কৃত শিখে উপার্জন করা একরূপ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশে-গাঁয়ে পাঠশালার যে রূপ ছিল তা অনেকটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পাঠশালারই অনুরূপ। উইলিয়াম এ্যাডাম বর্ণিত পাঠশালার ধরন রয়েছে কিন্তু ঔদাসীন্যে সেগুলির অবস্থা যা হয়েছে তা অপুদের গাঁয়ের পাঠশালায় প্রতিবিম্বিত।

কেবলমাত্র পাঠশালা ক'রে কারও সংসার চলে না, কাজেই সঙ্গে মুদিখানার দোকান দরকার। তা ছাড়া, পাঠশালায় ছেলেদের দিকে যতটা না নজর, তার চেয়ে বেশি নজর, তারা ভয়ে ভয়ে কতখানি শিখতে পারছে তার দিকে। বিদ্যা ও বিদ্যাদাতাকে ভয় করার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষাগ্রহণকার্য সমাধা হত। মাইনর স্কুল, হাই স্কুলও দেশে আছে। তবে সর্বসাধারণের উপযোগী শিক্ষাক্ষেত্র এগুলি ছিল না। যাই হোক সকলের মতো, অপুরও শিক্ষা আরম্ভ হল এমনি এক মানসিক শৃঙ্খলা বিধানের কারাগার-স্বরূপ পাঠশালা থেকে।

কিন্তু অপুর জীবন নিয়ে শুরু করবার আগে অপুর মধ্য দিয়ে লেখক যে-কথাটি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, সেই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সেইখান থেকেই আমরা আরম্ভ করি।

সমাজের দুটো দিক আছে। এই দুটো দিক কিন্তু স্থির নয়, গতিশীল। একটির গতি মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করা, অপরটি মহাকালের খণ্ড অংশ বা যুগ থেকে। এই যুগ থেকে বোধ হয় বৃহত্তর মানবমনের সৃষ্টি হয়। অপূর্বকুমারের বাবা হরিহর রায় কিন্তু একটা গতির দিকে অন্ধ থেকেছেন। কিন্তু সুধীন দত্তের ভাষায়, "অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" হরিহর রায়ের কাশী থেকে শেখা সংস্কৃত-বিদ্যা সংসারের কোন কাজে লাগল না। পুরাতন শিক্ষা, পঞ্জিকার সংক্রান্তি-ঠাকুরের মতো গর্মনোদ্যত ভাব নিয়ে, 'ফসিল' হয়ে থাকল। বিভূতিভূষণ, হরিহর রায়ের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে, শিক্ষার দুটো কালকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। বাঙলাদেশের শিক্ষা-জগতের এই প্রচণ্ড মানসিক বিপ্লব লোকের জীবনে যে কী বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, লেখক তা এখানে একটি পরিবারের ধ্বংসকাহিনীর মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন। তবু হরিহর রায় কালের এই ধর্মকে ধরতে চান নি। 'যেন মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার দুর্বিসহ বোঝা।'

কিন্তু কিছুই হারায় না। হরিহর রায়ের এই শিক্ষাই অপুর মধ্যে বেঁচে থাকল আর এক মূর্তিতে। অপুর মধ্যে তার পূর্বপুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের রক্ত আর বাণীর সেবক হরিহর একত্র হয়ে মিশে আছেন। বিভূতিভূষণের কথায়, "বংশে একটা ধারা দিয়ে গেছেন।" বিভূতিভূষণ সমগ্র উপন্যাসে এই বংশধারার উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। পূর্বপুরুষের যাযাবর বৃত্তি, বিদ্যায় আগ্রহ আর নিরাসক্তি অপুর চরিত্রের ভিতরকার দিক। শিক্ষাবিদেরাও এই বংশগতিকে মেনে থাকেন বটে।

বীরু রায়ের উদ্দাম নিষ্ঠুরতা অপুর মধ্যে এসে শান্ত নির্মমতার রূপ গ্রহণ করল। তাই দিদি, মা, অমলা, লীলা—সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে সে সামনের পথের দিকে এগিয়ে যায়, অথচ এদের জন্তে মমতা তার কম নয়। এ যেন নিমাই তত্ত্বমসি মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে 'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ' রূপে অবধূত হলেন।

শিক্ষাবিদেরা বংশগতির উপর বিশেষ জোর দিলেও, আবেষ্টনী বা প্রতিবেশকে তাঁরা আরও বেশি মান্ত করেন। বিভূতিভূষণও প্রতিবেশ যোজনা করতে কৃপণতা করেন নি।

এই প্রতিবেশ ওয়ার্ডসওআর্থের লুসির প্রতিবেশ। লেখকের কথা, 'যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামস্নিগ্ধতা তাগর চোখদুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে।' মাঝে মাঝে সে নদীর ধারের পথ দিয়ে হনহন ক'রে হেঁটে সোনাডাঙার মাঠের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পথ থেকেই সে সমস্ত শিক্ষাকে গ্রহণ করে। পথের লোক তার বিস্ময় জাগায়। ডাকঘরের অমলের মতো সাঁওতাল-পুরুষটিকে দেখে সে দূর দেশের কল্পনা করে। লেখক বলেন, "ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবার যারা সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুইপাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে সুখে, আকাশ বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্তপ্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে—এই জীবনধারার সহিত সে নিজকে পরিচিত করিতে চায়।" মাঠ-নদী-বন অপুর কাছে যেন সাপেক্ষ প্রতিবর্তের (conditioned reflex) উদ্দীপক হয়ে পড়েছে।

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা চেষ্টিতবাদের এই দিকটিকে কখনই উপেক্ষা করেন না। প্রক্ষোভ-অভ্যাস-রস (Emotion, habit and sentiment) প্রভৃতি সৃষ্টি করতে শিক্ষকেরা ছেলেদের মনের এই দিককার প্রবণতাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

হেড্‌মাস্টার মিঃ দত্তের বীক্ষণে অপুর চরিত্র, 'ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন সম্পদহীন। হয়তো একটু নির্বোধ একটু অপরিণামদর্শী কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, পিপাসু ও জিজ্ঞাসু।' সরল আর নিষ্পাপ বিশেষণ দুটোর ব্যাখ্যা করা না গেলেও অন্তগুলো সবই বংশধারা আর প্রতিবেশের প্রভাব থেকেই এসেছে।

অপুর প্রতিবেশ এক স্বতন্ত্র ধরনের। অপুর শিক্ষা সেই স্বতন্ত্র প্রতিবেশ থেকেই আসা উচিত। যেখানে তা আসেনি সেখানে তার শিক্ষা ব্যর্থ

হয়ে গেছে। কাশীর ইস্কুল তাই তার কাছে বিরক্তিকর। সেখানে তাই সে কথকের আশ্রয়ই খোঁজে। কাশীতে বেশিদিন থাকতেও পারে না এই জন্যই।

তার জীবন নিশ্চিন্দিপুরে শিকড় গেড়েছে, অখ্যাত মনসাপোতার ইস্কুলে বাড়িয়েছে হাত, আর মফঃস্বলের উচ্চ বিদ্যালয়ের দিকে সে আলোকলতা।

তার মধ্যে 'বেদান্তসার' আছে, আকাশে উড়বার সঙ্গে শকুনের ডিমের সম্বন্ধের স্বীকৃতি আছে, দাশু রায় আছে, কথকঠাকুর আছে, আবার এইগুলিই সমুদ্রপারে জোয়ান-অব-আর্কের দেশে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। পুরাতন অভিজ্ঞতার জলকণা আগ্রহভরে ঈশানের পুঞ্জমেঘ হয়ে তাকে ঘরছাড়া দিক-হারা করে আত্মপরিক্রমণের পথে প্রব্রজ্যা নিতে বাধ্য করল। জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বার্ট এবং আমেরিকার জন ডিউয়ি সংপ্রত্যক্ষ আর ঐতিহ্যকে (apperception and tradition) শিক্ষার দিক দিয়ে বিশেষভাবে স্বীকার করেন। অপু যেন সেই সংপ্রত্যক্ষ আর ঐতিহ্যকে তার মৃত্যুঞ্জয় জলন্ত হৃদয়ে বহন ক'রে নিয়ে ইস্কুল থেকে ইস্কুলে ছুটছে।

কিন্তু এই সবের যোগসাধন করবে কে? করবে শিক্ষাদাতা বা বিদ্যালয়। অথচ অপুর কোন ইস্কুলই তা করতে পারেনি। শিক্ষাকে বা জ্ঞানকে তাঁরা ঢোকাতে চান। অপুর মা-ও অপুর মনকে বুঝতে পারেন নি। এইসব স্কুলের শিক্ষকেরাও অপুর মায়ের মতোই অজ্ঞ। 'এখানে শুধু কড়ি কষায়, আর্যা আর তৃতীয় নামতা।' মা বকলে কি হবে, যা সে পড়তে চায় তা কই? লেখক বলেন, 'বর্ণ-পরিচয়ের 'খ'এর খরগোস আর জীবন্ত খরগোস যখন এক হইয়া গেল তখনই বর্ণপরিচয়ের খরগোসের কথা তাহার আরও ভালো লাগে।' প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেবার রীতিই পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের দেশে ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গুরুমহাশয়ের বুড়ো আঙুলের উষ্ট্র-দৃষ্টির দিকে নজর দিতে হয়। এ দুর্ভাগ্য 'মন্তেসরী' 'ফ্রয়েবল' 'ডিউয়ি' প্রভৃতি আমদানী পণ্যের পুণ্যের বলেও ক্ষীণ হল না। ১৮৫৪ সালের উডের অনুজ্ঞাপত্রে উল্লেখিত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথা এমনি করেই অবহেলিত থেকে গেল। তবু অপু এগিয়ে চলল অপরাজিত হয়ে। কিন্তু কি ক'রে সে অপরাজিত হল? সে সম্বন্ধে লেখকের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই কেবল তিনি বিশ্বাস করেন, বড় বড় চরিত্রে এরকম ঘটে থাকে। বাঙলা দেশে তো এমন দৃষ্টান্তের অন্ত নেই। বিদ্যাসাগর তার জলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু শিক্ষালয়ের এই ত্রুটির জন্যই অপু অধিকাংশ বাঙালী ছাত্রের মতো আত্মকেন্দ্রিক আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে রইল। সমাজের প্রতি তার কোন কর্তব্যই জাগল না। দেশের অভ্যন্তরে কোথায় যে কি ঘটছে—তার হিসাব সে কসতে চায় না—সে চায় আফ্রিকা-অস্ট্রেলেশিয়া যেতে। এই স্বার্থ-মুগ্ধ শিক্ষিত যুবকটির মন বামনের শেষ পাদটির মতো কোথায় যে স্থান ক'রে নেবে লেখকও জানেন না। যে-কারণে দুর্গার মতো মেয়ে পরের সোনার কৌটো চুরি করে, মার খায়, অস্বীকার করে—সেই একই কারণে অপুও সমাজের দানকে চুরি করে বিদেশে পাড়ি দেয়।

এর জন্যে দায়ী আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। তদানীন্তন কালের বেশির ভাগ মানুষই শালগাছ হবার দিকে ঝোঁক দিয়েছে। সকলের সঙ্গে মিশতে চায়নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উপনিষদের পুষণের মতো স্বর্ণময় আবরণে ঢাকা হয়ে থাকল। এই সব প্রতিষ্ঠান যেন পথের পাঁচালীর চরিত্রহীন নন্দবাবুর মতো, গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অপুকে ছাদে বই পড়তে নিষেধ করে।

অপুর বাবা হরিহর রায় 'যাত্রার' আগ্রহ সঞ্চার ক'রে পাঠে মনোনিবেশের জন্য যে-রীতি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়নি।

অপুর জীবনে সকালবেলার সূর্যের মতো প্রেম এসেছে, মনের অন্ধকারকে আলোকিত ক'রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে; ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সমগ্র মানবমূর্তি অপুর বালকজীবনেই আত্মপ্রকাশ করেছে—তবু অপু অপূর্ণ হয়ে থাকল।

বিভূতিভূষণ এই অপরাজিতকে এঁকে কতখানি গৌরব বোধ করেছেন জানি না কিন্তু আমরা অপুর মধ্যে অস্থিরতা আর পরাজয়কেই লক্ষ্য করি বেশি লেখকও এর জন্যে কম দায়ী নন।

সমগ্র উপন্যাসে দেশের আবহাওয়াটুকু দেখা গেল না। প্রতিবেশ বলতে তো কেবল প্রকৃতি নয়। সমাজ একটা বড় শক্তি এই প্রতিবেশের। সেই-দিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের যে-ইন্দ্রনাথ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করে বেরিয়ে এসেছিল—তাকেও সার্থক ব'লে মনে হয়। বিভূতি-ভূষণ অপুকে প্রতিবেশের পূর্ণ রূপের বদলে প্রকৃতিকে মাত্র দিয়ে, দুধের বদলে পিটুলীগোলাই তাকে খাইয়েছেন। পিটুলী-গোলা খেয়েও অশ্বত্থামা অমর হয়েছে বটে, কিন্তু সে কেবল পিত্তবায়ু-প্রকোপী ব্যক্তির সর্ষপ তেলের ছিটে কৌটায়।

হেডমাস্টার অপুকে স্বপ্নদর্শী বলেছেন। কিন্তু কেন সে স্বপ্নদর্শী সে-কথা ভাবতে চেষ্টা করেন নি। যদি ভাবতেন, তবে তাকে ঐ স্বপ্নদর্শনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তাতে অপু অপরাজিত না হলেও সার্থক হত। অপুর স্বভাবটা অন্তর্বৃত্ত। তাকে বহির্বৃত্তির দিকে টেনে আনা দরকার ছিল। তার মধ্যেকার প্রতিভাকে দেখাই ইস্কুলের বড় কথা নয়, কোথায় তার ত্রুটি, কেন সে এমন নির্মম, সে কথাটা ভেবে দেখা দরকার। সে সহায়হীন, সম্পদহীন, সে নির্বোধ, সে অপরিণামদর্শী। কিন্তু এগুলোর হাত থেকে মিঃ দত্ত তাকে বাঁচাতে ইস্কুলের মারফত কী চেষ্টা করেছেন? কিছুই নয়।

মিস্টার দত্তের প্রথমেই ভাবা উচিত ছিল, ছেলেরা কেন স্বপ্নদর্শী হয়। আবার, সেই সব কারণের মধ্যে অপুর বেলায় কোন্ কারণ বর্তমান ছিল। সেই কারণের উদ্‌ঘাতি করতে পারলেই, অপুর মধ্যেকার নির্বুদ্ধিতাকে কাটানো সহজ হত।

ছেলেরা স্বপ্নদর্শী হয় নানা কারণে। তার মধ্যে আত্মসাম্মুখ্যের (selfassertion) বাধা পেলে অপুর মতো ছেলেরা আত্মমুখী হয়ে ওঠে। অপু দেখেছে তার দিদির প্রতি মায়ের ব্যবহার; অহেতুক নিষ্ঠুরতা সর্বজয়ার যে দুর্গার প্রতি ছিল, তার উৎস হয়তো সাংসারিক অনটন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে তা খুব বড় ছিল না, এই জন্যই দুর্গার সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও সে পরের সোনার কৌটো চুরি করে, এমন কি খাবার জিনিসও সে চুরি করে মজা পায়। বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় দুর্গা আভিমুখ্যে (aggression) এবং নতি-স্বীকারে (submissiveness) অনবরত ভুগছে। বেঁচে থাকলে সে কিরূপ বধূ হতে পারত জানিনে, কিন্তু বড় হ'য়ে অপু সেই নতি-স্বীকার (submissiveness) নিয়ে সেরূপ চরিত্রের অধিকারী হয়েছে, তা আমরা জানি। অপু বাবার দারিদ্র্য, অপারগতা সব টের পায়। দুর্গার মারফত এই বোধ তার স্পষ্ট হয়ে এসেছে। তাছাড়া মায়ের স্নেহও তার মনের বৃত্তিকে প্রখর করে। লীলাকে সে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে না মনের এই দ্বন্দ্বের জন্যেই। একমুখী হয়ে, স্নেহ-প্রীতিকে আঘাত ক'রে সে ছুটল পড়াশুনা করতে। তার এই নিষ্ঠুরতা আত্মসাম্মুখ্যেরই প্রতিরূপ। সমাজ থেকে সে কিছু পায়নি, পিতার অবহেলা বরণ তাকে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা দিয়েছে। সে নিজের মধ্যে তার সমাজকে গড়ে নিয়েছে। স্বভাব হল তার অন্তর্বৃত্তির স্বভাব। সমগ্র উপন্যাসে তার স্ফূর্তি বা আনন্দের দিকটা দেখা যায়নি। অপুর পক্ষে

এ দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য কারণ সে জন্মেছিল শিক্ষার এমন নীতির মধ্যে যখন সে জগতে Filtration theoryএর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পুরা মরশুমে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নতুন সমাজ গড়বার চেষ্টা চলছে।

সে স্বপ্ন দেখে, কল্পনায় ডুবে থাকে। কারণ, স্বভাবের এবং বৃত্তিনিচয়ের ক্ষতিপূরণ (compensation) করার মধ্য দিয়েই এমন চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। আর সে-চরিত্র দিবাস্বপ্ন বা কল্পনার মধ্য দিয়েই জাত হয়। অপুর্বরও তাই হয়েছিল। অপু যদি সংগ্রামে জয়ী না হত তবে সে নির্ঘাৎ ব্যধিত চরিত্রের লোক হয়ে দাঁড়াত।

অপুকে ইস্কুলের খেলাধূলার মধ্যে টেনে আনা উচিত ছিল। বহির্মুখী স্বভাবের ছেলেদের সঙ্গ দান করানো কর্তব্য ছিল শিক্ষকদের। সমাজে যখন পুর্বাপর সমাজ অপু পেল না, তখন ইস্কুলেরই কৃত্রিম সমাজের পরিবেশ রচনা করা উচিত ছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই জন্যই 'শিক্ষালয়' নয়, সমাজ। জন ডিউয়ি তাই স্কুলকে সোসাইটি বলতে চান।

কিন্তু বিভূতিভূষণ ইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে এমনভাবে আঁকেন নি। না এঁকে ভালোই করেছেন। কারণ এমন ইস্কুল বাঙলাদেশে আজও নেই। বাঙলা দেশের স্কুল এখনও সমাজের অভাব পূরণ করে না। সে শুধু ব্যাকরণ শেখার কেন্দ্র মাত্র। এখানে যাঁরা পড়ান, তাঁরা চাকরি করেন মাত্র। শিক্ষকেরা দেশের ভালো-ভালো ছেলে। অন্যত্র ভালো চাকুরি পাননি বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এই শিক্ষকতা করতে আসেন। তাঁদের হাতে সম্পূর্ণ অসামাজিক জাতির শিশুরাই গঠিত হতে পারে। শিক্ষকদের সঙ্গে সমাজের পরিচয় নেই। কারণ শিক্ষা চালুই করা হয়েছে সমাজের কতিপয় লোকদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে পড়বে শিক্ষা দেশের অন্যান্যদের মধ্যে। ব্যাপারটা সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। বিদ্যালয়ের এই অবস্থান তখন ছিল। কাজেই অপুকে লেখক সম্পূর্ণভাবে বংশগতি আর প্রকৃতির অবলম্বনে রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

তবু একটা কথা মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের হিড়িক সে সময় পুরা-মাত্রায়। শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে হৈ-চৈ-এর অন্ত ছিল না। ঐসব বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সমাজনির্ভর না হ'লেও, ইংরেজি বিদ্যালয়ের মতো সমাজ-বিবর্জিতও নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিশেষ

আলোচ্য বস্তুও হয়ে পড়েছিল। তবু বিভূতিভূষণের কিছু অভিজ্ঞতা ঐসব স্থান হ'তে এল না কেন, তাই ভাবি।

মনে হয়, বিভূতিভূষণ নিজেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। তিনি সমাজের দিকটিকে বিশেষ মান্য করতেন না। ধ্যানধারণায়, প্রকৃতির রূপে, একক জীবন যাপনে তিনি নিজে নাকি অভ্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই ছায়াটি তাঁর রচনায় পড়েনি তো?

কল্পনার অবসর ছাত্রদের মধ্যে থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্যানের দিকটিকে তাঁর শিক্ষার নীতিতে স্থান দেন। তিনি বিশ্বাস করেন ছেলেরা শিক্ষা লাভ করে নির্জন মনের মারফত। এই জন্যই তিনি কিছুটা সময় অবসরের মধ্য দিয়ে ছেলেদের চিন্তামগ্ন রাখবার পক্ষপাতী। কিন্তু সেই চিন্তামগ্নতা চরিত্রের একমাত্র বস্তু বলে তিনি স্বীকার করেন নি। তিনিও প্রকৃতির সাহচর্যে শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মনুষ্যসমাজের সবকিছুকে বাদ দিয়ে প্রকৃতিকেই তিনি একমাত্র ব'লে গ্রহণ করেন নি। তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন, গ্রামের সমাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার আগ্রহ পাক ছেলেরা। এই জন্যই তো শ্রীনিকেতনের উদ্ভব।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছেন। আর ঐতিহ্য অর্থে ভারতের বন-অরণ্য-ই সব নয়, বংশগতিই সব কিছু নয়। ঐতিহ্য আসে সমাজের মানুষের মারফত যুগ যুগ ধরে। বিভূতিভূষণ ঐতিহ্যের সেই কথাটা এখানে বিশেষ স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু মেণ্ডেলীয় সূত্র অথবা রাশিয়ার লাইসেংকোর পরীক্ষানিরীক্ষার বিতর্কের মধ্যে না গেলেও, একথা অনস্বীকার্য যে, মনুষ্যসমাজের স্বরচিত ঐতিহ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই বিশেষ ক'রে আসে। বিভূতিভূষণ সেখানে একমাত্র বংশগতি এবং পল্লীর গাছপালা, নদীনালা, ফলফুলের উপর নির্ভর করেছেন। এই জন্যই অপুর মানসিক বৃত্তির সমস্তটা বিকশিত হতে পারেনি।

অপুর মানসিক অস্থিরতার কারণের উৎপত্তিও মনে হয় এই অভাব থেকেই। সে চঞ্চল। বাত্যার মতো তার মন ঘুরে বেড়ায়। কিছুতে যেন শান্তি সে পায় না। তাই কল্পিত বস্তুর মধ্যে সে আশ্রয় খোঁজে। আমাদের তো মনে হয় বনানীর প্রতি তার মুগ্ধতার কারণ, এই মূক বস্তুগুলির মধ্যে সে আপন কল্পনা জুড়ে চলতে পারে বলেই। মানুষের ব্যবহারের কঠিন অনিবার্যতার মধ্যে তার চিন্তাধারা খাপ খেয়ে ওঠে না। এই জন্যই স সুদূরের পিয়াসী। ডাকঘরের অমলের মতো মন তার নয়। তাঁ

ক্রিস্তফের মতোও সে কিছু রেখে যেতে চায় না। সে ক্ষয়ে যেতে চায়। বিভূতিভূষণও অজ্ঞাতসারে নির্মমভাবে তার কাছ থেকে মানুষের সমস্ত সম্পর্কে নির্মূল ক'রে তুলে নিয়েছেন, এমন কি আপনাকেও নিষ্ঠুর নিয়তির সাহায্যে সরিয়ে নিলেন।

এই কাজ মন থেকে তাকে সরিয়ে নিতে আসতে পারত, বিদ্যালয়। কিন্তু পারলে কি হবে, আমাদের দেশের বিদ্যালয় তো তেমন নয়! তাই ঔপন্যাসিক সেই অবাস্তব কল্পনার মধ্যে যেতে চান নি। আমরা তাঁর কাছ থেকে যুগের চিন্তাধারার প্রভাব, জাতীয়তার উন্মেষের কথা, বিদ্যালয়কে নতুন দিকে যে চালনা করে হচ্ছে তার আভাস পেতে পারতাম, যদি বিভূতিভূষণ নিজে অন্তত বংশগতি আর প্রকৃতির পরিবেশের উপর অতটা জোর না দিতেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আওতায়ই মানুষ। কাজেই, তিনি এই মনোধর্মে বিশ্বাসী সেই-মনেরই নিয়তি-নির্দেশে।

কিন্তু সকল কথা ছেড়ে দিলেও, অপূর্বকুমার শিক্ষাবিদদের কাছে বিশেষ আগ্রহের চরিত্রই হয়ে পড়েছে। অপুর চরিত্র যে সাধারণ-অসাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেদের চরিত্রই হয়ে পড়েছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতের শিক্ষাবিদেরা অপূর্বকুমারের চরিত্রে তাঁদের শিক্ষাজগতের নূতন নির্দেশ পাবেন বলেই মনে হয়। অপুর চরিত্রের ত্রুটি ঔপন্যাসিকের লেখার ত্রুটিতে নয়: অপুর ত্রুটি ঘটেছে তার যুগের দোষে, তার পরিপার্শ্বের দোষে।

মৃত্যু-প্রসঙ্গে সুকান্ত

অরুণাচল বসু

'আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার প্রীণতর পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক ক'রে গেলাম এই আমার আজকের সান্ত্বনা।'

অভিনয়ের মঞ্চ থেকে দর্শকের আসনে না এলে নাটকের সবটুকু চোখে পড়ে না। মৃত্যুর অনুভূতি সুকান্তকে তাই এই দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিত থেকে জীবনকে দেখবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল।

আনোন্মেষের সূত্রপাতেই তার মা মারা যান। তার অনন্যসাধারণ স্পর্শাতুর হৃদয়ে এ-মৃত্যু গভীরভাবে রেখাপাত করে। যে-আশ্রয়ে সে এতোদিন বেড়ে উঠেছিল, হঠাৎ তার অন্তর্ধানে তার জীবন বৃন্তচ্যুত হয়ে যেন শূন্যে হারিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, সেও হয়তো আর বাঁচবে না।

তারপর জীবন হ'য়ে উঠলো আরো কঠোর। অস্তিত্বরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব ক্রমশ নিতে হলো নিজেকেই। আহারনিদ্রা, আত্মপরিচর্যার সব কিছু।

একাধারে শূন্যতার অনুভূতি আর ব্যবহারিক জগতের নিষ্ঠুর বাস্তবতা; সুকান্তর কবিসত্তা তাই ভাববিলাসী না হ'য়ে বরং হ'য়ে উঠলো বাস্তব-মুখীন, অথচ নৈরাশ্যময়। সুকান্তর কাব্যজাগরণ প্রশ্ন-জর্জরিত আর হতাশাশ্রয়ী। এগোবার মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর কালো পর্দা তার জীবনের সামনে ঝুলেছে অনেকদিন—যখন পথ খুঁজেছে অথচ তার সন্ধান পায়নি:

"অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার।"

কখনো মৃত্যুকে মনে হয়েছে একেবারে সম্মুখীন:

সন্ধ্যাবেলা, আজ সন্ধ্যাবেলা
নিষ্ঠুর তমিস্রা ঘনালো কী?

মরণ পশ্চাতে বুঝি ছিলো
সহসা উদার চোখাচোখি।"

আর এসেছে হতাশা :

"হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু ভুল ক'রে
মনে রাখো মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগায়।"

কিন্তু এই মৃত্যুর অনুভূতি আর হতাশা তার কবি-সত্তারই। তাই ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে দার্শনিক দৃষ্টিও। ভাবছে মৃত্যুর পর কী ঘটবে :

"আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লির ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শংকারে।

* * * *

পরিচয়ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণ ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের।
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ।
আমার মৃত্যুর পর জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায় স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর।"

আর এই দার্শনিকতায় তার মৃত্যুকে মনে হচ্ছে অনতিক্রমণীয়, জীবনের সার সত্য বলে :

"মৃত্যুকে ভুলেছো তুমি তাই,
তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সর্বদাই।
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুকে স্মরণ ক'রো মনে
মুহূর্তে মুহূর্তে মিথ্যা জীবন ক্ষরণে,—
তারই তরে পাতা সিংহাসন
রাত্রিদিন অসাধ্য সাধন।"

এবং

"জন্মের প্রথম কাল হ'তে,
আমরা বুদ্‌বুদমাত্র জীবনের স্রোতে।"

এখানে মৃত্যু আর হতাশার পাশাপাশি এসেছে এই যে নির্লিপ্ত বিচারবুদ্ধি, এই জিনিসই অন্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে।

কিন্তু জীবন-প্রারম্ভেই এই মৃত্যুর অনস্বীকার্যতাকে সে সচেতনভাবে কখনো মেনে নিতে পারেনি। তাই এসেছে সংঘাত :

"যতদূর দৃষ্টি যায়—
চেয়ে দেখি ঘিরেছে কুয়াশা।
উড়ন্ত বাতাসে আজ কুমেরু কঠিন
কোথা হ'তে নিয়ে এলো ঘন অন্ধকার ;
—এই কি পৃথিবী ?"

এ-সংঘাত নানা ছদ্মবেশে। কখনো বা ব্যঙ্গের আড়ালে :

"বন্ধু আমরা হারিয়েছি আজ প্রাণধারণের শক্তি,
তাইতো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরোনো দিন,
আমাদের ভালো পুরোনো, চাই না বৃথা নবীন।"

কখনো আবার আত্মোজ্জীবনের দুরূহ চেষ্টায় :

"ক্লান্ত বুকের হৃৎস্পন্দন ক্রমেই ধীর
হ'য়ে আসে তাই শেষ সম্বল তোলো পাঁচিল।
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের এই নির্বিরোধ—
হতাশা নিয়েই নিত্য তোমার দাদন শোধ ?
*　　*　　*　　*
মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।"

কিংবা :

"সুপ্তোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রূর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্যমাঝে কুঠার চালায়।
কাল্যে মৃত্যু ফিরে যায় এসে।"

পিরামিড সে স্বয়ং।

কিন্তু এই সংঘাত-সংকুলতা থেকে স্থায়িভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে মার্কসবাদী সংগঠনের সংস্পর্শে এসে। এই সময়ে এই মৃত্যুময়

হতাশার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে আবার হয়ে পড়েছে নিশ্চিন্ত আশাবাদী। মৃত্যুকে একেবারে মুছে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে জীবন থেকে। কারণ তার জানা আছে :

"মৃত্যুর মৃত্তিকা 'পরে ভিত্তি প্রতিকূল
সেখানে নিরত রাত্রি ঘনায় বিপুল।"

তাই লিখেছে :

"আমার মৃত্যুর পর কেটে গেলো বৎসর বৎসর
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টাও আজ অগভীর"

আর সে জন্যেই :

"আমার একক পৃথিবী
ভেসে গেলো জনতার প্রবল জোয়ারে
*   *   *
কোথায় সেই দূর সমুদ্রের ইশারা
আর অন্ধকারের নির্বিরোধ ডাক।
দিনের মুখে মৃত্যুর মুখোস।"

কিন্তু এই মার্কসীয় আশাবাদিতার সত্যে ধীরে ধীরে সত্যকার স্থিতিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এসেছে তার সেই মৃত্যুর অনুভব থেকে অর্জিত দৃষ্টিকোণ,— "...বুঝলাম কোনো কিছুর আসাটাই স্বপ্ন আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব, খুব কম জিনিসই কাছে আসে কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই।" তাই :

"ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।"

খবর, কনভয়, ঐতিহাসিক, চিল ইত্যাদি কবিতা অনুভূতির এই স্তর থেকেই লেখা।

এখন সুকান্ত মৃত্যুকেই জীবনের শেষ সত্য ব'লে মানে না ; বরং তার উল্টোই। সমষ্টিগতভাবে জীবনের জয়ই চরম সত্য ; কিন্তু ব্যক্তিগত মরদেহের বিলুপ্তিও অবধার্য। তাই জীবনটাকে সে দিয়ে যেতে চায় কালের কল্যাণে :

"চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,

এই পর্যায়ের অন্যতম সৃষ্টি তার 'আগামী।'

তারপর আরো পরিণত অবস্থায় এই নির্লিপ্ত মানসের সেরা সৃষ্টিই তো তার প্রার্থী :

"হে সূর্য
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

এ-আকূতি সে জানাচ্ছে কোথায় দাঁড়িয়ে?—একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেই ব্যাপারটা স্বচ্ছ হবে : বিদায়ের প্রাক্কালে মৃত্যুর সীমারেখা থেকে এ তার অনাসক্ত আত্মারই চরম নিঃসংশয়িত শুভ প্রার্থনা।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজকের বিপ্লবী অধিনায়কেরা—যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিশ্বের স্রষ্টার আসনে, তাঁদের সকলের পিছনেই আছে এমনি এক মৃত্যু-উত্তরণের গভীর গোপন, অনিবার্যতম ইতিহাস—এ-কথা ধ'রে নিতে তাই কুণ্ঠা জাগে না।

রাজধানীর কাহিনী

অনামী

সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতের চারজন শ্রেষ্ঠ সুরসাধককে পাঁচ শ টাকা দামের একখানা করে কাশ্মীরী শাল আর হাজার টাকার একটি করে তোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ'হাজার টাকা। তবু বলব : সাধু!

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে।

এক কৃপণ দম্পতি। কোনো সৎকার্যে একটা কানাকড়ি দেবার কথা তাঁরা ভুলেও ভাবতে পারেন না। ভিখিরী এলে দূর থেকে করেন দূর-দূর।

কৃপণা গৃহিণী একবার এক নাছোড়বান্দা ভিখিরীর পাল্লায় পড়লেন। রোজ রোজ খালি হাতে ফিরে যায় ভিখিরী। আজ সে পণ করেছে কিছু না নিয়ে উঠবে না।

উত্যক্ত হয়ে গৃহিণী বার হয়ে এলেন : "দূর হ"।

"যা হোক কিছু দাও মা," হাত পাতে অবুঝ ভিক্ষুক।

"ছাই দেব তোকে—উনুনের ছাই। নিবি?"

"তাই দাও মা, তাই দাও। তবু হাত আসুক।"

ছাই নিয়ে খুশি মনে চলে যায় ভিখিরী। অনভ্যস্ত হাত ছাই দিয়েই শুরু করে তো করুক না। কে জানে একদিন ভুল করে এক মুঠো চালও দিয়ে ফেলতে পারে।

আশা নিয়েই জীবন। তাই সঙ্গীত-ভারতীর এই সরকারী স্বীকৃতিতে আমরাও খুশি হয়েছি, ভারত সরকারের দানের পরিমাণে নয়। মাথাভারী কু-শাসনের কোটি কোটি টাকার মুষ্টিবদ্ধ বাজেটের নিশ্ছিদ্র কিনারা চুঁইয়ে এক ফোঁটা ফকিরের ভিক্ষা যদি বার হয়ে হঠাৎ এসেই থাকে, নিঃসন্দেহে তা সুসংবাদ। হাত আসুক, হাত আসুক!

সম্মানিত হয়েছেন উভয় পক্ষই। এক পক্ষে আজীবন নিরলস সাধনার অক্ষয় খ্যাতি, আর একদিকে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা ও জন-সংস্কৃতির খাতে ব্যয়বরাদ্দের নিঃসঙ্কোচ সংকোচনের পর্বতপ্রমাণ অখ্যাতি। তাই গ্রহীতা চারজন সঙ্গীত-শিল্পীর চেয়ে ঢের বেশি সম্মানিত হয়েছেন বরং দাতা ভারত সরকার স্বয়ং।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ শতায়ু হোন। শতায়ু হোন ওস্তাদ মুস্তাক

হোসেন খাঁ। কর্নাটক সঙ্গীতের রামানুজ আয়েঙ্গার আর শাম্বশিবম আয়ারের আয়ুর কোঠা দ্বিগুণ হোক কামনা জানাই।

*

সম্মানিত চারজন প্রতিভার মধ্যে একজন হচ্ছেন বাঙালী। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সম্মানে আমাদের তাই দু'বার করে আনন্দ—একবার সারা ভারতের সকলের সঙ্গে, আর একবার খাঁ সাহেব বাংলার বরপুত্র বলে আমাদের প্রাদেশিক ভাবাবেগের দিক থেকে।

দিল্লীর বাঙালী সমাজ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর রাষ্ট্রীয় মর্যাদালাভে কেবল খুশি হয়েই কর্তব্য শেষ করেনি। নয়া দিল্লীর বিখ্যাত কালীবাড়িতে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের শত মুখে তারিফ করি। তাঁরা এই সত্যেরই এক প্রমাণ দিলেন যে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্র না মানে ধর্ম, না জানে ভূগোল, না শোনে ভাষার বাধা। হিন্দুর কালীবাড়িতে মুসলমান প্রতিভার সংবর্ধনা-সভা! সাবাস দিল্লী!

*

এর দিন কয়েক পরে নয়া দিল্লীতে এক সঙ্গীত-সম্মেলন হয়ে গেল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এত বড় উৎসব এর আগে আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। শিল্পী-সমাবেশের দিক থেকে বলছি না। দিল্লী ভারতের রাজধানী বলে এবং সেই কারণে, বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলি (তাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গসহ) এখানে থাকার জন্যে এমন ষোল আনা আন্তঃপ্রাদেশিক ও বেশ কিছুটা আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলী পাওয়া একমাত্র দিল্লীর পক্ষেই সম্ভব।

কনস্টিটিউশন্ ক্লাবের খোলা মাঠে মস্ত বড় মণ্ডপ। সুসজ্জিত মঞ্চ। হাজার তিনেক সারি সারি চেয়ার। ফ্লাড্ লাইট আর মাইকের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। মঞ্চের সামনে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের দীর্ঘকায় ক্যামেরা। এক কোণে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 'রিলে' করার যান্ত্রিক সরঞ্জাম। উদ্বোধন দিবসে মণ্ডপে ঢুকে মনে হল যেন এ-আই-সি-সি'র এক অধিবেশনে এসেছি। ভারতীয় কলাকেন্দ্র ও গন্ধর্ব-মহাবিদ্যালয়ের যুগ্ম-উদ্যোক্তাদের ভয় ছিল এত বড় আড়ম্বরের ক্রিয়া না লঘু হয়ে দাঁড়ায়।

তা হয় নি। দিল্লীর নাগরিকদের কাছ থেকে সাড়া মিলেছে আশাতীত। অনপ্রসর বলে রাজধানীর যে একটা অপবাদ আছে তা ঘুচে যাবার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এই সঙ্গীত-সম্মেলনে।

রাত তখন সওয়া তিন।

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে একটানা চলে এসেছে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের 'প্রগ্রাম্'। ইলিয়াস খাঁ, অনন্তমনোহর যোশী, আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ আর পটবর্ধন পর পর অপূর্ব সুরলোকের সৃষ্টি করে নয়া দিল্লীর সুরলোকের কিছু দেবদেবীকে—চড়া দামের সীটের জনকয়েক ছোটবড় 'পেট্রন' আর 'ডোনারকে'—বহু আগেই মণ্ডপছাড়া করে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন যাঁর যাঁর বাঙলো পর্যন্ত। তিন টাকার আর পাঁচ টাকার সিটের হাজার দেড়েক সাধারণ মানুষ কিন্তু তখনো সমান উৎসাহে উৎকর্ণ হয়ে আছে। কেশর বাঈ কেশকারের প্রথম গানখানা যখন শেষ হল, রাত তখন সওয়া তিন। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি একদল ইউরোপীয় নরনারী এতক্ষণে গাত্রোত্থান করে নিঃশব্দে চলে গেলেন। বোধ হয় কোনো এক এম্বাসি স্টাফের লোক। ছ'সাত ঘন্টা তাঁরা বসেছিলেন কিসের টানে? ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সহজবোধ্য বা সহজগ্রাহ্য নয় বলে একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। স্বীকার করতেই হবে, সত্যিকার প্রতিভাবান শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত বা তাঁর অঙ্গুলি-স্পর্শে উচ্ছলিত সুর-তরঙ্গের বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ একটা আবেদন আছেই। নইলে বিদেশী শ্রোতা আমাদের মার্গ-সঙ্গীতের রস পাবার জন্যে যতই সশ্রদ্ধ মন নিয়ে আসুন না কেন, অনভ্যস্ত কান নিয়ে রাত তিনটে অবধি কখনো জেগে থাকতে পারেন? মনে হয় খাঁটি শিল্পী মাঝে মাঝে সুস্বর ধ্বনি-রাজ্যের এমন এক ঊর্ধ্ব স্তরে উঠে যেতে পারেন যেখানে এক জগৎজোড়া মিল বার হয়ে পড়ে আর সব দেশের ও আর সব জাতির সযত্নলালিত ধ্বনিসম্পদের সঙ্গে। সেই চরম মুহূর্তে সঙ্গীতপিপাসু কান আর সাঙ্গীতিক ব্যাকরণ ও কলাকৌশলের অপেক্ষা রাখে না।

*

রবিবারের সকালের অধিবেশনে দেখা হয়ে গেল আমার বহুকালের পরিচিত কলকাতার এক সঙ্গীতপ্রাণ বন্ধুর সঙ্গে। মিলিটারিতে কাজ করে। সে যে এখন দিল্লীতে থাকে জানতাম না। বন্ধুটি সমঝদার লোক। আমার মতো আনাড়ী শ্রোতা নয়।

বেলা সাড়ে বারোটায় গানের আসর ভাঙল। গান-পাগল বন্ধুটি তখন যেন আর এক জগতের লোক। তার সারা মন জুড়ে সদ্যসমাপ্ত সঙ্গীতের রেশ। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: "গানের আসরে এলে ভাই এই একঘেয়ে মিলিটারি লাইফেরও একটা মানে পেয়ে যাই।"

"কী রকম ?"

"এই মহাসম্পদের জন্যে দরকার হলে প্রাণ দেওয়া যায়। এই সম্পদ রক্ষার জন্যে একদিন ট্রেঞ্চে শত্রুর দিকে মুখ করে শক্ত হাতে রাইফেল ধরে মরে গিয়েও দাঁড়িয়ে আছি—এ দৃশ্য কল্পনা করতেও ভালো লাগে।"

হেসে বললাম, "যা বলেছ। যে-যুগে আমরা বাস করছি তাতে বলা যায় না কখন কী ঘটে। এই ধরো না, সারা উত্তর ভারতের ক্লাসিক্যাল্ মিউজিকের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারীদের বেশির ভাগই তো এসে জড়ো হয়েছেন এই সঙ্গীত-সম্মেলনে। এখন—এই মুহূর্তে—আকাশ থেকে একটা এ্যাটম বোমা পড়লেই ব্যস্। তোমার এত সাধের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের—"

"ফেললেই হল!" আমার পরিহাসের জবাবে মিলিটারি বন্ধুটি তার কল্পনায় রঙ চড়াল—আমার চেয়ে দ্বিগুণ। সুপুষ্ট দুই বাহু উপরে তুলে বলল, "খপ করে ধরে ফেলব ফুটবলের মতো। তারপর সেই এ্যাটম বোমা ছুঁড়ে ফেলে দেব যেখান থেকে এসেছে সেইখানে। পুড়ে মরবে সঙ্গীতের শত্রু।"

শুধুই কল্পনা আর পরিহাস। তবু ভালো লাগে শুনতে।

*

সত্যি মহা সম্পদ। এই অক্ষয় ঐশ্বর্য লালন ও অনুশীলনের দায় জাতীয় দায়। কিন্তু ট্রাজিডি এইখানে যে, আমাদের এতবড় এক সম্পদ সম্পর্কে সমগ্র জাতি এখনো সম্যক সচেতন নয়। হবে কী করে? ঘরানা সঙ্গীতের পরিবেশন রাজারাজড়ার সোনার খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুসংখ্যক সচ্ছল মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আসর, চড়া দক্ষিণার সভা-সম্মেলন এবং আজকাল রেকর্ড ও রেডিও মারফত যতই সম্প্রসারিত হোক না কেন, এখনো তা জনগণের নাগালের বাইরে। দরবারী আজো পুরোপুরি বারোয়ারী হতে পারেনি। অশিক্ষিত অমার্জিত জনসাধারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসাস্বাদনে অক্ষম এমন কথা মানব না। মার্গ সঙ্গীতের বোদ্ধা হতে হলে শ্রোতা হওয়ারও একটা ট্রেনিং থাকা চাই এ কথা স্বীকার করি। সুযোগের অভাবে সেই শিক্ষা আমাদের অনেকেরই তো নেই। তবু আমরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ভিড় করি। অল্পবিস্তর ভালো লাগে বলেই সেখানে যাই। এই ভালো লাগার ক্ষমতা কারো একচেটে নয়—সমাজের কোনো এক বিশেষ স্তরের। গানের কান গতরে-খেটে-খাওয়া জনসাধারণের মধ্যেও কম নেই। সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা না হলে এই সর্বনিম্ন স্তর থেকেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসগ্রাহী শ্রোতা মিলত অসংখ্য।

এ অনুমানের কথা নয়। দিল্লীর সঙ্গীত-উৎসব উপলক্ষ্যেও এ কথার সমর্থন পেয়েছি। অবশ্য তা উৎসব-মণ্ডপের বাইরে। এবার সে কথাই শোনাবো।

*

নয়া দিল্লীর যে-অঞ্চলে আমি থাকি তার এক নিজস্ব সুন্দর বাজার আছে। সেই গোলাকার বেঙ্গলী মল্ মার্কেটের এক পানওয়ালা কুন্দনলাল। বহুকাল হল অভাবের তাড়নায় সপরিবার গ্রামছাড়া। পান, সিগারেট, দেশলাই, সাবান এবং আরো সব টুকিটাকি জিনিসপত্র বেচে কায়ক্লেশে তার সংসার চলে। আজ দেড় বছর আমি তার একজন বাঁধা খদ্দের। এই অতি-সাধারণ লোকটা সম্পর্কে জানবার আর কীই বা থাকতে পারে; আমার এই অহঙ্কৃত ধারণায় একটা হেঁচকা টান পড়ল সঙ্গীত-সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে।

এই শেষ অধিবেশনই ছিল সব চেয়ে জমজমাট। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, আলী আকবর, রবিশঙ্কর, নিসার হুসেন, নারায়ণ রাও ভিয়াস ও আরো সব খ্যাতিমান শিল্পীর সঙ্গীত-বাসরীয় কোজাগরী সেদিন। পর পর তিন রাত্রি জেগে আমার শরীরের অবস্থা কাহিল। পর দিন আপিস আছে। সাতপাঁচ ভেবে সেদিন আর যাব না ঠিক করলাম।

রাত দশটা নাগাত বাসায় ফিরছি। আজ অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে শেষ দিনের সঙ্গীতের আসর 'রিলে' করার কথা সকালের খবরের কাগজে বার হয়েছে। সচ্ছল সম্পন্ন পাড়া। ঘরে ঘরে রেডিও। কৈ, বিলায়েৎ খাঁর সেতার এখন শুনছে না তো কেউ? মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। এ পাড়ায় অন্তত একজন 'সমঝদার' তো আছে। সেই একজন আমি।

বাসায় খুব কাছেই বাজার। সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি কুন্দনলালের দোকান আজ অসময়ে বন্ধ। এই সময়টায় নৈশ ভোজনান্তের পান-বিড়ির ছুটকো খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকে রোজই। কাছেই পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের এক তাঁবুর কলোনি।

আর এক দোকান থেকে সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি তারই পাশের 'বেঙ্গলী সুইট্ হাউসের' বারান্দায় বসে আছে কুন্দনলাল। একা নয়। সঙ্গে আরো জন কয়েক। তারই সমশ্রেণী।

"তোমার দোকান আজ বন্ধ কেন কুন্দনলাল?"

"রেডিও কা গানা শুননে আয়া হুঁ। দিল্লীমে বড়ে বড়ে গানে-বাজানেওয়ালে আয়ে হ্যায়।" এমন এক সংবাদে আমায় নীরব দেখে সে

আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে জানায়, "কাল সবেরে ভি রেডিওসে বারা বাজে 'তক গানাবাজানা শুনায়ে থে। আজ দশ বাজেসে শুরু হোনেওয়ালা হ্যায়।"

এই ময়রার দোকানের রেডিও সেট্ রাতদিনই খোলা থাকে। কুন্দনলাল এখানে গান শুনতে এসেছে—এসেছে কয়েক ঘণ্টার পান-বিড়ি-সিগারেট্ বিক্রির আয়ের কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করে দিয়ে।

প্রশ্ন করি: "এ গান তুমি বোঝ? ওস্তাদী গানা সমঝ্‌তা হো?"

প্রশ্নটা ঠিক বুঝল না মনে হয়।

"ওস্তাদী গান ভালো লাগে তোমার? পছন্দ্ করতা হো?"

"জী হাঁ।"

আমার খানিক আগের আত্মপ্রসাদের বেলুন চুপসে এতটুকু হয়ে যায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কে বড় ভক্ত? আমি, না কুন্দনলাল?

নিচের তলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতা নেই কে বলে? বঞ্চনার বেড়ার এখানে-ওখানে একটু আধটু ফাঁকের সুযোগে আজ ঐ মহাসম্পদের কিঞ্চিৎ আস্বাদও যদি পেয়ে থাকে এক-আধ জন কুন্দনলাল, তা হলে এমন দিন আসবে যেদিন আর সব সম্পদের মতো এ সম্পদও তারা আদায় করে নেবে অধিকারের বলে।

জনচিত্তের সেই ভিত্তি না পাওয়া পর্যন্ত হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বর্তমান বন্ধ্যা দশাও বুঝি ঘুচবে না। একটা তাজমহল বা একটা কোনারকের মতোই অপূর্ব অদ্ভুত এই চলমান সঙ্গীতসম্পদ বহু যুগ হয়ে গেল সুদে-আসলে আর নতুন করে বাড়ছে না কেন? সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বড় বড় প্রতিভার আবির্ভাব সত্ত্বেও ঐশ্বর্যশালিনী সঙ্গীতভারতী নব সৃষ্টির ক্ষমতার অভাবে নিখুঁত পুনরাবৃত্তির মনোহারী চক্রাবর্তে অমন স্বাস্থ্যবতী হয়েও কেন এমন নিষ্ফলা? রাজপ্রাসাদের প্রেরণার যুগ বহু আগেই শেষ হয়েছে। আজকের লোকস্বার্থবিমুখ রাষ্ট্রের যৎকিঞ্চিৎ দয়া-দাক্ষিণ্যও তাকে নতুন খাতে নামাতে পারবে না। তার জন্যে দরকার বৃহত্তম পটভূমি—এক বলিষ্ঠ লোকায়ত ভিত্তি। এই প্রশ্ন আজ ক্রমেই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কন্‌স্টিটিউশন ক্লাবের সঙ্গীতের আসর থেকে বেঙ্গলী মল্ মার্কেটের এই মিষ্টির দোকান আধ-মাইলটেক পথ। এত কাছে, তবু কত দূরে!

*

শেষ দিনের সারা রাতের আসরের রিপোর্ট দিন কয়েক পরে এক বন্ধুর মুখে

শুনেছি। ভারতীয় কলাকেন্দ্রের উদ্যোক্তারা অজান্তে যেন এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন।

কন্‌স্টিটিউশন ক্লাবের বেয়ারা আর চাপরাশিদের এবং আশপাশের বাড়ি-গুলোর একদল 'বয়', চাকর আর দারোয়ানকে নাকি রাত-দুপুরে মণ্ডপে ঢুকে গান শোনার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। আর যায় কোথায়! এ ক'দিন তারা ঘুর-ঘুর করেছে চারদিকে। অন্দরের গন্ধ পেয়েই খুশি ছিল। শেষ দিনে তাই রবাহুতের দল হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঘাসের আসনে নিঃশব্দে বসে থেকে মন দিয়েই নাকি গান-বাজনা শুনেছে শেষ পর্যন্ত।

উৎসবান্তে কাঙালী বিদায়ের মতো। তবু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই সংবাদ। কল্পনায় চলে যাই ভবিষ্যতের এক অজানা অধ্যায়ে। আর কাঙালী নয়, বিজয়ী বীর। দলে দলে ভেতরে ঢুকছে তারা উত্তরাধিকার বুঝে নিতে। সঙ্গীতের, সাহিত্যের, চিত্রকলার ও স্থাপত্যের অন্তর্নিহিত মর্মের তখনো তারা পুরো সমঝদার না হলেও কিছু তার পায় যে আভাস, কিছু পায় অনুমানে, কিছু তার বোঝে না বা। কিন্তু এ সত্য তখন বুঝে ফেলেছে যে, ঐ ধনসম্পদ তাদের। তারাই ওয়ারিস। একে লালনের, পালনের, সাধনার ও সংস্কারের সকল দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অসংখ্য কুন্দনলাল সেদিনের আলাউদ্দীন খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, রামানুজ আয়েঙ্গার ও শাম্বশিবম আয়ারকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায় বার বার।

হীরা

আম্মাভাও সাঠে

১৩৫০ সালের চৈত্রমাস। রোদের তেজ প্রখর হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত জমি রোদের তাপে ধ্বক ধ্বক করছে, বর্ষার জল আর ধান বোনার আশায় দিন গুনছে। সমস্ত গাছে চৈত্রমাসে নতুন পাতা দেখা দিয়েছে। নতুন কচি পাতার সবুজ রং রোদের আলোয় ঝলমল করছে।

গাছের ছায়ায় গাঁয়ের লোকেরা বিশ্রাম করছে। পুব দিকের একটি বাড়ির দরজার সামনে কিছু লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে। ঘরের চাল টিনের। টিন-গুলো পুরোনো হয়ে গেছে—জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়েছে। ঘরের দেওয়ালগুলো রাঙামাটির কাঁচা ইঁটে তৈরি। বাড়ির মালিক লক্ষ্মীমনা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে তিনজন সশস্ত্র সৈনিক। তাদের কাঁধে বন্দুক ও খোলা কীরিচ রোদের আলোয় ঝকমক করছিল।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হীরা দাঁড়িয়েছিল—তার চোখে মুখে আনন্দের আভা। আজ তার স্বামীর কাছ থেকে মনি-অর্ডার এসেছে। বহদূর দেশ থেকে সে মনি-অর্ডার এসেছে। আর তার শ্বশুর লক্ষ্মীমনা তার লম্বা আর উগ্র গোঁফে তা দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপসই দিচ্ছে।

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা লক্ষ্মীমনার ছেলে বিশ্বাসের তারিফ করতে থাকে।

"শেষ পর্যন্ত ছেলেটা ভালই হল, কি বল? লড়াইয়ে গিয়ে নিজের মা-বাপকে ভুলে যায় নি।"

আশেপাশের লোকের কথা শুনে হীরার মন আনন্দে ভরে ওঠে। বিশ্বাস দু'বছর হল লড়াইয়ে গেছে। প্রতি মাসে তার মনি-অর্ডার নিয়ে আসে তিনজন পাঞ্জাবী সৈনিক। সাতারায় তখন '৪২-এর আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেইজন্যে লড়াইয়ের ময়দানে যে-সব সৈনিক আছে তাদের মাইনের টাকা যাতে ঠিকমতো তাদের ঘরে পৌঁছয় তার জন্যেই সিপাইয়ের মারফত পাঠাবার এই ব্যবস্থা। লক্ষ্মীমনা টিপসই দিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোট নিল। আর সিপাই তিনজন পাশের গাঁয়ের উদ্দেশে চলে গেল।

চারদিকে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। কেউ বলে, "ছেলেটা

নিজের বুড়ো বাপ আর দুই ভাইকে সাহায্য করছে।" আবার কেউ বলে, "পয়সা এল তো কি হয়েছে? মরণের সামনে মাথা পেতে দিয়ে লড়াই করছে না সে?" সারা গাঁয়ের লোক বিশাসের সুখ্যাতি করতে থাকে। তাদের মতে এই রকম কঠিন সময়ে মা-বাপকে টাকা পাঠানোটাই বাহাদুরির কাজ। হীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কথা শোনে। তার মনে হয় কথাগুলো তার কানে অমৃত বর্ষণ করছে।

লক্ষ্মীমনা তার বুড়ী স্ত্রীকে টাকা দিয়ে বাইরে এল। তারপর হীরা.কে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতের দিকে যায়। জালানী কাঠ মাথায় নিয়ে হীরা তার শ্বশুরের পেছন পেছন চলে। আজ তার মুখটা ভরা-ভরা দেখায়। তার মনের মধ্যে স্বামীর কথা ঘোরে। এই মধুর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ধীর পদক্ষেপে ক্ষেতের দিকে সে এগিয়ে চলে। সামনে তার শ্বশুরও মনের আনন্দে এগোয়। আজ তার ছেলের কাছ থেকে টাকা এসেছে। আর হীরার চোখে সে যেন বিশাসকে দেখতে পায়। পুরোনো দিনের অনেক কথা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

হীরা ও বিশাসের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বিয়ে কি জিনিস বুঝবার তাদের ক্ষমতা হয়নি। সে আজ দশ বছর হল। বিশাসের বাবা লক্ষ্মীমনা আর হীরার বাবা মারুতী রাও-এর বন্ধুত্ব অনেক দিনের। তারা দুজনে মিলে গরুর ব্যবসা করত। তখন দুবাড়ির লোকজনের খুব যাওয়া আসা ছিল। তাদের বন্ধুত্ব ছিল খুব গভীর। আর সেই বন্ধুত্ব স্থায়ী করবার জন্যেই তারা হীরা ও বিশাসের বিয়ের ব্যবস্থা করে। হীরের মতোই উজ্জ্বল ছিল হীরার রূপ-লাবণ্য। বিশাসও সেইরকম রূপবান ছিল। সেই জন্যেই লক্ষ্মীমনা আর মারুতী রাও খুব ধুমধাম করে এদের বিয়ে দিয়েছিল। পাঁচদিন ধরে উৎসব ও খাওয়াদাওয়া চলে।

মারুতী রাও হীরাকে স্কুলে পাঠায়। আর তারপর হীরার দেহে মনে যখন যৌবনের জোয়ার তখন বিশাস এক বোর্ডিং-এর ঘরে বসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সে হীরাকে চিঠি লেখে, পরীক্ষায় পাস হবার পর তারা একসঙ্গে সুখের নীড় বাঁধবে। কিন্তু তা আর হল না। সে ম্যাট্রিক ফেল ক'রে বাড়ি ফিরে আসে। নিজের ওপরই তার রাগ হয়। কাউকে কিছু না বলে সে পুনার রিক্রুটিং অফিসে এক দরখাস্ত পাঠায় আর দশ দিনের মধ্যেই মিলিটারিতে চাকরি পায়। দুটো কথা বলার আগেই বিশাস বহুদূরে চলে যায়। হীরার মনে হয় যে তার স্বামী তাকে স্বপ্নের মধ্যে একবার দেখা দিয়ে

যেন আবার মিলিয়ে গেল। নিজের মনকে সে বলে, "তোমার স্বামী যুদ্ধে গেছে।"

সেদিন থেকেই হীরা দিন গোনে তার স্বামী কবে ফিরে আসবে। দিনরাত সে ভাবে, যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তার বিশ্বাস কবে তার কাছে ফিরে আসবে। যদি আজ যুদ্ধ থামে তাহলে কাল এবং কাল থামলে পরশু সে ঘরে ফিরে আসতে পারে, এই রকম চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এ-আশা তার পূর্ণ হয় না। প্রতি মাসে বিশ্বাসের মনি-অর্ডার ঠিকমতো আসে। এইভাবে এক বছর কাটে।

শ্বশুর-শাশুড়ী আর দুই দেওরের মন জুগিয়ে সে দিন কাটায়। ঘরে কোনো অভাব নেই। বিশ্বাসের কাছ থেকে টাকা আসে, তাছাড়া হীরার দুই দেওর—মুকা ও পালোয়ান—আর বুড়ো শ্বশুর তিন জনেই ক্ষেতে কাজ করে। হীরাবাঈও তাদের সাহায্য করে। নিরুদ্বেগে দিন চলে কিন্তু হীরার মনে কোন সুখ নেই।

বিশ্বাস একবার ছুটিতে বাড়ি আসে। হীরার মনে খুব আশা ছিল সে বিশ্বাসের সঙ্গে গল্প করবে, হাসবে, খেলবে, অকপটে নিজের মনের কথা বলবে কিন্তু তা হল না। বিশ্বাস বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমনার বাড়ি মানুষে ভরে গেল। বিশ্বাসের পাঁচ বোন তাদের স্বামী-পুত্রদের নিয়ে এল। অন্য গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা আসতে লাগল। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হীরার মা-বাবাও আসেন। সবাই খুব খুশি। বিশ্বাস লড়াইয়ের ময়দান থেকে বেঁচেবর্তে ফিরে এসেছে, তাই তাকে ঘিরে বসে সবাই গল্পগুজব করে। হীরাও খুব খুশি। তার জন্যে বিশ্বাস নতুন শাড়ী ও গয়না কিনে এনেছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাসকে একান্তে পাবার উপায় নেই। সমস্ত ক্ষণ তাকে লোকে ঘিরে বসে থাকে। গাঁয়ের কুলকার্নি তার বন্ধু—সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে লড়াইয়ের গল্প শোনে। এই ভাবেই হীরার আশা ভঙ্গ হয়। দূর থেকে দেখা ও দূর থেকেই কথা বলা এইটুকুই তার একমাত্র লাভ। এই ভাবেই তার ছুটি শেষ হয়। বিশ্বাস আবার যুদ্ধে চলে যায়। অতিথিরা যে যার গাঁয়ে ফিরে যায়। আবার বিশ্বাসের চিন্তায় মগ্ন হয়ে হীরার দিন কাটে। আজও সেই বিরহ-ভারাতুর মন নিয়ে সে ক্ষেতের পথে চলেছে। মন তাকে বলে, হীরা! তোর ভেতরে যে-সম্পদ আছে, তাকে যত্ন করে তুলে রাখিস সে ফিরে না আসা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে সে মনের কাছে নালিশ জানায়, এ-সম্পদ তো আগলে রাখবই, কিন্তু কতদিন, কেমন করে, কবে

থামবে এ লড়াই ? কবে ও আসবে ? কবে সুখে সংসার করতে পাব ? আমি কী করব !

এ নালিশের উত্তর সে পায়, লড়াই কি তোর মর্জির উপরে নির্ভর করে ? বরং উল্টো, তোর জীবন-মরণ, তোর সব কিছু ঐ লড়ায়ের উপরে নির্ভর করে আছে। শান্ত মনে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মাঝে মাঝে তার মনে হয়, কী জানি কেন আজকাল আমার বড় ভয় করে। আমি তো খুব সাবধানেই চলি, তবু কেন যেন মনে হয় চোরে আমার সর্বস্ব কেড়ে নেবে। তখন আমি ওকে কী জবাব দেব ? এ-যুদ্ধ আমাকে হয়রান করে দিল, আমায় যেন বাঁচতে দেবে না ঠিক করেছে। কবে এ-যুদ্ধ থামবে ?

তার মন তাকে সান্ত্বনা দেয়, এ-কথা ভেবে লাভ কী ? তুই কি সব ভুলে গেলি ? বিশ্বাস কি তোকে বলেনি, যে লড়াইয়ে লাখো মানুষ মারা যায় ? গায়ে পোকা হয়। একটা যুদ্ধ কি সোজা জিনিস ?

হীরা অতি দুঃখে প্রশ্ন করে, এ-লড়াই কবে থামবে ? আমার এ-দুঃখ কবে শেষ হবে ? আমি আবার কবে সুখী হব ?

হীরার ভাবভঙ্গি দেখে লক্ষ্মীমনা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে, হীরাবাঈ, কি হল তোমার ?

হীরার সম্বিৎ ফিরে আসে। বুঝতে পারে সে এত জোরে কথা বলেছে যে বুড়ো শুনতে পেয়েছে। লজ্জায় ভেঙে পড়ে সে। কোনও জবাব না দিয়ে সে ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

যেদিন থেকে এই চিন্তা তার মনকে পীড়িত করল, সেদিন থেকে বিশ্বাসের কথা মনে করে কান্নাকাটি করা তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই সে বেঁচে রইল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। হীরা যখন স্বামীর জন্যে এইভাবে দিন গুনছে, বিশ্বাস তখন যুদ্ধক্ষেত্রে এক মোর্চা থেকে তার এক মোর্চায় এগিয়ে চলেছে।

গাঁয়ের ক্ষেত যখন সোনালী ফসলে ভরে ওঠে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে হীরা তখন স্বামীর কথা ভাবে। বিশ্বাস তখন হীরার কাছ থেকে অনেক দূরে, নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে এক মরুভূমিতে কামানের গোলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে ছুটে চলেছে।

বর্ষা নামে। হীরার দেহলতা বেয়ে বিষ্টির ধারা বয়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় হীরার

দেহে কাঁপন লাগে, আর তার চোখের সামনে ভাসে বিশ্বাসের মূর্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন বোমার বৃষ্টি। এক হাতে রাইফেল ধরে, আর এক হাতের কনুই মাটিতে রেখে বুকে হাঁটতে হাঁটতে অতি যন্ত্রণায় চলেছে বিশ্বাস। আবার কোন দিন বাড়ি ফিরবে, সে-আশাও যেন তার শেষ হয়ে গেছে। হীরার কথা ভাববারও তার সময় নেই।

কিন্তু হীরা বেঁচে আছে তারই কথা মনে করে। পুরোনো দিনকে পিছনে ফেলে নতুন দিন এগিয়ে চলে। শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, গাছের ডালপালা ভরে ওঠে নতুন কচি পাতায়। পুরোনো গাছের অঙ্কুর থেকে নতুন সবুজ চারা জন্ম নেয়। পুরোনো ফসলের জায়গায় আসে নতুন ফসল। পুরোনো জীবনের অবসান হয়ে নতুন জীবনের আবির্ভাব হয়। গাঁয়ের মেয়েব বিয়ে হয়, পেটে সন্তান আসে। হীরা শুধু লড়াইয়ের চিন্তাজালে বন্দী হয়ে থাকে। 'যুদ্ধ থামলে আমার স্বামী ঘরে আসবে, আমি নিজের সংসার পাতব।'

এ-যুদ্ধ যেন তার জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। কয়েক হাজার মাইল দূরের যুদ্ধ যেন তার বুকের উপরে চালাচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য। এ-যন্ত্রণা আর সে সইতে পারছে না। এই যুদ্ধের একটা অংশ যেন হীরার জীবনেই শুরু হয়েছে, এখন প্রশ্ন শুধু, হারবে কে? হীরা না যুদ্ধ?

চারিদিক নিস্তব্ধ। রৌদ্র প্রখর। মুরগীগুলো মাটি থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। লক্ষীমনা তার দুই ছেলে নিয়ে গেছে ক্ষেতে। হীরার বুড়ী শাশুড়ী একটি বালিশ নিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। হীরা বসে বসে সেলাই করছে।

রোদ বাড়ছে।

সকাল বেলা হীরা একটা পোস্টকার্ড আনিয়েছিল। বিশ্বাসকে সে চিঠি লিখবে। কিন্তু লিখবে কী? তাছাড়া পোস্টকার্ডে ইংরেজী ঠিকানা তাকে কে লিখে দেবে? যদি সে কুলকার্নী মাস্টারের কাছে যায়, সে শাশুড়ীকে বলে দেবে। তখন নানা কথা হবে, আর লুকিয়ে চিঠি লেখার জন্যে তার হবে বদনাম।

এ-কথাই সে বসে বসে ভাবে। তার মনে হয় তার মনের সব কথা যদি সে খুলে লিখতে পারত, তা'হলে মনটা একটু হালকা হত। কিন্তু চিঠিটা যাবে কী করে? ইংরেজীতে ঠিকানা কে লিখে দেবে?

এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিল যে বিনায়ক রাও পাওয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। এ-কথা শুনে হীরা খুব খুশি হল। কারণ

বিশ্বাস আর বিনায়ক একই বয়সী, একই ইস্কুলের ছাত্র, একই সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল ও একই রণক্ষেত্রে ছিল। তফাত শুধু এই যে বিনায়ক ধরাধরি করে বড় অফিসার হ'য়েছে, আর টাকার জোরে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাস করেছে।

হীরা হাতের কাজ ফেলে রেখে তক্ষুনি পাওয়ারের বাড়ি ছুটল। বিনায়ক তখন সবেমাত্র মিলিটারি পোশাক বদলে এসে বসেছে। এমন সময় হীরা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ঘরে ঢুকল।

বিনায়ক কালো, লম্বা, তলোয়ারের মতো ধারালো তার একজোড়া গোঁপ, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো। পরনে তার কড়া ইস্ত্রিকরা কাপড়। তার ঠাট দেখে হীরা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। অনেকখানি রাস্তা আসার দরুন বিনায়ককে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। হীরাকে দেখে সে সোজা হ'য়ে বসল। কাছেই বসেছিলেন বিনায়কের মা। তিনি বললেন, "হীরা আয়।" হীরা তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, "কী ভাই, কেমন আছ, ভাল তো?"

বিনায়ক অবাক হ'য়ে হীরার দিকে চেয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল, তুমি কেমন আছ বলো। কাকা, কাকী, তোমার দেওর মুকা পালোয়ান এরা ভাল আছে তো?" হীরা মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু..."

"কে বিশ্বাস?" বিনায়ক খুব উঁচু গলায় বলল, "ভাল আছে বোন্, সে বেশ ফুর্তিতেই আছে। তুমি তার জন্যে ভেবো না।"

এ-কথা শুনে হীরা একটু হাসল। চোখ দুটো তার ভরে গেল আনন্দ-অশ্রুতে। আর এক মুহূর্তে তার চেহারা আগের চেয়েও অপরূপ হয়ে উঠল।

হীরা কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল আর অল্প অল্প হাসছিল। বিনায়কের দৃষ্টি হীরার মুখের উপর আবদ্ধ রইল। তার লুব্ধ দৃষ্টি হীরার ঢলঢলে যৌবনশ্রীকে পায়ের নখ থেকে কপালের চূর্ণকুন্তল পর্যন্ত যেন লেহন ক'রে বেড়াচ্ছিল। তার বহুদিনের বুভুক্ষু চোখ মেলতে লাগল হীরার দেহের উপরে।

এত রূপ অনেক দিন পরে তার চোখে পড়ল। ভালই লাগছিল বিনায়কের।

হীরা ঠিক তেমনি করেই বসে রইল, আর ভাবতে লাগল কেমন ক'রে স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করা যায়। বিনায়কের মা বললেন, "আরে বিশ্বাস তোকে কী বলল সে সব কথা বল্?"

বিনায়কের হুঁস হ'ল। তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। সে বলল, "বোন্, বিশ্বাসের সাথে আমার আজ দশমাস দেখাসাক্ষাৎ নেই। তবে দিন কয়েক

হ'ল তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে যে, 'তুই যদি দেশে যাস্ তাহ'লে সকলকে বলবি যে, আমি ভাল আছি। হীরার কোন খবর পাইনি, তাকেও আমার খবর দিবি। আমাকে চিঠিপত্র লিখতে বলিস, সে যেন বাপের বাড়ি না যায়, আমার জন্তে যেন অপেক্ষা করে। যুদ্ধ থামলেই আমি ফিরে আসব।' "

এ-কথা শুনে হীরার চোখে জল এল।

ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে বিনায়কের মা বললেন, "শুনলি তোর জন্তে তার কত ভাবনা। যুদ্ধ থামলেই সে আসবে। এরকম শুধু শুধু কাঁদিস্‌নে।"

হীরা জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু যুদ্ধ থামবে কবে?" এ-কথা শুনে বৃদ্ধার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

হীরা বলল, "আমার চিঠি লিখতে বলেছে, কিন্তু আমি যে ঠিকানা জানি না, আর কী যে লিখব, তাও তো বুঝতে পারি না!"

বিনায়কের মা বললেন, "বেশ তুই কার্ড নিয়ে আয়, বিনুই লিখে দেবে।" হীরা সঙ্গে সঙ্গে কার্ডটা বের করে।

"না বোন্ আজকে থাক," বিনায়ক বলল, "আমি এখন ঘুমোবো, কাল তোমার চিঠি লিখে দেব।"

"বেশ, আমি তাহ'লে কাল দুপুরে আসব। কিন্তু আমি যে চিঠি লিখছি এ-কথা আমার বাড়ির লোককে বলে দিও না। এ নিয়ে আমার শাশুড়ী ঝগড়া করবেন, তাই বলছি।"

বিনায়কের মা বললেন, "বেশ বেশ, বিনু কাউকে যেন বলিস না, কিন্তু এতে অন্তায়ই বা কী? স্বামীকে চিঠি লেখা কি পাপ?"

হীরা এবার উঠে পড়ে। তার দেহলাবণ্য দেখে বিনায়ক আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রস্থানোদ্যত হীরার দিকে তাকিয়ে তার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা মতলব খেলে যায়। কালকের দুপুর কখন আসবে এই চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

পরদিন দুপুরে হীরা পাওয়ারের বাড়ি গেল। তখন কোথাও কেউ নেই। রাস্তায় দু'একটা ছোট ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে। সবাই ক্ষেতে, মাঠে, যে যার নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে। একমাত্র বিনায়ক হীরার জন্তে অপেক্ষা করে বসেছিল। এমন সময় হীরা এল। তাকে দেখে বিনায়কের বক্ষস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়। বাড়িতে তখন আর কেউ নেই। বিনায়কের মা গেছেন মাঠে। পোস্টকার্ড বিনায়কের হাতে দিয়ে হীরা মাটিতে বসল। বিনায়ক খাটে বসেই

চিঠি লিখতে শুরু করল। প্রথমেই ঠিকানা লিখল, তারপর দু'এক কথা লিখে হীরার দিকে চেয়ে বলল, "বোন এবার বল।" হীরা লজ্জা পেল। বিনায়ক চিঠিটা খাটের উপর রেখে উঠে এসে বলল, "বোন তোমাকে এখানে দেখতে পেলে নানা কথা হবে," এই বলে সে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করাব আওয়াজ শুনে হীরা সবিস্ময়ে বলে উঠল, "একি ভাই!" সে বুঝতে পারেনি লড়াই বিনায়কের মনুষ্যত্বকে শেষ করে দিয়েছে।

খানিক পরে দরজাটা খুলে গেল। বিনায়ক তখন হীরার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্য পশুর মতো হিংস্র তার চোখের দৃষ্টি। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে হীরা থর থর ক'রে কাঁপছে। তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠেছে। তার পরনের কাপড় বিস্রস্ত, চুল এলোমেলো। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কথা বলবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। এক পশু তার ও তার স্বামীর সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগে তার চোখে যে খুশির ছায়া ছিল, তার জায়গায় ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। পাগলের মতো সে এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। জীবনযুদ্ধে সে হেরে গেল। চোখে পড়ল মাটিতে পড়ে আছে তার স্বামীকে লেখা চিঠিটা, আর তারই পাশে পড়ে আছে তার বিয়ের মঙ্গলসূত্র*। ঝাপসা চোখে সে মাটি থেকে সেটা তুলে নিয়ে ডান হাতে শক্ত করে ধরে রইল। বাঁ হাতটা কামড়াতে লাগল মুখের মধ্যে পুরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল কামড়ের চোটে। রক্তটা পাগলের মতো চাটতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এল, তখন কাপড়টা সামলে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

হীরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল বিনায়ক সেইদিকে তাকাল, দেখতে পেল মেঝের পড়ে আছে রক্ত। তারপর বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলায় শাশুড়ী ঘরে ফিরে দেখল হীরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে বলল, খুরপী লেগে তার হাত কেটে গেছে। শাশুড়ী যখন তার দুই দেওরকে খেতে দিচ্ছিলেন, তখন লক্ষ্মীমনা বললেন, "পাওয়ারের ছেলে শুধু শুধু বাড়ি ছেড়ে আবার যুদ্ধে চলে গেল। তার মা বেচারী কাঁদতে বসেছে।"

---

* মহারাষ্ট্রের বিবাহিত মেয়েরা গলায় কালো মালা পরে। সেইটেই তাদের বিবাহের চিহ্ন।

সে রাত কাটল। তারপরের দিনও গেল। মাস গেল। দিনের পর দিন দিন যায়, আর হীরা অস্থির হ'য়ে ওঠে। সে বসে বসে বিশ্বাসের উদ্দেশে গালমন্দ করে। "তুই লড়াইয়ে গেলি বলেই তো আমার সর্বস্ব নষ্ট হ'ল, আমার ইজ্জত গেল, সতীত্ব গেল, পুড়ে ছারখার হয়ে যাক তোর এ-লড়াই।"

অবশেষে একদিন তার দুর্ভাগ্য চরমে উঠল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত, গাঁয়ের সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোথাও একটা কুকুর পর্যন্ত জেগে নেই। তখন মাঝরাত্রি। লক্ষ্মীমনার ঘরে একটা টিম্‌টিমে আলো জ্বলছে। ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে জমাট-বাঁধা অস্বস্তি। মানুষের মনুষ্যত্ব যেন হারিয়ে গেছে।

রোজকার মতো আজও হীরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল। তার দীর্ঘ কেশের রাশি যেন গোছাভরা ফসলের মতো পিঠের উপরে পড়ে আছে। তার দুই দেওর বসে আছে সামনে। লক্ষ্মীমনা হীরার চুলের মুঠি শক্ত হাতে ধরে চ্যাঁচাতে থাকে, "বল বল, এটা কার? বল খান্‌কি মাগী! স্বামী যুদ্ধে গেছে, আর তাকে ভুলে তুই এ কী সর্বনাশ করলি! আমার ইজ্জত নষ্ট করলি! বল্ কার এটা।"

পালোয়ান ওর মাথায় একটা লাথি মারল। তারপর হীরার মাথাটা দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে খেঁকিয়ে উঠল, "বল্ বল্‌ছি কার ছেলে পেটে ধরেছিস্?"

"অত সহজে ও বলবে না", শাশুড়ী বলে, "ওকে খুব করে মার, খুন ক'রে ফেল্ মারতে মারতে।"

তিনজনে মিলে হীরার উপরে যথেচ্ছ লাথি, ঘুঁষি বর্ষণ করতে থাকে। হীরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বসে থাকে। মারের চোটে তার গাল দুটো ফুলে গেল, চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তার কোমল দেহটা কঠিন প্রহারে পীড়িত হ'তে লাগল।

একটু পরেই সে বেহুঁস হ'য়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত লেগে গেল তার। তখন তার পেটে তিনমাসের শিশুর অঙ্কুর।

"কিরে মরলি নাকি?" বুড়ী জিজ্ঞেস করে। হীরার মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপরে। তার সমস্ত শরীর তখন ঘামে ভিজে।

বুড়ী এবার এগিয়ে এসে হীরার মুখে আঙুল দিয়ে দেখে। তারপর বলে, "একটা খুন্তি নিয়ে আয়।" মুকা খুন্তি নিয়ে আসে। বুড়ী খুন্তি দিয়ে হীরার দাঁতি ছাড়ায়। একটু পরে হীরার চৈতন্য ফিরে আসে, সে জল চায়।

হীরার দেওর গর্জন ক'রে ওঠে, "না, খবরদার জল দিও না ওকে।" বুড়ী খাশুড়ী বলল, "ও! ঢং করছে। খুন করে ফেল ওকে।" আবার শুরু হ'ল প্রহার।

ওদিকে বিশ্বাস পড়েছে যুদ্ধের পেষণচক্রে. আর ঘরে হীরারও সেই অবস্থা। দেওরের হাতে তার প্রাণ যাবার উপক্রম হ'ল। সারারাত চলল একটানা মার।

ভোর হ'ল, আকাশ ভরে গেল আলোয়! কিন্তু হীরার মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ বের হলো না।

চোখ তুলে চাইল হীরা। একবার তাকাল নিজের বাঁ হাতটার দিকে, তারপর ক্ষতবিক্ষত হাতটাকে ধরে লাগাল প্রাণপণে কামড়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। হীরা তখন বেহুঁস।

বুড়ী খাশুড়ী এসে ওর দাঁতি ছাড়াল। খানিক পরে হীরার চেতনা ফিরে এল। জ্ঞান হ'য়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে তিনজনকে দেখল। এত অত্যাচার তখন তার আর সহ্য করবার ক্ষমতা নেই।

আস্তে সে বলল, "আমায় আর মেরো না। আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।"

বুড়ী গর্জে উঠল, "কোন চুলোয় যাবি হারামজাদী?"

"আমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব।" রক্তাক্ত হাত তুলে হীরা দূরত্বটা বোঝাতে চেষ্টা করে।

বুড়ো শ্বশুর বলল, "ওকে যেতে দে।" পালোয়ানও বলল, "হাঁ, যাক্ চলে।"

বুড়ী হুকুম করল, "বেরো তবে এক্ষুনি।"

অবসন্ন, রক্তাক্ত দেহটা টেনে হীরা উঠে দাঁড়াল। পা দুটো কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ করে। সবেমাত্র এক পা এগিয়েছে, এমন সময় খাশুড়ী চীৎকার করে উঠল. "দাঁড়া।"

হীরা দাঁড়াল। বুড়ী একটা কাপড় এনে ওর গায়ে ফেলে দিল। হীরা সেটাকে তুলে নিল, চুলগুলোকে জড়িয়ে নিল কোনোরকমে; তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়।

আর এই বাড়িতে সে ফিরবে না। যেদিকে পা চলে, সেদিকেই সে এগিয়ে চলল। দুঃখ তাকে ঘরছাড়া করল। একবার শুধু জোরে বলে উঠল, "আমি চললাম।"

হীরা চলে যাবার পর ওরা সবাই স্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। আস্তে আস্তে ওদের সকলের চোখ জলে ভরে উঠল। যে-হীরাকে তারা প্রায় শিশু-কাল থেকে মানুষ করেছে, যে কখনও কাউকে একটা কড়া কথা বলেও দুঃখ দেয়নি, যে বিশ্বাসের প্রিয়তমা, সেই হীরা আজ চিরকালের মতো ঘর ছেড়ে চলে গেল। হীরাকে তারা আর দেখতে পেল না।

নির্বাসিতা হীরা আশ্রয়হীন হ'য়ে ঘুরে বেড়াল। সে তার মার কাছে গেল, মা তার কথা শুনে খুব কাঁদল, বাপও কাঁদল। কিন্তু তাকে আশ্রয় দিল না, কারণ তাদের ভয় হ'ল সমাজ তাদের একঘরে করবে। তখন হীরা গেল মাসীর কাছে, কিন্তু সেখানেও সে আশ্রয় পেল না। সব জায়গায় সে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এল। একমাত্র আকাশের তলায় খোলা মাঠ ছাড়া পৃথিবীতে হীরার আর কিছু রইল না। যা পায় তাই খেয়ে, যেখানে আশ্রয় পায় সেখানে রাত কাটিয়ে হীরার দিন চলে। কেবল ৮।১০ দিন অন্তর সে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গিয়ে বিশ্বাস এসেছে কিনা দূর থেকে খবর নিয়ে আসে। সে একমাত্র বিশ্বাসের বন্ধু কুলকার্নীর কাছেই সব খবর নেয়। আর কারো সাথে সে দেখা করে না। যার জন্তে হীরার জীবন বিষময় হ'য়ে উঠল, সেই অঙ্কুর পেটে নিয়ে হীরা দিন গুনতে থাকে। এমনি ক'রে কেটে গেল সাতটা মাস।

তারপর একরাত্রে কুলকার্নীর দরজায় শোনা গেল করাঘাত। গভীর রাত তখন। সারা পৃথিবী নিঝ্ঝুম, নিস্তব্ধ। কুলকার্নী লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল। চমকে উঠে বলল, "কে, হীরা?"

"হ্যাঁ।"

"কবে তোমার ছেলে হ'ল?"

"একমাস।"

"কোথায়?"

"তুজারপুরের মহারওয়াড়িতে। সেখানে আমার গাঁয়ের এক মেয়ে আছে, তার ঘরে।"

"তা বেশ, কিন্তু......"

"ছেলে, কিন্তু......"

হীরা ঊর্ধ্বে তাকাল। চোখে জল টলমল করছে।

কুলকার্নী খুব গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, সে এসেছে।"

"তবে..."

হীরা আর কিছু বলতে পারে না।

ফুলকানী ঘর থেকে একটা লাঠি আর চাদর নিয়ে এসে চলতে শুরু করল। হীরা তাকে অনুসরণ করল। ফুলকানী ক্ষেতের মাঝে তার ঘরে হীরাকে নিয়ে এল। সেখানে তার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে, সূর্য উঠবার আগে ফিরে আসবে, এই কথা বলে বেরিয়ে গেল। হীরা তার বাচ্চাকে বুকে করে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় বসে রইল।

এ-রাত কি কখনও শেষ হবে, হীরা বসে বসে ভাবে। তার বিশ্বাস যুদ্ধ থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তাকে সে দেখতে পাবে, নিজের সমস্ত কথা তাকে বলবে। সবাই তার উপর গভীর অন্যায় করেছে। এখন বিশ্বাস কী রায় দেয় সেই আশায় ও বসে আছে। হীরা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, বিশ্বাসও যদি তার প্রতি অন্যায় করে, তাহ'লে তার বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে বিশ্বাস অন্তত এইটুকু স্বীকার করুক যে হীরা নির্দোষ, এবং যা-কিছু ঘটেছে, তার জন্যে এই সর্বনাশা যুদ্ধই দায়ী।

ভোর হ'ল, সূর্য উঠল। বাচ্চাটা জেগে উঠে হাত-পা নাড়তে থাকে। হীরা বসে রইল তার দিকে চেয়ে।

বাইরে ধানে-ভরা জমি সূর্যের কিরণে স্নান করে ওঠে। ক্ষেতের কাজের আওয়াজ, গোরুবাছুরের হাম্বারব, পাখিদের কাকলি, নানা রকমের আওয়াজ তার কানে আসে। হীরা তার বাচ্চার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন তার সমস্ত চোখ দিয়ে তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ সে কোনদিন পায়নি। ওর জন্মের আগে থেকে এ-পর্যন্ত হীরার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল ক্রমাগত। আজ মনে হয় সে-মাটিটা একটু স্থির হয়েছে।

এমন সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, হীরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল বিশ্বাস। সে একটা মুহূর্ত শুধু হীরার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনিভাবে সে ছুটে গেল হীরার কাছে। দুটি হৃদয় এক হল। চার চক্ষে অশ্রু বইল। কোনো কথা না বলে বিশ্বাস দেখতে লাগল হীরাকে। তার গাল, ঠোঁট, তার চুল, সব সে ভাল করে চেয়ে দেখল।

এমনি করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। বিশ্বাসের মুগ্ধ দৃষ্টিতে হীরার মন অনেকদিন পরে আনন্দে ভ'রে উঠল। তার চোখ দিয়ে এবার বইল আনন্দাশ্রু।

হাসিকান্নার মিলন হল একই মুখে। এতদিন পরে সে মানুষের কাছে মানুষের উপযুক্ত ব্যবহার পেল।

একটু পরে হীরা কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না ; ঠোঁট দুটো শুধু কেঁপে উঠল থর থর করে।

বিশ্বাস তখন তার পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে পড়তে আরম্ভ করল—

আরাকান মিলিটারি হাসপাতাল,
তারিখ……
সন—১৯৪৪

মিত্রবর বিশ্বাস লক্ষণ সিন্দে
সমীপেষু,

তুমি হয়তো বাড়ি পৌঁছে গেছ, আমি এখানে হাসপাতালে পড়ে আছি। আমার যা হয় হবে, তাতে আমি পরোয়া করি না। কেবল একটা জিনিস আমায় আজ অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি যখন ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন আমি একটা ঘোরতর অপরাধ করেছি। আমি তোমার স্ত্রীর প্রতি পশুর মতো ব্যবহার করেছি। আমি তার ইজ্জত নষ্ট করেছি। আমি আমার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আর তোমার স্ত্রী আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমাদের আর দেখা হবার কোনও আশা নেই। সে ইচ্ছেও আমার নেই।

ইতি তোমার
বিনু পাওয়ার।

বিশ্বাস চিঠিটা মুড়ে আবার পকেটে রেখে দিল। সে ডাকল "হীরা!" হীরা অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকাল। তারপর দরজার দিকে চেয়ে দেখে কুলকার্নী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বিশ্বাস এবার একটা তার বের করে পড়তে লাগল—

তারিখ……
আরাকান হাসপাতাল

"বিনায়ক যাত্রীরাও পাওয়ার মারা গেছে।"

কুলকার্নী বলে উঠল, "বিশ্বাস, বল ওকে তুমি কী করবে?"

বিশ্বাস বুকটাকে সোজা করে বলল, "দাদা, তুমি গাড়ি ক'রে নিয়ে এগোও আমি জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।"

কুলকার্নী জিজ্ঞেস করল, "তুমি ওকে নিয়ে কোথায় যাবে?"

"যেখানে হয় যাব।"

হীরা ছেলের দিকে তাকাল। বিশ্বাস বলল, "ওকে শুদ্ধ নিয়ে যাব। ওকে বড় করব, বাঁচাব, লেখাপড়া শেখাব। তুমি তোয়ের হ'য়ে নাও।"

ওরা বেরিয়ে পড়ল। নিজের ঘর, মা, বাপ, ভাই, এমন কি লড়াই পর্যন্ত সব ছেড়ে হীরা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে বিশ্বাস বোম্বাইয়ে এসে উঠল। বিশ্বাস তার হীরাকে পেয়েছে। আর সারা জন্মেও হীরা যা পায়নি, আজ সে পেল, সে সুখের সংসার বাঁধল। বিশ্বাসের কাছে যুদ্ধে জমানো কিছু টাকা ছিল, বেশ আনন্দেই তারা দিন কাটাতে লাগল। কাজকর্মের জন্যে বিশ্বাস চেষ্টা করতে থাকল।

কিন্তু যুদ্ধ তাকে ছাড়তে চায় না। দু'মাস হ'ল বিশ্বাসের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে, আর তারা তাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একদিন সকালে বিশ্বাস ছেলেটাকে নিয়ে বসে আছে, হীরা চা তৈরি করছে, এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল। বিশ্বাস দরজা খুলে দিল, দুজন মিলিটারি পুলিস অফিসার ঘরে ঢুকে এল। "তোমার নাম কি?" একজন জিজ্ঞেস করল।

"বিশ্বাস রাও লক্ষণ, শিন্দে, নায়েক।

"আমরা তোমায় গ্রেপ্তার করলাম, চল।"

বিশ্বাস ঘাবড়ে গেল। একবার চট করে হীরার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাচ্চাটার দিকে একবার তাকাল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "দশ মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হ'য়ে নিচ্ছি।"

পাশের বাড়ির বুড়ীকে ডেকে পাঠিয়ে বিশ্বাস বলল, "মাগো, আমার হীরাকে সামলে রেখো। বাচ্চাটাকে যত্ন কোরো। আমি আজ লড়াইয়ে যাচ্ছি, প্রতিমাসে টাকা পাঠাব, কিন্তু আমার হীরাকে একটু দেখো।"

হীরার মুখ শুকিয়ে গেল। বহুদিন পরে সে আবার কাঁদতে বসল। বিশ্বাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "যুদ্ধ থামলেই আমি ফিরে আসব। তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থেকো। বাচ্চাটাকে অবহেলা কোরো না।"

মিলিটারি অফিসার দুজনের সঙ্গে বিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

আবার হীরার কান্নার দিন শুরু হ'ল। আবার শুরু হ'ল তার দিন গোনার পালা,—কবে লড়াই শেষ হবে! আবার যায় দিনের পর দিন। আবার মনি-অর্ডার আসে, চিঠি আসে। ফেরে না শুধু বিশ্বাস।

'৪৫ সাল শুরু হ'ল। একদিন একটা পার্সেল, একটা চিঠি ও কিছু টাকাকড়ি এসে পৌঁছল। পার্সেলটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হীরা একটা রূঢ় আঘাত পেল। পার্সেলে ছিল বিশ্বাসের জামা, কাপড়, যে-কোট পরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সেই কোট, সেই সার্ট, সেই ধুতি। চিঠিতে লেখা ছিল, "বিশ্বাস মারা গেছে।"

হীরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সে আর্তনাদ করে ওঠে। আশেপাশের ঘরের বৌরা এসে জমা হয়। কাঁদতে শুরু করে বাচ্চাটা।

সবাই হীরাকে সান্ত্বনা দেয়। হীরা কাঁদে বিশ্বাসের কোটের মধ্যে মুখ গুঁজে। তার চিন্তাশক্তি তখন লোপ পেয়ে গেছে। যে-জিনিস সে আঁকড়ে ধরে এতদিন দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। তার জীবনের সমস্ত সংগ্রাম যেন ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

পাশের বাড়ির সেই বুড়ী এগিয়ে এল হীরার কাছে। সে হীরাকে সান্ত্বনা দেয়: "হীরাবাঈ, তুমি কেঁদো না, স্থির হও।"

"কিন্তু কেমন ক'রে আমি স্থির হব", হীরা বলে, "এই যুদ্ধ আমার সর্বনাশ করল। এ-লড়াই শুধু আমাকে দেখাল চোখের জল, রক্ত আর বলাৎকার।"

বুড়ী দু'হাত বাড়িয়ে হীরাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।
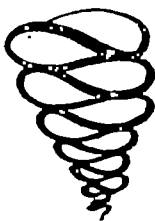
মূল মারাঠি থেকে অনুবাদ : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির গান

কথা ও সুর—সলিল চৌধুরী। স্বরলিপি—প্রবীর মজুমদার।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আয় রিম্‌ঝিম্ বরষার গগনে রে—
কাঠফাটা রোদের আগুনে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয় রে
হায় বিধি বড়ই দারুণ—
পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না।
হায় বিধি বড়ই দারুণ—
ক্ষুধার আগুন জ্বলে আহার মেলে না।
হায় বিধি বড়ই দারুণ।
কি দেব তোমারে নাই রে ধান খামারে মোর কপালগুণে॥
এই জীবন মাটির মতন
ফুলে ফলে ভরিতে চায় সোনার কামনা।
এই জীবন মাটির মতন—
স্নেহ বিনা শুকায়ে যায় সাধের সাধনা।
এই জীবন মাটির মতন।
আয়রে মেঘ মায়া দে
শ্যামল করিয়া দে
তোর মন্ত্রগুণে॥

II সা -া -সা । -া রা -া I সরসা -া -া । প্‌া -া -া I
আ য় বৃ ষ্ টি ০ ঝেঁ ০ ০ পে ০ ০

সা -া -া । সা রা -া I সরসা -া -া । প্‌া -া -া I
ধা ০ ন্ দে ব ০ মে ০ ০ পে ০ ০

প্‌া মা মা । -া পমা গা I গা মগা রা । রা গরা মা I
আ য় রি ম্ ঝি০ ম্ ব র০ ০ ষা র০ ০

সা -া -া । রগা মগা রা I রা -া -া । গমা পা -া I
গ ০ ০ গ০ ০০ ০ নে ০ ০ মে০ ০ ০

গা পা মপা । মা গা রা I রা -া গা । গমা গরা সা I
কা ঠ্ ফা০ ০ টা ০ রো ০ ০ দে০ ০০ র

ন্‌া -া -া । সা -া রসা I রা -া -া । -া রা প্‌া I
আ ০ ০ গু ০ ০০ নে ০ ০ ০ আ র

প্‌া -া ন্‌া । -া ন্‌া -া I সা -া -া । রগা রসা -া I
বৃ ষ্ টি ০ নেঁ ০ পে ০ ০ আ০ ০০ ০

সা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II মা -া -া । পা মা -া I পা -া ধা । পা ধপা ধা I
হা ০ য় বি ধি ০ ব ০ ড় ই দা০ ০

পা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I
রু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

মা মা -া । পা মা -া I পা ধা -া । পা ধা পা I
পো ড়া ০ মা টি ০ কেঁ দে ০ ম রে ০

পধা -া পা । -া মা -া I মগা রগা -া । মা -া -া I
ফ০ ০ স ল্ ক ০ লে০ ০০ ০ না ০ ০

মা -া -া । পা মা -া I পা -া ধা । পা ধপা ধা I
হা ০ য় বি ধি ০ ব ০ ড় ই দা০ ০

পা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I
রু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

মা -া পা । -া মা -া I পা -া ধা । পা ধপা পা I
ফু ০ ধা র আ ০ গু ০ ০ ন লে০ ০

ধ
পা ধা পা । -া মা -া I মগা রগা -া । মা -া -া I
আ ০ হা র্ মে ০ লে০ ০০ ০ না ০ ০

মা -া -া । গা মা -া I পা ধা ধর্সা । পা ধপা ধা I
হা ০ য় বি ধি ০ ব ০ ড়০ ই য়া০ ০

পা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I
য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

I { সা -া রা । মা মা -া I মা মা -া । মপা মপমা গা I
কি ০ দে ০ ব ০ তো মা ০ রে ০০০ ০

রগা -া গা । -া মা গা I রগা গমা গা । রা সা -া I
না ই ০ ০ ধা ন ধা০ মা০ ০ রে মো র্

সা -া রা । মা গমা গা I (রা -া -া । -া -া -া ।
ক ০ পা ল্ শু০ ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

-া -া -া) I রা -া -া । গমা পা -া } II কাঠফাটা রোদের আগুনে ইত্যাদি

II মা -া -া । গা মা -া I পা ধা ধপা । পা ধপা ধা I
এ ০ ই জী ব ন্ মা ০ ঠি০ য় ম০ ০

পা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I
ভ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

র্স
মা মা -া । গা মা -া I পা ধা -া । পা ধা পা I
ফু লে ০ ফ লে ০ ভ রি ০ তে চা য়

ধ
পা ধা পা । -া মা -া I মগা রগা -া । মা -া -া I
সো ০ না র কা ০ য০ ০০ ০ না ০ ০

মা -া -া । গা মা -া I পা ধা ধর্সা । পা ধপা ধা I
এ ০ ই জী ব ন মা ০ ঠি০ য় ম০ ০

পধ
পা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I
ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

র্স
মা মা -া । পা মা -া I পা ধা -া । পা পধা পা I
যে হ ০ বি না ০ শু কা ০ য়ে যা০ য়

পা ধা পা । -া মা -া I মগা রগা -া । মা -া -া I
সা ০ ধে র সা ০ ধ০ ০০ ০ না ০ ০

র্স
মা -া -া । গা মা -া I পা ধা ধা । পা ধণা ধা I
এ ০ ই জী ব ন্ মা ০ টি র ম০ ০

পা -া -া । -া -া -া -া -া -া । -া -া -া II
ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II { সা -া রা । মা মা -া I মা মা মা । মপা মপমা গা I
আ য় রে ০ মে ঘ্ মা য়া ০ দে০ ০০০ ০

র
গা -া গা । -া মা গা I রগা গমা গা । রা সা -া I
শ্যা ০ ম ল্ ক ০ রি০ য়া০ ০ দে তো র

সা -া রা । -া রমা গা I (রা -া -া । -া -া -া ।
ম ন্ ত্র ০ শু০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

-া -া -া । -া -া -া) I রা -া -া । গমা পা -া } II
কাঠ্‌ফাটা রোদের আগুনে ইত্যাদি II II

সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সোভিয়েট শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ কেহ কঠিন সমালোচনা করিয়াছেন; কেহ আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। রূপকলার বিচার ও সমালোচনায় নানা আদর্শ ও মতবাদ আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের আদর্শে ও মাপকাঠিতে যে কোন শিল্পের বিভিন্ন মূল্য ও দোষগুণ সমালোচিত হয়। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতির কোন বিষয়বস্তুর হুবহু সঠিক প্রকাশই কলাসৃষ্টি। এই আদর্শে সোভিয়েট শিল্প নিছক প্রকৃতিবাদী, বাস্তববাদী, মাটি-মাড়ানো, গন্ধময়, কল্পনাহীন, রসহীন, অনুকারিণী কলাসৃষ্টি মাত্র। ইহার মধ্যে নিছক কথাবাদী, প্রচারবাদী, বিবরণবাদী, খবরবাহী সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক লেখমাত্র (Record) ছাড়া আর কিছু নাই। এইরূপ রূপসৃষ্টির মধ্যে কোন কল্পনা, আদর্শবাদ বা রসের প্রকাশের কোন স্থান নাই। অনেকের মতে ইহা বৃহৎ আকারে রঙীন ফোটোগ্রাফমাত্র।

এক হিসাবে এই প্রকৃতির শিল্পকলা উচ্চাঙ্গের কল্পনাবাদী শিল্প না হইলেও "বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়", বহুজনসেব্য, আপামর সাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের বোধগম্য শিল্পরূপ হিসাবে—মহাযানী পন্থায় রচিত ব্যাপক সামাজিক সেবার যন্ত্র হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় রচনা। মহামতি টলস্টয় এই শ্রেণীর শিল্পকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে শিল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র উচ্চশিক্ষিত মানুষের বোধগম্য—সেইরূপ "হীনযানী" শিল্প (Art for the few) যাহা সকলের বোধগম্য নয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে। শিল্প হওয়া উচিত সর্বসাধারণের সম্পত্তি (Art for the People), তাহার আবেদন ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এই মতের বিপক্ষে অনেক মনীষীর মত রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন আর্টের আদর্শ সর্বদাই খুব উঁচু সুরে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে—আর্টকে হীনবুদ্ধি, নিম্নবুদ্ধি, অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবিহীন মানুষের সমতলভূমিতে নামাইয়া আনা চলিবে না। পক্ষান্তরে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকে উচ্চাঙ্গ শিল্পের অধিকারে উন্নত করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাহারা 'খড়' চিবাইয়া

আনন্দ পায়—উচ্চাঙ্গের মানসিক চিন্তায় অক্ষম তাহারা মনুষ্যত্বের নিম্ন-কোঠায় বাস করে। অনেক রূপরসিক ও দার্শনিকদের মতে আর্ট হইল রূপের কাল্পনিক, রসাত্মক ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। রূপের নতুন নতুন প্রকাশ ও সৃষ্টি, কল্পনা, রসবুদ্ধিই হইল উচ্চাঙ্গ শিল্পের লক্ষণ। সোভিয়েট শিল্পে নতুন রসসৃষ্টির, কল্পনার, রসের বা কোন গুহ্যবাদের কোন স্থান নাই। প্রজাতান্ত্রিক শিল্প হইলেও—সোভিয়েট শিল্প নিছক গণতান্ত্রিক লোকশিল্প বা folk art নহে। যাঁহারা চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন তাঁহারা সরল প্রকৃতির নিরক্ষর শিক্ষাশূন্য আদিম মনের মানুষ নহেন। এই চিত্রগুলি গণের দ্বারা অঙ্কিত গণচিত্র নহে।

সোভিয়েট শিল্পের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা খুব বড় কথা এবং সকল দেশেই অনুকরণীয়। কারণ শিল্পীকে ও শিল্পসৃষ্টির প্ররোচনাকে জীবিত করিয়া না রাখিলে মানুষের সমাজ মানবসমাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রদর্শনীর অনেক চিত্রই রাষ্ট্রের আদেশে ও চেষ্টায় রচিত। শিল্পীদের সেরা সৃষ্টিগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া নিয়া সাজাইয়া রাখেন 'ত্রেতিয়াকফ' গ্যালারিতে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বড় সাধারণ চিত্রশালায়। এ ছাড়া বহু সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক চিত্রশালাগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন কিনিয়া রাখেন। ইহা ব্যতীত শিল্পরচনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র হইতে নানাপ্রকার পুরস্কার, পারিতোষিক এবং সম্মান দানের ব্যবস্থা আছে। শিল্পরচনার পশ্চাতে রাষ্ট্রের এই মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রশংসনীয় জিনিস।

সোভিয়েট শিল্পের আর একটি বড় গুণ যৌন আবেগ, যৌনবুদ্ধি বা কামুকতা এই সব চিত্রে সযত্নে বর্জিত হইয়াছে। কোন বিবসনা নরনারীর মূর্তি চিত্রিত হয় নাই। এই প্রকৃতির শিল্পে মানুষের মনকে নিম্নগামী করিবার কোন বিপদ নাই। এই গুণ সোভিয়েট রূপশিল্পে একটি খুব প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু এই সব গুণ সত্ত্বেও সোভিয়েট শিল্পকে খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া ধরা যায় না। সোভিয়েট শিল্প ভাটিয়ালী সঙ্গীত, বাউল গান, চাষার গান, মাঝিমাল্লাদের গান এবং সরল লোকসঙ্গীতের মত একটা গুণের অধিকারী। কিন্তু এই শ্রেণীর গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে স্থান পায় না। এই আদর্শের সঙ্গীতকলাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চচিন্তাযুক্ত সঙ্গীতের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। এমন কি বেশির ভাগ কলেজে-পড়া উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের গভীরতম অর্থের নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গান মুষ্টিমেয় অতি

উচ্চশিক্ষিত মনীষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সোভিয়েট শিল্পের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের রসরচনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে পড়ে। ইহা People's Art নহে।

সোভিয়েট শিল্পের রসবোধে বাধা এই যে এগুলি চিত্রধর্মী (pictorial) নহে পরন্তু নিছক বিবরণধর্মী (Pictographic)। সোভিয়েট ছবিতে নিছক ছবিত্বের অনেকাংশে অভাব। রঙ ও রেখার যাদু, লীলা ও মাধুর্য একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেখার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় প্রাচ্যদেশে রেখাপ্রধান নানা চিত্রসৃষ্টিতে। এই হিসাবে চীন, জাপান ও ভারতের চিত্র উচ্চাঙ্গের শিল্প। তাহার তুলনায় সোভিয়েট শিল্প নিম্নশ্রেণীর শিল্প। এই প্রাচ্যদেশে রেখাপ্রধান শিল্পপ্রকৃতির আদর্শে ও তুলনায় উনিশ শতকের শেষে রূপরসিকদের বিচারে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আদর্শের শিল্প—আলোছায়ার বাস্তবিক আদর্শে রচিত শিল্পকলা যথা "ইতালির নবযুগের চিত্রকলা" তাহার উচ্চ-আসন হারাইয়াছে।

সোভিয়েটতন্ত্রের জীবন ও কৃষ্টির নানাবিভাগে যে নানা বৈপ্লবিক রূপান্তর (Revolutionary change) দেখিতে পাওয়া যায় রূপসৃষ্টির বিভাগে এরূপ কোন বৈপ্লবিক রূপ সোভিয়েট আর্টে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে ইহা উনিশ শতকের মধ্য যুগে ইউরোপীয় চিত্রকলার নকলবাজী, আপাতরমণীয় মামুলি, অ্যাকাডেমিক- আদর্শের পুনরাবর্তন মাত্র। কোন নতুন টেকনিক, আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গি ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের চিত্রকলার সহিত যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট চিত্রকলা ভারতের মুঘল যুগের চিত্রপদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ। মুঘল চিত্রকলায় বাস্তবিক জীবনের অনেক হুবহু চিত্র দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক জীবনের নিখুঁত প্রতিলিপি বাদ দিলেও মুঘল চিত্রে আমরা পাই এক অদ্ভুত রেখা-চাতুর্য ও অভিনব বর্ণলীলার প্রকাশ। এই হিসাবে মুঘল চিত্র সোভিয়েট চিত্রের উপরে স্থান পাইতেছে।

* * *

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (জে. পি.)

ছেলেবেলা থেকে ছবির প্রদর্শনী দেখছি। কলকাতায় দেখেছি, বোম্বাইএ দেখেছি, সিমলায় দেখেছি কোথাও বাদ থাকে নি। কিন্তু এমন প্রদর্শনী আর দেখিনি। ইওরোপে লণ্ডন বা প্যারিসে বেশির ভাগ বাজে ছবি। কিন্তু এই প্রদর্শনীর ছবিগুলির যেন ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে। শুধু ছবি

বলে এগুলিকে মনে হয় না। এদের প্রায় সব ছবিই বাস্তব। রৌদ্দুরকে ওরা কত চমৎকার ভাবে ধরেছে। সকাল বেলাকার আলোয় স্তালিনের ছবিটা! পরিপূর্ণ বিচারের উপর করা। এরকম সব কটায় লক্ষ্য করা যায়। এই প্রদর্শনীর ফলে আমাদের একটা বড় শিক্ষা হল। অবশ্য আমার পক্ষে এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আর কদিন বা কাজ করব!

ওদের ছবিতে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আছে। মুখের ভাব বা রঙের ব্যবহারে ধোঁটাঘুঁটি কিছু নেই। আমরা এরকম তুলির স্বাধীন ব্যবহার জানিনে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে টেকনিকের মিল হতে হবে। বিষয়বস্তু অনুসারে আবার টেকনিক বদলায়। সাইবেরিয়ার ইর্তিস নদীর ছবিটার কথা বলা যেতে পারে। মোট কথা সবই চমৎকার। কেউ ফেলনার নয়। অত খরচ ক'রে ওরা ছবি পাঠিয়েছে। এত ভালো ছবি যে ওরা করে তা জানা ছিল না। এর আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ভেরেশ্চাগিনের একখানা মাত্র ছবি দেখেছি। ঐ একটাই আছে। খুব ভালো ছবি।

ইওরোপিয়ানরা আমাদের কাছে এসব জিনিস চাপা দিয়ে রাখত। তারা বোঝাত আর্ট কেবল ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে আছে। অ্যাকাডেমি বা Salon এর নানা Illustration বেরুত। কিন্তু রাশিয়ান আর্টের বইটই বড় বেরুত না। কাজেই এ জিনিস চেপে রাখা সহজ ছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ছবির মান ইওরোপের চেয়ে ভালো। আমার তাই মনে হয় এদের ছবির সঙ্গে একমাত্র জার্মান শিল্পী ফ্রান্‌জ স্টাকের (Franz Stuck) তুলনা চলে। এঁর ছবিরও চমৎকার কম্পোজিশন। বিলেতের শিল্প-সমালোচক এডউইন গল সাহেব ছিলেন আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনি বলতেন জার্মানদের কাছে কেউ নয়। বুঝিয়ে দিতেন ছবি কিভাবে দেখতে হয়। রাশিয়ানদের কথা তিনি অবশ্য বলেন নি। ভারি স্পষ্টবক্তা আর সমজদার ছিলেন তিনি।

এদের ছবিতে কম্পোজিশন, রঙ, রঙব্যবহারের রীতি, ভাব সবকিছু দেখবার আর শেখবার মতো। চয়কানভের 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' ছবিটায় রঙের কত মোটা মোটা টাচ অথচ কেমন 'হারমনি' রয়েছে সমস্ত ছবিতে। এখানে মোটা টাচ না থাকলে হত না। পায়রা খাওয়ানোর ছবি। এমন ভালো জিনিস তো ভালো লাগবেই। এতে কোন কিছু নেই। এখানে ছোট মেয়েটার দাঁড়াবার কি সুন্দর ভঙ্গি! কতটা ঔৎসুক্য তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। ঐ রকম গল সাহেব আমাকে দেখিয়েছিলেন স্টাকেরই আঁকা ছবি। ছুটো

ছেলে সন্ধ্যাবেলায় মাঠে বসেছে। মুখের কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না। তারা হাতের মধ্যে জোনাকি পোকা ধরেছে। মাঝে মাঝে জোনাকি পোকার আলো বেরুচ্ছে হাতের মধ্য থেকে। তাতেই ওদের চেনা যাচ্ছে। এই ছবিটায় আগেরটার মতো এমনি ঔৎসুক্য চোখে পড়ে।

শুনলাম ওদের আর্টিস্ট যারা এসেছে তারা বেশি মাহিনা পায়। টাকা পাবার ওরা যোগ্য বটে। এত বড় বড় ছবি কখন দেখিনি। ওদের দেশে নিশ্চয় বড় বড় গ্যালারিও আছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে ওরা উৎসাহ পায়। এখানে সে সব নেই। কত সহজ ব্যবহার ওদের। ঝাঁকজমক নেই। অতি মিশুক। এত বড় বড় ছবি আনা সোজা কথা নয়। আরো বেশি দিন থাকলে আরো ভিড় হত। আমিও আরো বেশি যেতাম।

ওদের কাছে আমাদের কেউ নয়। ভারতীয় জীবনে ঐ রকম ছবি! রাষ্ট্র থেকে শিল্পীকে টাকা দেয় না। তার সমস্যা. এত বড় ছবি করব, বিক্রি হবে কিনা। না হলে বাড়িতে রাখারও জায়গার অভাব।

এই প্রদর্শনী শেখবার জিনিস বৈকি। নিন্দা করা অন্যায়। প্রপাগাণ্ডা হোক আর নাই হোক তা আমাদের কিছু দেখবার নয়। এতে কি হতে পারে। ছবির বিচার ভালো ছবি হিসেবে। ওরা আমাদের দেখতে দিয়েছে ওদের দেশে কি হচ্ছে দেখাবে বলে। এ জিনিস্ এর আগে হয় নি। এবার আমাদের সত্যিই চোখ ফুটল। ওরা হালের লোক। কতই বা বয়েস হবে। বেশির ভাগই অল্পবয়স্ক। এর মধ্যে তারা এমন শেখার জিনিস এনেচে। শুধু নিন্দে করা আমি পছন্দ করি না।

ছবিতে 'ইমাজিনেশনের' প্রশ্ন এলে ওদের ছবিতে কল্পনা আছে বৈকি। রোদ্দুরকে জীবন্তভাবে ধরার কথা তো আগে বলেছি। অত বড় ছবিটা আঁকব এর জন্যে দেখার ক্ষমতা কতটা থাকা দরকার। বাইরের জগতে একবার যেটা দেখেছি তাকে 'ক্যানভাসে' রূপ দেওয়া কি সোজা কথা! এরপর ছবিতে আলোর সমবণ্টনের প্রশ্ন আছে। আলোকচিত্রে ঐ কম্পোজিশন মোটেই আসে না। কোন একটা ব্যক্তির মূর্তি হয়ত আলোকচিত্র দেখে আঁকা হতে পারে। যেমন বার্লিনের পতনের উপর বড় ছবিতে আমরা লক্ষ্য করি। এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ছবিটিতে যে অদ্ভুত গতির ভাব রয়েছে তা কি আলোকচিত্রে আসে? এখানে যে সমস্ত রঙ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে 'কম্পোজিশন' আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি 'ক্যানভাসে' দেওয়া সহজ ব্যাপার। কোন আলোকচিত্রেই তা সম্ভব নয়।

পাহাড়ের যে সমস্ত ছবি সেখানে বরফ জমে থাকার কয়েকটা দৃশ্য হয়ত আলোকচিত্র দেখে আঁকা হতে পারে কিন্তু বাকি সবই শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি।

এদের ছবিতে হাসিখুশির ভাবটাই আমার বড় ভালো লেগেছে। কান্না-কাটির কোন ছবি নেই বলে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। ওরা হয়ত হাসিখুশির ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

ওরা যা করেছে তাতে স্টাইলের পার্থক্য নিশ্চয় চোখে পড়ে। 'অবিস্মরণীয় মিলন'; কি 'বার্লিনের পতন', কি শান্তির উপর পায়রা খাওয়ানোর ছবিতে আলাদা আলাদা ভঙ্গি রয়েছে। কি প্রতিকৃতিতে কি দৃশ্যচিত্রে এরকম উদারভাবে কাজ করার রীতি আগে দেখিনি। ইওরোপীয় ও আমেরিকান ছবি দেখে মনে হত আমরা কতকটা এগিয়েছি। যা দেখলাম তাতে মনে হয় ঢের পেছিয়ে আছি।

* * *

অতুল বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের পূর্ণ সংস্পর্শে আসার পর আমাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নানাভাবে লাভবান হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখি এর উন্নতি ও বিকাশে পাশ্চাত্যের প্রথিতযশা লেখক ও সাহিত্যিক শেক্সপীয়ার, মোপাসাঁ, হুগো, বালজাক, ইবসেন, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখ ব্যক্তিদের দান রয়েছে। দর্শনে আমাদের প্রাচীন গৌরব যতই থাকুক না কেন আধুনিক চিন্তাধারা যে পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত সেকথা স্বীকার করতেই হয়। প্রাচীন যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বহু মূল আবিষ্কার সত্বেও আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান নানাভাবে পাশ্চাত্যের কাছে ঋণী। সাহিত্যে দেখি পাশ্চাত্যের প্রভাবে বাঙলা গল্পের এক বাস্তব-বাদী ধারা গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর শুরু কালীপ্রসন্ন ঠাকুরের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-র এবং তার বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", রবীন্দ্রনাথের শেষের রচনাগুলিতে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায়। মোট কথা, সংস্কৃতির উপরোক্ত বিভাগগুলিতে পাশ্চাত্যের নিদর্শন রইল এবং তা একদিক থেকে এই বিভাগগুলিকে সচেতন করেছে।

আমাদের চিত্রশিল্পের ভাগ্য কিন্তু অন্যরকম। শেক্সপীয়রকে বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষর এবং টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে উপভোগ করা কিংবা বোঝা

যায়। কিন্তু ছবির আবেদন চাক্ষুষ। আমাদের দেশের শিল্পীদের কাছে পাশ্চাত্ত্যের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রত্যক্ষ আবেদনের কোন সুযোগ ছিল না। এগুলির অতিসাধারণ উদাহরণের বোঝা আমাদের জুটে গিয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটা ভালো জিনিসও ছিল যার ফলে ইওরোপীয় বাস্তববাদী শিল্পধারার কিছুটা আভাস ইঙ্গিত আমরা পেলাম। বাস্তববাদের সুরকে আমরা একেবারে বিস্মৃত হতে পারলাম না। তবু বলতে হবে ইওরোপীয় শিল্পের আবেদন ও তাৎপর্য আমাদের জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশে এলেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমাদের শিল্প-জগতে তাঁর আবির্ভাব ওঝা হিসাবে। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতার গ্যালারি থেকে পাশ্চাত্ত্যের শিল্প-নিদর্শনগুলো নীলামে বিক্রয় করে হস্তান্তর করেন। তিনি আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আমাদেরই ঐতিহ্যপ্রধান শিল্প, যেমন মোগল, বাগ, অজন্তা এবং চীনা ও জাপানী শিল্পপদ্ধতির প্রতি ফেরাবার চেষ্টা করেন। ফলে আমাদের মধ্যে একটা অহমিকা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে হ্যাভেল সাহেবের এই প্রচেষ্টার ফল হল বিপরীত। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশদের মারফৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ ভারতীয় শিল্পধারাকে জর্জরিত করছিল, সেই বিষ ঝেড়ে ফেলে ভারতীয় শিল্পকে প্রাচ্যধারা অভিমুখী করাই একজন ব্রিটিশার হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ভারতীয় শিল্পকে তার নিজস্ব ঐতিহ্যের উপরে দাঁড় করানোর জন্য তিনি নানাভাবে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি আমাদের নমস্য। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাঁর রোগনির্ণয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটি না থাকলেও ঔষধ নির্বাচনে কিছু দোষ ছিল, নচেৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ তাড়াবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেই বিষের প্রতিক্রিয়াই আজ আধুনিক ভারতীয় শিল্পে অতিপ্রকট হয়ে উঠত না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, এই সমস্ত ইওরোপীয়ানরা নিজেরা জাত মানেন না অথচ আমাদেরই জাত শেখাতে আরম্ভ করলেন। আরও দেখা যায় ১৯০৯ সালে যখন তাঁরা আমাদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের অহমিকা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তখনই ইংলণ্ডে ৮০,০০০ গিনি দিয়ে জার্মান শিল্পীর একখানি ছবি কিনে নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। অনেকটা রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজরা আমাদের মধ্যে জাতের অভিমান জাগিয়ে

তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদের চিত্রকলায় Realist স্কুল একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এ অবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য প্রতিবাদ হয়েছিল, যেমন সুরেশ সমাজপতি মহাশয় এই নতুন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন এবং রণদা গুপ্ত এরই জন্য কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করে চিত্রে বাস্তববাদী ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সঙ্গেই ভারতীয় শিল্পের নামে অহিরাবণের দল শিল্পের রণক্ষেত্রে নামলেন। তাঁরা জন্মেই লড়াই আরম্ভ করলেন। পত্রিকা মারফৎ ভারতীয় শিল্পের নতুন নিদর্শনগুলো প্রচারিত হতে থাকল।

আমাদের চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক গতি এইভাবেই ব্যাহত হল। সুরেশ সমাজপতি বা রণদা গুপ্তের প্রতিবাদ আন্দোলন উৎসাহের অভাবে বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য রিয়ালিজমের আকর্ষণ একেবারে নষ্ট না হয়ে চাপা থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে নানাভাবে সম্মানিত হলেন। তাঁর ছবিতে রঙরেখার স্বপ্নরাজ্যের বৈশিষ্ট্যই প্রধান এবং তাঁর কারুকুশলতার উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল প্রচুর। তাঁর সব ছবিই অত্যন্ত বিশ্বাস আর যত্নের সঙ্গে করা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কোন সত্যিকার স্কুল গড়ে উঠল না। এর কারণ বোধ হয়, প্রথমত, রিয়ালিজমের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর শিষ্যদের তাঁর স্কুলকে বাঁচিয়ে না রেখে অতি-আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক। নন্দলাল অনেক ক্ষেত্রে ইওরোপীয় শিল্পের mixed effect-কে গ্রহণ করলেন। তাঁর সৃষ্টিতে স্পষ্টরেখা এবং ইম্প্রেশনিস্ট ছাপ একসঙ্গে বজায় রইল। যে কলাভবনের তিনি অধ্যক্ষ সেখানেই রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী ভিন্ন ভিন্ন জাতের শিল্প সৃষ্টি করতে লাগলেন। সারদা উকিল দিল্লীতে তাঁর স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ক্ষীণভাবে হলেও কিছুটা বজায় রেখেছিলেন—তা-ও লুপ্তপ্রায়। যামিনী রায় প্রথম যুগের রিয়ালিস্ট ধারায় অনুপ্রাণিত সবল ও সুস্থ শিল্পকে অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন। তাঁর নমাজপড়া, মাতাপুত্রের মন্দিরে প্রণাম প্রভৃতি ছবিতে রিয়ালিজমের অঙ্গ টাইপ বিচ্যুতভাবে বজায় রইল। আগেকার সেই রেখার জোরালো ছাপ রেখে তিনি আলোছায়ামণ্ডিত বাস্তব রঙকে অনেকটা সরিয়ে দিলেন। অধুনা যামিনী রায়ের সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের একেবারেই নিঃসম্পর্ক বললে হয়। তাঁর ছবির সুনাম ছড়িয়েছে দেশেবিদেশে। কিন্তু বাঙলাদেশের কোন শিল্পী তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে এ ধরনের কোন প্রমাণ আপাতত নেই, একমাত্র

তাঁর সুযোগ্য পুত্র অমিয় রায় ছাড়া। বর্তমানে সরকারী শিল্প-শিক্ষায়তনের রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পক্ষপুটে ও আনুকূল্যে রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষের প্রভাব অনেক তরুণ শিল্পীর উপর দেখা যাচ্ছে এবং এ প্রভাব আরও কিছুদিন চলবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু যামিনী গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁর মুষ্টিমের শিষ্য রিয়ালিজমের ক্ষীণ ধারা কিছুটা বজায় রেখেছেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কখনো কোন শিল্পধারা আনতে পারি নি, বজায়-ও রাখতে পারি নি। ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রধান শিল্পের নামে আমাদের যে বিদ্রোহ তা-ও হয়েছিল আত্মঘাতী। ঠিক এই অবস্থায় সম্পূর্ণ রিয়ালিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট শিল্পের প্রামাণিক, সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সোভিয়েট শিল্পীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই, এক বিশেষ শিল্পধারাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ইওরোপের রেনেসাঁর পরেকার শিল্পসম্ভার ও তার মালমশলাই এঁদের প্রধান অবলম্বন। এঁরা যে শিল্পধারা বেছে নিয়েছেন তাতে যথেষ্ট উন্নতমান শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এদিক থেকে তাঁরা একটা বড় দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ধরনের কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করায় অর্থাৎ বিশেষ কোন শিল্পধারা নির্বাচন না করার দরুন আমাদের দেশে Impressionism, Post-Impressionism পেরিয়ে Fauvism (যা-খুশি-তাই'এর আন্দোলন)-কে নিয়ে সমস্ত মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপের রিয়ালিজমের সুর কিংবা চিহ্ন আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্পেনে গুহাগাত্রে পাই; সেই মূলসুর ধরে বহু বছর পরে টিসিয়ান, রেঁমব্রান্ট, হলস্, হলবেইন্, মানে, দেগা, অগস্টাস্ জন্, সির্কাট এমন কি অরফ্যান, সারজেন্টেও ধ্বনিত দেখতে পাই। রাশিয়ার চিত্রে টিসিয়ান কি রেঁমব্র্যান্ট সৃষ্টি না হলেও যে আদর্শ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তাকে তাঁরা Springboard হিসাবে ব্যবহার করতে চান। ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেদের কারুকুশলতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙালী শিল্পীদের নতুন অভিযান রাশিয়ার এই শিল্প-আদর্শ বেছে নেওয়া থেকে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। সুস্থ মনোভাব আর বলিষ্ঠ আঙ্গিকের খাতিরেই এ জিনিস প্রয়োজন। High Art-এর নামে সাধারণ লোকের সহজ সরল শিল্পবোধকে অবজ্ঞা করার দিন চলে গেছে। সোভিয়েট শিল্পীরা একথা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছেন। বাঙালীর বিশেষত্ব এই তারা ছবি কিনে ছবির সমাদর করতে না পারলেও ভালো ভালো ছবি তারা

সাধারণ বুদ্ধিতে কখনো উপভোগ করতে কার্পণ্য করে নি। আশা করা যায়, এই বিশিষ্টতাই শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।

শিল্পসৃষ্টির আকর প্রকৃতি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অকার্পণ্যে রেখা-রঙ-আলোছায়ার অফুরন্ত "রূপভেদ"-এর সম্ভার বিতরণ করছে। শিল্পীর কাজ চাক্ষুষ পরিচয়ের মাধ্যমে এই সমস্তকে আহরণ করা। এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট শিল্প-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। রাশিয়ানরা একটা পথ বেছে নিয়েছেন। জাতীয় শিল্প বলে কিছু গর্ব করতে গেলে, জাতীয় পছন্দের ছাপ সুস্পষ্ট হওয়া চাই, তার জন্য একটা পথ বেছে চলায় বিশ্বাস, সাহস ও সামর্থ্য চাই, এ কাজ খুব সহজ নয়।

* * *

প্রভাতকুমার দত্ত

'পরিচয়ে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য আমি কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্পরসিকের সঙ্গে দেখা করি। এখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হ'ল। সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী এদেশে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পী সঙ্ঘ এবং নয়া দিল্লীর সর্বভারতীয় চারুকলা এবং কারু সমিতির মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ঠিক সেইভাবে ১৯৫৩ সালের শীতকালে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় চিত্রকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল ভারতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন শিল্পী। প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক এ, জামোস্কিন্। ইনি সোভিয়েট রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক ও মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপক। দ্বিতীয় ব্যক্তি মঁসিয়ে সেভেলভ। ইনি মস্কো মিউজিয়মের সহকারী ডিরেক্টর। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ভিরাকনভ। ইনি মস্কোতে ইতিহাসের অধ্যাপক। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভি, রেফানভ। ইনি ইতিমধ্যেই পাঁচবার স্তালিন পুরস্কার লাভ করেছেন। এঁর একটি স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। প্রতিকৃতি অঙ্কনেই এঁর বিশেষ হাত। ইনি মস্কোর আর্ট ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং সোভিয়েট শিল্পী সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য। শিল্পীদের আর একজন হচ্ছেন ভ্যাসিলি চুইকভ। ইনি সোভিয়েট কিরগিজস্থানের সম্মানিত শিল্পী। দুবার স্তালিন

পুরস্কার পেয়েছেন। দৃশ্যচিত্র শিল্পী হিসাবেই এঁর প্রতিভার বিকাশ। কিরগিজস্তানের উপর এঁর তিনটি দৃশ্যচিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি কিরগিজস্তানের বহুমুখী নতুন জীবনযাত্রার উপর অজস্র ছবি এঁকেছেন।

এপ্রিল মাসের তিন তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত যে কদিন প্রদর্শনী খোলা ছিল তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শক অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজারের মত দর্শক প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকেছেন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকেছেন। প্রদর্শনীতে মোটামুটি তিনটি বিভাগ ছিল, যথা: চিত্রকলা, রেখাচিত্র এবং ভাস্কর্য। চিত্রকলার মধ্যে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর এই দুই যুগেরই নিদর্শন ছিল। অবিশ্যি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই শেষোক্ত যুগের চিত্রকলাই ছিল সংখ্যায় বেশী। এর মধ্যে আবার মূল এবং প্রতিলিপির তারতম্য ছিল। অনেক মূল ছবি ইচ্ছা থাকলেও সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি তার প্রতিলিপি তাঁরা নিয়ে এসেছেন। প্রাক্-বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর যুগের ছবি একসঙ্গে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কলার শিল্পের ঐতিহ্য এবং এখনকার শিল্প সম্ভারকে সংযুক্ত ভাবে দেখানো। বিপ্লবোত্তর যুগের যে শিল্পীব ছবি আনা হয়েছিল তার মধ্যে আমরা পাই য়েকানভ, চুইকভ, গেরাসিমভ, বাকলেয়েফ, লাফটিওনভ, গেলসবার্গ, চেবাকভ, মোরোকিন, স্বরনিন, ভ্যামিলিয়েভ, ফিনোজেনভ প্রমুখ শিল্পীদের ছবি। এই সমস্ত ছবিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং মস্কোর ত্রেতিয়াক গ্যালারী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য রিপাবলিকেব আঞ্চলিক গ্যালারী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য রিপাবলিকের আঞ্চলিক গ্যালারী থেকে এগুলি নির্বাচিত করে এদেশে আনা হয়েছে। প্রাক্-বিপ্লব যুগেব ছবির মধ্যে আমরা পাই রেপিন, ভেরেশ্চাগিন, সেরভ, আইভোভস্কি, মিমাস্কিন্, রোমাদিন প্রমুখ শিল্পীদের মূল ছবি। এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভেরেশ্চাগিন যিনি ১৮৭৪-৭৬ ভারতে ছিলেন তাঁর ভারত-চিত্রাবলীর অন্তর্গত পাঁচটি মিনিয়েচার বা ছোট আকারের সূক্ষ্ম কাজযুক্ত ছবি। রিপ্রোডাকশন বা প্রতিলিপি হিসাবে রেপিন, সুরিকভ, সেরভ-এর ছবি অনেকগুলি আনা হয়েছিল। গ্র্যাফিক্ আর্ট বা রেখাচিত্র বিভাগে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ লক্ষ্য করেছি যেমন চারকোল এবং পেন্সিল ড্রয়িং ও প্যাস্টেলের কাজ। এই বিভাগে বেশীর ভাগই ছিল মূল ছবি। এগুলি একদিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল কারণ সোভিয়েট শিল্পীরা যেমন বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে দক্ষ তেমনি ছোট আকারে ছবি

থাকতেও তাঁরা সমান পারদর্শী। ভাস্কর্যের ছোট বড় বাইশটি মূর্তি ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্রোঞ্জে তৈরী, বাকি চুনাপাথর, মার্বেল পাথর এবং প্লাস্টারের কাজ। প্রদর্শনীতে পঁচাত্তরটির অধিক যে বড় বড় মূল ক্যানভাস ছিল তা সবই তেলরঙে সম্পূর্ণ। এগুলিই ছিল আলোচ্য চারুকলা প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয় যে সোভিয়েট চিত্রকলার প্রধান বিকাশ তেলরঙে। তাছাড়া Realistic পদ্ধতিতে তেলরঙই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম।

লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে ১৩ দিন ব্যাপী এই চারুকলা প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কলকাতায় চারুকলার প্রদর্শনী আজকাল মোটেই অপ্রতুল নয়। কিন্তু ছবি দেখে এত লোকের মধ্যে এ ধরনের সাড়া কলকাতায় আর কখনও দেখা যায়নি। একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে ছবি দেখায় যাঁরা অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ প্রত্যেকেই প্রদর্শিত ছবিগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছেন। তবু বিরূপ সমালোচনা যে একেবারে হয়নি তা মোটেই নয়। কেউ কেউ সোভিয়েট চারুকলা দেখে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কয়েকটি দিক থেকে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখানে সেই সন্দেহের বিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে। আর সোভিয়েট ছবি বেশীর ভাগ দর্শকের কেন ভাল লেগেছে সে বিষয়ে পূর্বের সাক্ষাৎকারগুলিতেই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সোভিয়েট শিল্পের বিপক্ষে যে সমস্ত মত প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এগুলিই প্রধান, যথা: সোভিয়েট শিল্প বিবরণ-ধর্মী এবং সে-জন্যেই ফটোগ্রাফিক, এর আঙ্গিক হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের Reprsentational art-এর অ্যাকাডেমিক শিল্প পদ্ধতি, এই শিল্পে কল্পনার কোন অবসর সৃষ্টি করা হয় নি ইত্যাদি। সোভিয়েট শিল্পকে যখন আমরা বিবরণধর্মী বলি তখন সোভিয়েটের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভুলে যাই। সোভিয়েট শিল্পীরা মোটেই অস্বীকার করেছেন না তাঁদের সৃষ্টিতে বিবরণ বলতে কিছু নেই। ছবিতে বিবরণ থাকলেই তা নিকৃষ্ট শিল্প হয় না। একমাত্র আঙ্গিক বা গঠনগত উৎকর্ষের অভাব ঘটলেই আমরা তাকে নিকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি। সোভিয়েটের মানুষ সকলের পরিশ্রমে যে সংযুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলছেন যেখানে শ্রমটাই একটা সম্মানের জিনিস। সুতরাং ক্যানভাসে এর শিল্পগত প্রতিফলন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সোভিয়েটের মানুষ শ্রমের মারফত যেমন বাস্তব সম্পদ বাড়ানোর সাহায্য করছে তেমনি অন্যদিকে তারা চিত্তের

ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করছে। সোভিয়েট শিল্প এই শ্রমকে বিষয়বস্তু করে নিয়ে চিত্তের ঐশ্বর্যকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করায় সাহায্য করছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে "A Letter From the front", "Decoration Degree" "Kolkhoz Farm in Kazakstan" প্রভৃতি ছবিতে আমরা শুধু বিবরণ পাই না। এর শিল্পগত এক বড় দিক রয়েছে যা সোভিয়েটের মানুষকে চিত্তের সম্পদেও শক্তিশালী করছে। সোভিয়েট শিল্পীরা যদি কেবল বিবরণকেই আমল দিতেন তবে আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁরা যে প্রচুর দৃশ্যচিত্র আর still life এনেছিলেন সেগুলিকে ব্যাখ্যা করি কি করে? আমাদের দেশে নানা উপাখ্যান আর পুরাণকে অবলম্বন করে যে সমস্ত দেবদেবীর আলেখ্য তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তা বিবরণের পর্যায়ে পড়ে না আর সোভিয়েটের জীবনে অত্যন্ত বাস্তব উপাখ্যানের উপর লেনিন, স্তালিন বা সোভিয়েটের সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ছবি আঁকা হয়েছে তা বিবরণধর্মী! একথা মানলে তো আমাদের বৌদ্ধযুগের শিল্পকলাও এক অর্থে বিবরণধর্মী। আমাদের দেশেও তো শিল্পকে ধর্ম প্রচারের জন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভারতীয় শিল্প বিবরণধর্মী হয়ে পড়ে নি। সোভিয়েট শিল্পে নতুন জীবন দর্শনের প্রয়োজনে বিবরণের দিক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা শিল্পের ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ সোভিয়েট শিল্পীর ছবিগুলিতে যে পরিবেশ যে রঙ, রোদ্দুর আর আলোছায়াকে ধরার যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তা আলোকচিত্রে ধরা কোনদিন সম্ভব নয়। এর জন্তে শিল্পীর প্রতিভা আর তুলির উপর নির্ভীক অধিকার অপরিহার্য।

এরপর সোভিয়েট শিল্প এ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবর্তন কিনা এ প্রশ্নে আসা যাক। তেলরঙে Representational art সৃষ্টির পদ্ধতি অনেকদিনকার প্রচলিত পুরনো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইওরোপের বহু শিল্পী অনেক উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সোভিয়েট শিল্পীরা এই পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন বলেই যে অ্যাকাডেমিক হয়ে পড়েছেন তা মোটেই নয়। আগেকার দিনে শিল্পীরা যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তেলরঙে কাজ করেছেন সোভিয়েট শিল্পীরা নিশ্চয়ই ঠিক সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছেন না। এদিক থেকে মাধ্যম এক হলেও তখনকার কাজে আর এখনকার কাজে পার্থক্য থাকবেই কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে তেলরঙে রিপ্রেজেনটেশনাল আর্ট সৃষ্টি ছিল কেবলমাত্র বাইরের জগতের আকারের (appearance) পুনরায় সৃষ্টি বা পুনরায় অঙ্কন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সোভিয়েট দেশে Representational আর্ট শুধু এটুকু নয় আরও কিছু। আসল প্রশ্ন হচ্ছে

সোভিয়েট শিল্পীরা তেলরঙকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন কিনা অথবা ইওরোপ এ পথে যতটা অগ্রসর হয়েছিল সেখানেই থেমে আছেন কিনা। এদিক থেকে বিচার করলে সোভিয়েট ছবিতে রঙের নির্বাচন, রঙ ব্যবহারের রীতি, ছবিতে সার্থকভাবে Three dimensional effect সৃষ্টি, ক্যানভাসে একসঙ্গে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা, রোদ্দুর বা আলোছায়াকে অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে ধরা প্রভৃতি দিক থেকে সোভিয়েট শিল্প কোন ক্রমেই অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয় বরং এই মাধ্যমের তথা শিল্পাদর্শের নতুন পরিণতি। এ কথা ঠিক এবং অনেকে তা স্বীকারও করেছেন যে এই নতুন পরিণতির ব্যাপারে তাঁরা রেমব্র্যান্ট বা টিসিয়ানের মত উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি না করলেও যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা অত্যন্ত সুস্থ ও সবল এবং ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। আর এই পথ বেছে নেওয়াতেই তাঁদের শিল্পধারা আজ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তেলরঙে আঁকা হলেও এই রকম উদার শিল্পসৃষ্টি এই মাধ্যমে আর কখনও হয় নি। এখানেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে সোভিয়েট শিল্প নিছক ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয়।

এরপর সোভিয়েট শিল্পে কল্পনার কোন স্থান আছে কিনা এ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কল্পনা বলতে আমরা কি বুঝি এর উপরে এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। সোভিয়েট শিল্প বাস্তববাদী এবং উদ্দেশ্যমূলক শিল্প তাই ব্যক্তিগত মনের বিচ্ছিন্ন কল্পনা বা বিশুদ্ধ রসসম্ভোগের কোন স্থান এখানে নেই। সোভিয়েট শিল্পে কল্পনা আছে। তা মানুষের মনকে নিছক মোহগ্রস্ত না করে দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকে পরিচালিত করে। সকাল বেলাকার আলোর স্তালিনের ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথস্' নাটক পড়ে শোনানোর দৃশ্য প্রভৃতিতে মানুষের চিত্তের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ তা মনকে কম কল্পনাশ্রয়ী করে না। রেখাশ্রয়ী না হলে যে ছবিতে কল্পনা থাকবে না এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। আর তেলরঙে রেখার প্রশ্ন ওঠে না। ছবিতে কল্পনা শুধু রেখা থেকে আসে না—আসে তার রঙ, সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব প্রভৃতি থেকে। আর সোভিয়েট শিল্পীদের রেখাশিল্পেও যে হাত আছে তার পরিচয় পাই গ্র্যাফিক আর্ট অর্থাৎ প্যাস্টেল, কাঠকয়লা, পেনসিল ড্রয়িং প্রভৃতি কাজে। আসলে ছবিতে কল্পনাসৃষ্টি নিয়ে আমাদের মনের অনেকটা রক্ষণশীল ধারণা দিয়ে সোভিয়েটের নতুন সমাজব্যবস্থার আওতায় সৃষ্ট ছবির বিচার করলে শুধু অবিচারই করা হবে। আগেই বলেছি সোভিয়েট

দেশে শুধু বস্তুর সম্ভার বাড়ছে না, সমভাবে মানুষের চিত্তের সম্ভারও বাড়ছে। সুতরাং সোভিয়েট ছবিতে কল্পনা থাকবে না এ জিনিস আশঙ্কা করা নিতান্তই অমূলক। এ ছাড়া সোভিয়েট শিল্পীরা টেকনিক ও বড় ক্যানভাসে কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য প্রদর্শনীতে চেরাকফের 'স্তালিনের জন্ম উপহার', ব্রডস্কির 'মে ডে শোভাযাত্রা' প্রভৃতি ছবি তারই নিদর্শন।

ভ্রম-শুদ্ধি

গতমাসের পরিচয়ে (চৈত্র, ১৩৫৮) 'বাঙলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও 'বাঙলা সাহিত্য' প্রবন্ধ দুটিতে দুটি ভুল ছিল।

(১) সাতাশি পৃষ্ঠার সাতাশ লাইনের পর এই অংশটুকু যুক্ত হবে,—"ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলবার ও জমিদারদের ক্ষমতাধ্বংসের দাবির সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান ছিল বিভক্ত বাংলায় পুনর্মিলনের। এই দাবি মেহনতী হিন্দু ও মেহনতী মুসলমানদের দ্বারা সমর্থিত।"

(২) একানব্বই পৃষ্ঠার পঁচিশ লাইনের পর কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘের নায়ক হিসাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির নামোল্লেখ ছিল।

[প্রথম উদ্ধৃতি সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির এ-ধরনের কোন স্লোগান ছিল না। অসম্পূর্ণ বা ভুল খবরের জন্য এ-ধরনের দুচারটি ভুল নিবন্ধটিতে স্থান পেয়েছে বলে আমাদের ধারণা।—সম্পাদক।]

* * *

"পরিচয়" গত (চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায় "আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা" শীর্ষক প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদনের বিষয়ে বলতে গিয়ে একটি ভুল হয়েছে। যেখানে দুবার "ব্রজাঙ্গনা" বলা হয়েছে, সেখানে দুবারই "বীরাঙ্গনা" হবে। এ-ভুল মুদ্রাকরের নয়, লেখকেরই অনবধানতা। পাঠকেরা ক্ষমা করবেন।

গোপাল হালদার।

এসো শান্তির জন্যে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল কলকাতা ছেয়ে গেছে দু'ধরনের পোস্টারে। রাস্তাঘাটে মোড়ে মোড়ে বাড়ির দেয়াল, গাড়িবারান্দার থাম, ল্যাম্পপোস্ট আর সবেখোলা ডিসপেন্সারি কি কাপড়ের দোকানের অর্ধেক ভাঁজ-করা দরজার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে এক ধরনের পোস্টার। মোটা মোটা লাল হরপে ছাপা, বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি। ওয়েলেসলি আর ইলিয়ট রোডের মোড়ে জনসঙ্ঘ-অফিসের সামনে, হাওড়ায় অ্যালেনবেরি কারখানার নাকের ডগায়, হ্যারিসন রোডে সুরজমল নাগরমলের বাড়ির থামে। "নিখিল ভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন ও উৎসবের" প্রস্তুতি কমিটি ঘোষণা করছে, ১লা এপ্রিল থেকে ৬ই এপ্রিল পার্ক-সার্কাস ময়দানে অধিবেশনের কথা। আর ওদের পাশাপাশি, অনেক জায়গায় একটার ওপরই আরেকটা পড়েছে দোসরা রকম পোস্টার। প্রথম ধরনের চেয়ে আরও জাঁকিয়ে, আরও চ্যাটালো এদের লাল অক্ষরগুলো কোন এক "সোশ্যালিস্ট ইয়ুথ লীগ"-এর তরফ থেকে কলকাতার "নাগরিকদের" সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছে "কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র" সম্পর্কে, জানিয়ে দিচ্ছে, "নিখিল ভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন কমিউনিস্টদের ধাপ্পা" মাত্র। আর সারাক্ষণ, সকাল ন'টা না বাজতেই রোদ্দুরে ও ভিড়ে গলদ্‌ঘর্ম, নানা ধান্দায় চরকির মতো ঘুরন্ত ট্রামে-বাসে আর পায়েহাঁটা মানুষগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল এমনি দু'ধরনের পোস্টার। সেদিন ১লা এপ্রিল।

১লা থেকে ৬ই এপ্রিল একেবারে তাজ্জব ব'নে গিয়ে কলকাতার মানুষ পরপর শুনল এই দুই দুনিয়ার দু'টো কণ্ঠস্বর। বিশিষ্ট দৈনিক কাগজের মারফত তারা শুনল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেটের হুঁশিয়ারি—শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন "ছদ্মবেশপরানো কমিউনিস্ট" সংগঠন মাত্র। আর শুনল তারা সেই সম্মেলনের অধিবেশন থেকে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ডাঃ সইফ্‌উদ্দিন কিচলুর ক্রোধোদ্দীপ্ত প্রত্যুত্তর : শান্তি-আন্দোলন কমিউনিস্টদের প্রচারমঞ্চ—এ প্রচার "জঘন্য মিথ্যারটনা"। তারা শুনল দলনিরপেক্ষ সাংবাদিক খাজা আহ্‌মদ আব্বাসের আবেগময় ঘোষণা,…"শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলনে সমাগত আমরা নাকি 'কমিউনিস্টদের ধাপ্পায়' বিভ্রান্ত, ১লা এপ্রিলের এই সম্মেলনে এসে আমরা নাকি 'এপ্রিল ফুল' ব'নে গেছি!

কিন্তু শান্তির জন্যে যদি 'বোকা' ব'নে থাকি তাহলে তো আমরা সাধু-সঙ্গেই আছি। শান্তির সন্ধানে সর্বত্যাগী গৌতম বুদ্ধের মতো, বিরাট সাম্রাজ্য জয় করার পর সেই সাম্রাজ্য বিলিয়ে দেওয়া অহিংসাব্রতী অশোকের মতো, শান্তির

নিকেতন শান্তি-নিকেতনের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতো আর সাম্প্রদায়িক মিলন ও শান্তির জন্যে শহিদ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো ইতিহাসের মহৎ 'মূর্খ'-দের দলে তাহলে আমরা। 'সোশ্যালিস্ট ইয়ুথ লীগ' আর আমেরিকার আওয়ার সেক্রেটারির মতো 'বিজ্ঞ'-দের থেকে শতহস্ত দূরে থেকে, আসুন, আমরা দেশের শান্তির ঐতিহ্যকে, এই মহৎ 'বোকামি'-র ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাই।…"

১লা থেকে ৬ই এপ্রিল কলকাতার মানুষ দেখলপাশাপাশি দুই দুনিয়া, দুই ভারতবর্ষ, দুই কলকাতার নমুনা। দেখল, সুরের যাদুকর রোবসন আর কথাশিল্পী হাওয়ার্ড ফাস্টকে এদেশে আসতে দিল না মার্কিন গভর্নমেন্ট। চোখের ওপর তারা দেখল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের হাত থেকে "সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষা যজ্ঞের" পাণ্ডা-পুরোহিত অডেন-স্পেণ্ডার আর তাদের দলবলকে একদিন দেশে ঢুকিয়ে সাগ্রহে কোল দিয়েছিল যে ভারত গভর্নমেণ্ট, সেই গভর্নমেণ্টই এবার ঢুকতে দিল না তুরস্কের জাতীয় কবি নাজিম হিকমতকে, সোভিয়েটের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার কন্‌স্তান্তিন সিমোনফ আর কবি মির্জা তুর্স'ন-জাদ্‌কে, ঢুকতে দিল না জনগণতন্ত্রী চীনের গোটা প্রতিনিধিদলকে। সম্মেলনের ঠিক আগে লালদীঘির সরকারি দপ্তর থেকে নেতৃস্থানীয় বাঙালি লেখক ও শিল্পীদের কাউকে কাউকে সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—এমন কথাও শোনা গেল। আর নিজের চোখে তারা দেখল সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রাত্রে মণ্ডপের পেছন দিকে আগুন-লাগানো হ'ল। কিন্তু কিছুতেই বেকুব বনতে রাজি হল না কলকাতার সাধারণ মানুষ। সাগর-পারের মার্কিনী মহাজনদের উদার পন্থা অনুসরণ ক'রে "ভারত-মার্কিন

পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি"-র, "বিশ্ব শান্তি" আর "সংস্কৃতির স্বাধীনতা"-রক্ষায় তাঁদের অংশীদার ভারত গভর্নমেন্ট দেখাল রক্তচক্ষু; "পিকিং এক্সপ্রেস" আর "নিনোচ্‌কা"-র কুৎসারটনায়, "রীডার্স ডাইজেস্ট" আর "কোলিআরস্"-এর যুদ্ধ-প্ররোচনায়, "পুলিস গেজেট" আর "পিক্স্"-এর পশুপ্রবৃত্তি উদ্বোধনের অবাধ বাজার কলকাতায় লালদীঘির সরকারি দপ্তর উদ্ধত হস্তক্ষেপ করল। আর অনেকগুলো অদৃশ্য হাতের সুতো টানাটানিতে, রাতের কলকাতার অদৃশ্য জীবদের নিঃশব্দ আনাগোনায় দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল মণ্ডপে। দলে দলে হাজারে হাজারে তবু মানুষ এল পার্ক সার্কাস ময়দানে—দিনের

পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্মেলন-মণ্ডপে ধৈর্য ধ'রে ব'সে তারা দেখল, শুনল, খুশিতে উজ্জ্বল আর আবেগে উদ্বেল হ'য়ে উঠল আরেক দুনিয়ার, আরেক ভারতবর্ষের, আরেক কলকাতার এক অভিনব ক্রিয়াকলাপে। দিগন্তে জড় হচ্ছে

যুদ্ধের মেঘ, এরি মধ্যে শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জন, তাই গুজরাট আর মণিপুর, কাশ্মীর আর কেরলা নিয়ে যে বিশাল ভারত, দুলে উঠেছে সেই ভারতবর্ষের বুক, সুপ্ত যৌবন জেগে উঠেছে তার নাড়িতে। অবাক বিস্ময়ে কলকাতার মানুষ দেখল কত দূর দূরান্ত থেকে, প্রতিবেশী পূর্ব-পাকিস্তান থেকে একটিমাত্র গান মুখে নিয়ে, ধূলিধূসর যোজন যোজন পথ একটিমাত্র আশার মশালে চিনে নিয়ে একসঙ্গে মিলেছেন এসে প্রায় দু'শোজন প্রতিনিধি নানা পথ নানা মতের দু'শো কবি, সাহিত্যিক, চিত্র, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রশিল্পী, গীতশিল্পী, বাদ্য আর নৃত্যশিল্পী আর শিক্ষাবিৎ। ভারতবর্ষের জাগরূক
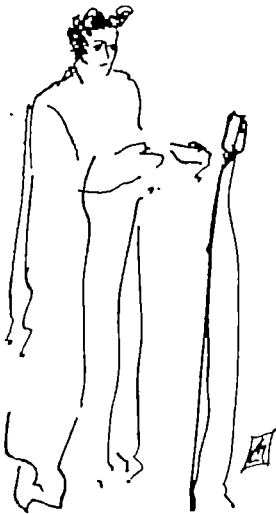
যৌবনের প্রতীক কলকাতায় ভারত-ইতিহাসের এই বৃহত্তম, ব্যাপকতম শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন। তারা দেখল, রাজনীতি-সমাজনীতি - জাতি - ধর্ম - দল - মতের হাজারো দেয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে একই মঞ্চে সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে বরণ ক'রে নেওয়া হ'ল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবিৎদের— মহাকবি ভাল্লাথোল আর লোককবি রঘুনাথ চৌধুরীকে, মঞ্চ ও চলচ্চিত্র-শিল্পী পৃথ্বিরাজ কাপুর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে, ঔপন্যাসিক মুল্কুরাজ আনন্দ, কৃষণ চন্দর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রতিনিধিদের মধ্যে লোকশিল্পী, কৃষক আর উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীকে পাশাপাশি এসে বসতে দেখল; তারা একই মঞ্চ থেকে ডাঃ কিচলু আর তেলেঙ্গানার কবি মকদুম মহিউদ্দিনের বক্তৃতা, অমর শেখ আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গান শুনল, 'কথাকলি' নৃত্যনাট্য আর 'ছেঁড়া তার' নাটক অভিনীত হ'তে দেখল। আর রোমাঞ্চিত কলকাতা দেখল, কলকাতা শুনল, একটিমাত্র তুলির আঁচড়ে 'পিকিং এক্সপ্রেস' আর 'নিনোচকা'-র স্বপ্নার পট মুছে দিয়ে, একটিমাত্র গানের সুরে 'রীডার্স ডাইজেস্ট' আর 'কোলিআর্স্‌'-এর যুদ্ধচক্রান্তের কুয়াশা ছিঁড়ে, একটিমাত্র নাচের মুদ্রায় 'পুলিস গেজেট' আর 'পিক্‌স্‌'-এর যৌনবিকৃতিকে ধিক্কার দিয়ে লোকশিল্পের ভারতবর্ষ, চিরকালের অথচ চিরনতুন, জীবন্ত, বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত ভারতবর্ষ তাদের আহ্বান জানাচ্ছে মানুষের স্বপক্ষে, শান্তির স্বপক্ষে।

আবার এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিপদ ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির সংকট ডেকে আনছে। দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করছে। আর তাই এমনিতেই দুর্বিষহ সংস্কৃতিকর্মীর জীবনযাত্রার হাল ক্রমশ কাহিল হ'য়ে চলেছে। আমাদের বই, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্রে যুদ্ধের স্বপক্ষে সুকৌশল প্রচার শুরু হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি মারফত সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বেসাতি আর যৌনবিজ্ঞাপন অবাধে চলেছে। ভারতবর্ষে এই প্রথম তাই বিশিষ্ট পেশার ভিত্তিতে শিল্পী-সংস্কৃতিবিৎরা একত্র হয়েছেন শান্তি-সম্মেলনে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে চিরকালের শান্তির ঐতিহ্য নতুন ক'রে আর একবার তাঁরা অঙ্গীকার করবেন। সকলে মিলে ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করবেন যাতে ক'রে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও জাতির মধ্যে এবং ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীর মধ্যে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়তর করা যায়, সাংস্কৃতিক লেনদেনের পথ প্রশস্ত করা যায়।

আর ১লা থেকে ৫ই এপ্রিল প্রতিদিন বিকেল থেকে যেন মেলা ব'সে গেছে পার্ক সার্কাস ময়দানে। মানুষের মেলা। ট্রাম-স্টপেজ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে পার্কের ও-মুড়োয়, মণ্ডপের দিকে। ফুটপাথ ধ'রে হনহন ক'রে হেঁটে চলেছে ছোকরা স্বামীর পিছু পিছু ঘোমটা-টানা আধা-শহুরে বউ, ছেলের হাত ধ'রে ছাপোষা কেরানি বাপ, অফিসফের্তা খুদে অফিসার গোছের মানুষ আর বিকেলের প্রসাধন-সারা ফিটফাট বাবু। মণ্ডপের গেটে গেটে ঠেলাঠেলি করছে পার্শী টুপির পাশাপাশি পাঞ্জাবী পাগড়ি আর টেরিকাটা খালি মাথা। মণ্ডপে পৌঁছে কিছু লোক তখুনি ঢুকছে না ভেতরে এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, ছোট ছোট দল পাকিয়ে জটলা করছে, আড্ডা দিচ্ছে। অনেকদিন বাদে আচমকা দেখা পাওয়ার হল্লা উঠছে বন্ধুদের মধ্যে। আর এই আসর আরও সরস আরও মুখর ক'রে তুলেছে সভাসমিতির নিত্যসঙ্গী চিনাবাদাম-চানাচুরওয়ালা, লাল-নীল-হলদে-সবুজ বোতল সাজানো শরবতের স্টল, আইসক্রীম, কাগজের গ্লাসে চা বিলিয়ে বেড়ানো চলন্ত 'লিপটন'।

কালো ত্রিপল আর চট দিয়ে আগাগোড়া মোড়া টিনের দেয়ালে ঘেরা প্রকাণ্ড মণ্ডপটার খিড়কির গেটের দু'পাশে সারি সারি রেস্তোরাঁ আর চায়ের স্টল। দু'সার বেঞ্চিতে মুখোমুখি হাতে হাতে চা-খাবার নিয়ে বসতে হয়, বাস্তহারার এমনি একফালি সরাইখানা আর একেবারে আধুনিক কাউন্টারে ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজানো চকচকে ঝকঝকে প্রকাণ্ড স্টল। এখানে

বিকেল থেকে রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত সারাক্ষণই গিজগিজ করছে লোক। গায়ে গায়ে মিশে আছে মহারাষ্ট্রের গায়ক আর সাঁওতাল নৃত্যশিল্পী, উত্তরবঙ্গের দোতারাবাদক আর পাঞ্জাবের অভিনেতা; পাশাপাশি চেয়ার টেনে বসেছে উত্তর ভারতের চুস্ত-পায়জামা আর দক্ষিণের দোপাট্টা কাপড়, গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে আন্তর্জাতিক ট্রাউজার আর বাংলার ধুতি-পাঞ্জাবী, দল বেঁধে ঘুরছে শালোয়ার, স্কার্ট আর নানা ধাঁচের শাড়ি। কৌতূহলী মানুষের ভিড়ের মাঝখানে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কোথাও আলোচনা করছেন সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে, লোকের চোখ এড়িয়েকোথাও বা নিভৃত আলাপে তন্ময় বাংলা আর তেলেঙ্গানার দুই কবি।

মণ্ডপের বাইরে থেকে তবু বোঝা যাবে না ভেতরের তাজ্জব কাণ্ডকারখানা. তিনরঙা শামিয়ানায় সাজানো, অসংখ্য আলোয় ঝলমলে প্রকাণ্ড মণ্ডপ থৈ থৈ করছে মানুষে—মাঝখানের শতরঞ্চির ওপর, ডাইনে-বাঁয়ে সার সার চেয়ারে আর সহজে চোখ যায় না এত দূরে পেছন দিকে গ্যালারিবোঝাই। দশ-বারো হাজার মানুষের কালো কালো মাথা মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেছে। তবু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, হাজার হাজার মানুষের এই এলোমেলো ভিড় তলায় তলায় আশ্চর্য শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি প্রবেশপথের সজাগ প্রহরী স্বেচ্ছাসেবকরা বিরামহীন পরিশ্রম করছেন, নজর রাখছেন সর্বত্র। আর সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত পর্দার আড়ালে টাইপরাইটার আর কাগজ-পত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে উদ্যোক্তারা নিয়ন্ত্রণ করছেন মঞ্চকে, সমগ্র সম্মেলন আর উৎসবকে।

গাঢ় নীল কানাতের ওপর শাদা একঝাঁক উড়ন্ত পায়রা পটভূমিতে, দু'পাশের দেয়ালে বিশ্বশান্তির উদ্‌গাতা নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা, জোলিয়ো ক্যুরি, পল রোবসন, গালিব আর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ ছবি—আলোয় আলো সম্মেলন-মঞ্চ থেকে ভাষণ দিচ্ছেন সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ও শান্তি-আন্দোলনের সেরা প্রতিনিধিরা; সারা ভারতের কবি-শিল্পীরা নানা ভাষায় নানা ছাঁদে তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির সেরা সম্পদ উৎসর্গ করছেন আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ঢাকা সম্মেলন মণ্ডপকে। আর সেই রহস্যময় অনির্দিষ্ট জনসমুদ্র থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জন উঠছে—হয়তো বা কোন কোণ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এক টুকরো মন্তব্যকে ঘিরে হালকা হাসির বুদ্বুদ, ক্ষণে ক্ষণে আবেগের উদ্বেল তরঙ্গের চূড়োয় পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মতো ফেটে

পড়ছে উদ্দাম হাততালি, ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড ধিক্কারে ক্রোধ আর ঘৃণার বেলা-ভূমিতে আছড়ে পড়ছে সেই তরঙ্গ।

১লা এপ্রিল সম্মেলনের উদ্বোধনের দিন প্রতিপালিত হ'ল রবীন্দ্র-দিবস হিসেবে। অন্যায়, অত্যাচার শোষণ আর আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রচণ্ড প্রতিবাদ-স্বরূপ, শান্তি সমৃদ্ধি আর মানবমৈত্রীর মহৎ উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথের নাম মুখে নিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন প্রস্তুতি-কমিটির

ডাঃ কিচলু

সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সমাগত প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন, "চিরকাল বাংলার হৃদয় খোলা, সেই খোলা হৃদয় নিয়ে আমরা আপনাদের আপনজন ব'লে গ্রহণ করছি।" সমবেত সমস্ত মানুষকে ডেকে বললেন, "সারা ভারতের সংস্কৃতি-বিদদের আমরা এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি বাংলার সংস্কৃতি, ভারতের সংস্কৃতি, নিখিল মহাজাতির সংস্কৃতিকে বাঁচানোর দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। শান্তিময় পরিবেশে সুখী ও সমৃদ্ধ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শিল্প ও সংস্কৃতি ব্যর্থ হবে।" মণ্ডপের ভিড় থেকে মঞ্চে আসবার জন্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আহ্বান জানালেন ডাঃ কিচলুকে, সভাপতিমণ্ডলীর যে-সব সদস্য তখনও মঞ্চে অনুপস্থিত নাম ধ'রে ডাক দিলেন তাঁদের। আর সেই একাকার ভিড় থেকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনার মধ্যে পথ করে নিয়ে একে একে উঠে এলেন ন্যায়ের পক্ষে আজীবন অনমনীয় যোদ্ধা শুভ্রকেশ ডাঃ কিচলু, মুক্তবুদ্ধি প্রসন্নমুখ কৃষণ চন্দর,

লজ্জিত মুখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন গ্রীক ভাস্কর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি শালপ্রাংশু পৃথ্বিরাজ। নিখিল ভারত শান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানালেন ডাঃ কিচলু। চীন ও সোভিয়েটের সংস্কৃতি-প্রতিনিধি-দলকে ভারত গভর্নমেন্টের প্রবেশপত্র মঞ্জুর না করার সংবাদ দিয়ে শাণিত গলায় তিনি বললেন, "এই সব বন্ধুরা অ্যাটম বোমা পকেটে ক'রে আনছিলেন, এ শুধু উন্মাদেই ভাবতে পারে।···এই ধরনের কাজকর্ম দেখলে এ সন্দেহ স্বাভাবিক যে পণ্ডিত জবাহরলালের পররাষ্ট্র-নীতি শেষ পর্যন্ত হয়তো নিরপেক্ষ নয়!" গোঁড়া গান্ধীবাদী কুমারাপ্পা আর সুন্দরলালের এবং বিশেষ ক'রে পানিক্কর আর রাধাকৃষ্ণণের মতামতের সাক্ষ্য উপস্থিত ক'রে তিনি ঘোষণা করলেন যে, চীন ও সোভিয়েটের নীতি শান্তির নীতি। কোরিয়ায় আধুনিকতম জীবাণু-যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে বললেন, "অ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদের ফলে এই অস্ত্র এখনও ব্যবহার করা হয়নি। ···সমস্ত মানবজাতিকে আজ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে চিৎকার ক'রে প্রতিবাদ জানাতে হবে।" দীর্ঘ এক বক্তৃতায় কৃষণ চন্দর বললেন, "পৃথিবীর বুকে ঘাসের সৌন্দর্যের মতো মানুষের বহুদিনকার সভ্যতার পরিণত ফল সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য। কিন্তু আজ নরহত্যার ব্যাপক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। মানুষই যদি মরে তবে সংস্কৃতিও তার সঙ্গে ধ্বংস হবে।" শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্ত সৎ কর্মীকে ডাক দিলেন তিনি, "এসো, একত্র হও জীবনের জন্যে, শান্তির জন্যে।"

আবেগে উদ্বেল সমগ্র সম্মেলন সেদিন শুনল আরেক আমেরিকার, মানবহিতৈষী শান্তিকামী আর নির্যাতিত শৃঙ্খলিত আমেরিকার কণ্ঠস্বর—সম্মেলনের উদ্দেশে হাওয়ার্ড ফাস্ট আর পল রোবসনের মর্মস্পর্শী শুভেচ্ছাবাণী আর গান। পল রোবসনের কণ্ঠে অনির্বচনীয় শান্তির গান। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সমস্ত সম্মেলন শুনল হাওয়ার্ড ফাস্টের বক্তব্য, "আমরা, যারা সামান্য কিছুটাও চিনি ভারতবর্ষকে, গত কিছুকাল থেকে তারা সমাজতন্ত্রী জগতের বাইরে শান্তি ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে সম্ভাব্য শক্তিশালী শিবির ব'লে গণ্য ক'রে আসছি সে-দেশকে। ···অতুল ঐশ্বর্যের খনি তোমাদের আশ্চর্য দেশ আজকের ইতিহাসের নিয়ন্তা-শক্তি হতে চলেছে।··· আমি কী ক'রে ব্যক্ত করি আমার মনোভাব, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকার ব্যাকুলতাকে কেমন ক'রে প্রকাশ করি আমি!"

আর উপস্থিত মানুষ তিক্ততার সঙ্গে আরেকবার স্মরণ করল আমেরিকার

আওয়ার সেক্রেটারি অব্ স্টেটের কথা। আর সারাক্ষণ সমস্ত মণ্ডপে গমগম করতে থাকল হাওয়ার্ড ফাস্টের গলা,..."অতুল ঐশ্বর্যের খনি তোমাদের আশ্চর্য দেশ আজকের ইতিহাসের নিয়ন্তা-শক্তি হ'তে চলেছে।..."

২রা এপ্রিল থেকে শুধু কাজ আর কাজ। সকাল নয়টা থেকে বারোটা, দু'টো থেকে পাঁচটা একটানা প্রতিনিধি-সম্মেলন। লম্বা-চওড়া, ওজনে ভারি বক্তৃতা বিশেষ নয়, পরস্পরকে চেনা, পরস্পরের মতের আদান-প্রদান, তর্কবিতর্ক, আলোচনা। মাঝে মাঝে সাধারণ অধিবেশন—একটু-আধটু বক্তৃতা, প্রস্তাব পাশ আর জরুরী সাংগঠনিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে মিলিত আলোচনা। আর বেশির ভাগ সময়ই ছোট বড় দলে ভাগ হ'বে মণ্ডপের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা, দু'একজন ক'রে নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিকে ঘিরে গোল হ'য়ে ব'সে সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ প্রবন্ধ পড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুলচেরা তর্কবিতর্কে মেতে ওঠা আর তারপর একটা সুচিন্তিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া।

২রা সকালে প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন আলি সর্দার জাফরি আর মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ। আবেগকম্পিত কবির ভাষায় সর্দার জাফরি বললেন, "শান্তি রক্ষা করার অর্থ—শিশুর অনাবিল হাসি আর একজোড়া সুন্দর চোখের অনুপম চাউনি, যন্ত্রের ওপর নৃত্যপর আঙুল আর কাগজের বুকে দ্রুততাল কলম, ফসলিয়া মাঠের শ্যামলিমা আর পতাকার প্রসন্নগম্ভীর শোভা, গোধূলি-আলোর শান্ত ভোর আর গলিত লোহার উগ্র উত্তাপ, রুটির সোঁদাগন্ধ আর ফুলের সৌরভ, গাঁয়ের মানুষের মুখে সাদাসিধে ভাষা আর গালিব ও রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ সুকুমার কবিতা—এ-সব কিছুর স্বপক্ষে, যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে আমাদের কবিতা, শিল্প, সংস্কৃতি, জীবন, সে-সবকিছুর স্বপক্ষে দাঁড়ানো।" আর অন্যতম উদ্বোক্তা মুল্‌ক্‌রাজ সম্মেলনের মূলনীতি, আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার পদ্ধতি কাজের লোকের গদ্যময় ভাষায় নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, আবার একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসায় আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে তার ঘাতপ্রতিঘাত দেখা দিয়েছে, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র কিভাবে এবং কতখানি সংকটাপন্ন হ'য়ে পড়েছে তাই আলোচনা ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখার জন্যে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কমপক্ষে দু'টি আলাদা কমিশনে ভাগ ভাগ হ'য়ে বসতে হবে।

দুপুর দুটোয় মণ্ডপের এ-দিক-সেদিক ছড়িয়ে থাকা প্রতিনিধিদের মাইক্রোফোনে ডাকলেন মুল্‌ক্‌রাজ। বললেন, এবার কমিশনগুলোর কাজ

শুরু হবে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ব'লে চললেন, "শান্তিরক্ষায় আমাদের অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি" নামের কমিশনে যাঁরা বসতে চান তাঁরা চলে যান ঐখানে—মণ্ডপের পুব-দক্ষিণ কোণে..."যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারকর্ম" এই কমিশনে যাঁরা বসবেন তাঁরা চলে আসুন এইদিকে—উত্তর দিকের প্রথম কয়েকসার চেয়ারে..."সাংস্কৃতিক বিনিময়" কমিশনে যোগ দিতে ইচ্ছুক যাঁরা, দক্ষিণ দিকের ঐ চেয়ারগুলোয় তাঁরা গিয়ে বসুন···।" আর তারপর একটানা চলল কমিশনের কাজ। সেদিন, তারপরের দিন। দলে দলে ভাগ হ'য়ে চেয়ারে কিংবা মাটিতে শতরঞ্জির ওপর গোল হ'য়ে বসেছেন কমিশনের সদস্যরা—প্রত্যেক কমিশনের সঙ্গে একজন স্টেনো, একজন কিংবা দু'জন সংবাদ রিপোর্টার। অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রবল উৎসাহে গোপাল হালদার যোগ দিয়েছেন "শান্তিরক্ষায় আমাদের সংস্কৃতি" নামের কমিশনে। আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনায় ঋগ্বেদ আর ঈশোপনিষদ থেকে সংস্কৃত উদ্ধৃতির তুফান তুলেছেন ভারতশাস্ত্রের সুপণ্ডিত ডাঃ ভগবতীচরণ উপাধ্যায়। "এদিকে সংস্কৃতি-কর্মীদের জীবনযাত্রার হাল" নামের কমিশনে দু'দিন ধ'রে হৈ-চৈ। হোমরাচোমরা অনেকেই এসে ভিড় জমিয়েছেন এখানে—পৃথ্বিরাজ, মুলকরাজ, জাফরি, মকদুম, আব্বাস, পবিত্রবাবু। জোর আলোচনা চলেছে সুধী প্রধানের তথ্যবহুল প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে।

২রা গেল, ৩রা গেল, ৪ঠা দুপুরের অধিবেশনে সমস্ত প্রতিনিধির সামনে বিভিন্ন কমিশনের সভাপতি গত দু'দিনে কমিশনের কাজের ফলাফল পেশ করলেন। পয়লা নম্বর কমিশন "বর্তমান পরিস্থিতির টানাপোড়েনে সংস্কৃতি-কর্মীদের জীবন-যাত্রার হাল" সিদ্ধান্ত করেছে—"সমস্ত প্রদেশের সংস্কৃতি-কর্মীদের জীবনধারণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে বইয়ের আকারে সে-সব দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করার, আর সংস্কৃতি-কর্মীদের জীবনের মান উন্নত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করার।" "যুদ্ধের স্বপক্ষে ক্রমশ বেড়ে-চলা প্রচারকর্ম" এই কমিশন স্থির করেছে—বই, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মারফত দেশে যুদ্ধের স্বপক্ষে যা-কিছু প্রচার চলছে তাকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবি জানানোর; ভারতবর্ষের সমস্ত সাংবাদিকের জন্যে একটি পালনীয় সর্বনিম্ন শান্তিনীতির খসড়া রচনা করার, এবং সম্মেলনের পক্ষ থেকে শান্তির স্বপক্ষে প্রচারমূলক ফিল্‌ম্ তোলার। "ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়

এবং তারই উপর ভিত্তি ক'রে দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ সুগম করা" নামের কমিশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে বই, ফিল্ম, ছবি ও সাংস্কৃতিক খবরাখবর আদান-প্রদান করতে হবে, অতীতের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিবিদ্‌দের স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপন করতে হবে, এবং বিশেষ ক'রে প্রতিবেশী পাকিস্তানে অবিলম্বে একটি শুভেচ্ছাসূচক প্রতিনিধিদল পাঠাতে হবে। যে-কমিশনে "শান্তিরক্ষার সমস্যা ও শিক্ষাব্যবস্থা" সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, সেখানে ঠিক হয়েছে—পেশার ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্রতীদের শান্তি-সম্মেলন ডাকার। আর এই সমস্ত প্রস্তাব আর সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্যে সম্মেলন থেকে একটি সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরি করা হ'ল। সমস্ত প্রদেশ থেকে নির্বাচিত দেশের একশোজন সেরা সংস্কৃতিনায়কের এই সংগঠন, "নিখিল ভারত শান্তি-সংস্কৃতি কমিটি"র সভাপতি নির্বাচিত হলেন মহাকবি ভাল্লাথোল আর নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর সাংবাদিক খাজা আহমদ আব্বাস হলেন তার সম্পাদক।

মহাকবি ভাল্লাথোল

আর "শান্তিরক্ষায় আমাদের অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি" এবং "আমাদের সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য কলুষিত মতবাদের অনুপ্রবেশ আর তার ফলাফল" কমিশনের আলোচকরা সমস্ত প্রতিনিধির সঙ্গে একবাক্যে ঘোষণা করলেন—প্রাচীনকাল থেকে একাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাতীয় ভাষায় ও সংস্কৃতিতে শান্তির প্রেরণাই মহত্তম ব'লে গণ্য হয়েছে। পররাজ্য গ্রাসে অনিচ্ছা, অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিজের দেশে শান্তিপূর্ণ শ্রম সম্পর্কে শ্রদ্ধা, মানুষে মানুষে সমন্বয়-চেষ্টা, মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শ। আমাদের এই ঐতিহ্য, এই আদর্শ যুদ্ধের প্রচার দিয়ে, ঘৃণার বিষবাষ্পে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যশক্তি বারে বারে কলুষিত করতে, বিলুপ্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শান্তির
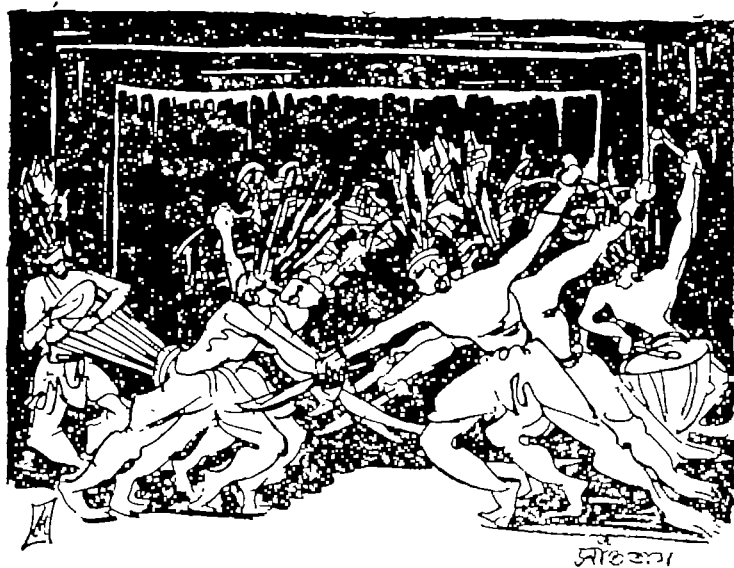
ঐতিহ্যকে লোকপ্রিয় ক'রে তোলা তাই আমাদের মহৎ দায়িত্ব।

৪ঠা তারিখে সম্মেলন-মণ্ডপে শিল্প ও চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুলকরাজ। মণিপুরী তাঁতশিল্প, আগ্রার পাথরের কাজ, শক্ত কাগজে তৈরি প্রকাণ্ড ফুলদানের গায়ে কাশ্মীরী শিল্পীর তুলির আঁখর আর অজস্র ফোটোগ্রাফ, পোস্টার, ছবিতে সাজানো ছোট্ট সুন্দর প্রদর্শনী-ঘরটি ফিরে ফিরে স্মরণ করিয়ে দিল শান্তি-সমৃদ্ধির ভারতবর্ষকে। আর এরই পাশে দেয়ালের গায়ে পুরনো 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা থেকে যুদ্ধের সময়কার কয়েকটা ছবির ছিন্ন অংশ—মিত্র-পক্ষের অত্যাচারিত মুমূর্ষু যুদ্ধবন্দী, গ্যাসে দম আটকে মরা মা আর শিশু, বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ জনপদ—হিটলারী যুদ্ধের অসহায় শিকারদের সেই সুপরিচিত ছবি, সেই ধ্বংসের দিনপঞ্জী বিবেকদংশনের মতো দগদগ করতে লাগল।

২রা থেকে ৪ঠা প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে রাত এগারোটা-বারোটা আর এই দুপুর থেকে পরদিন ভোর—তন্ময় কলকাতার কানকে আদর করল, চোখে স্বপ্নের কাজল পরিয়ে দিল বিচিত্র ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র শিল্পকলা। একই মঞ্চের ওপর ঝলমলে পাদপ্রদীপের সামনে, ফিল্ম-ক্যামেরার চঞ্চল চাউনি আর ফ্ল্যাশলাইটের ঘনঘন চমকের মধ্যে কত বিচিত্র ভাষা কত অভিনব ভঙ্গিতে সরল লোকশিল্প আর সূক্ষ্ম-জটিল নগরশিল্পের মাধ্যমে দিনের পর দিন ধীরে ধীরে মূর্তি নিল, মুখের আদল পেল, তিলে তিলে রক্তমাংসে গ'ড়ে উঠল শোষণে-অত্যাচারে জর্জর তবু চিরজীবী চিরজয়ী, শ্রম আর বীর্যের প্রতীক এক দেশ—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে আসামে জড়ানো-ছড়ানো অখণ্ড একাকার দেশ—অঘটন-ঘটনপটিয়সী শিল্পসুন্দর ভারতবর্ষ। ক্ষেতগৃহস্থি নিয়ে চাষবাস আর ফসলকাটায় ব্যস্ত বিহারের শান্তিপ্রিয় আদিবাসী কৃষকদের ছৌ-নাচ, বন কেটে জনপদ বসিয়ে বাঘের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই ক'রে আজও বেঁচে আছে যারা—সারা অঙ্গে বাঘছাল সেই যোদ্ধৃবেশী মণিপুরী আর ময়ূরের পাখা আর তীরধনুকে সজ্জিত সাঁওতাল উপজাতির শিকারী নাচ, সাঁওতালী উৎসবের অঙ্গ ঝুমুর নাচ, মহাকবি ভাল্লাথোলের কেরলার অবিস্মরণীয় নৃত্যনাট্য কথাকলি, মহারাষ্ট্রের সমবেত লোকসঙ্গীত পোয়াড়া আর তামাশা, লাউনি সুরে আজকের জীবনের কথা, জেলে আর মাঝির নাচ-গান, অন্ধ্রের লোকসঙ্গীত বুরুকথা আর যুরা কথা, উত্তর প্রদেশের রসিয়া, রংপুরের ভাওয়াইয়া, মালদহের গম্ভীরা আর দ্বিখণ্ডিত নির্যাতিত পাঞ্জাবের গান আর মর্মস্পর্শী গীতিনাট্য; উর্দু আর হিন্দি কবিদের হৃদয়-জাগানিয়া

মুশায়েরা, আর নাটক—পাঞ্জাবের বাইদা পাহার, উত্তর প্রদেশের গোদান, বাংলার ছেঁড়া-তার আর অনেক···দিনের পর দিন তারা বলে চলল, যে-অনাস্বাদিত জীবনের আস্বাদ পাচ্ছ, যে-নাচগান যে-নাটকের অভিনয় দেখছ, এরই জন্যে চাই শান্তি। মুগ্ধ হ'ল কলকাতা, কলকাতা অভিভূত হ'ল তবু প্রশ্ন করলে—কিন্তু কিসের জন্যে এমন দল বেঁধে এলে তোমরা? আর তাই দল বেঁধে, গলাগলি ক'রে মঞ্চে এসে দাঁড়াল গুজরাট আর বাংলা, কাশ্মীর আর বিহার, পাঞ্জাব আর উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র আর নেপাল, অন্ধ্র আর আসাম, কেরলা আর রাজস্থান, হাতে হাত বেঁধে এগিয়ে এলেন দোতরাবাদক টগর অধিকারী আর গীটার-হাতে জেমস পিটর, তামাশা লোকসঙ্গীতকে নবরূপে পুনরুজ্জীবিত ক'রে আন্নাভাও সাঠে আর নবজীবনের গান মুখে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কবিকে জনতার একজন ক'রে আর জনতাকে কবি ক'রে নেওয়াজ হায়দার আর পরতেজ শহিদী, কলকাতার হৃদয় জয় ক'রে, কলকাতাকে পাগল ক'রে দিয়ে শম্ভু মিত্র আর অমর শেখ। একটি আওয়াজে মুখরিত হ'ল মঞ্চ—শান্তির জন্যে। এই নাচগান এই নাটকের অভিনয়, এ-সব শান্তির জন্যে। এসো শান্তির জন্যে।

সে ডাকে অবশেষে মন থেকে দ্বিধা মুছে ফেলে সাড়া দিল শান্তির শিবিরাশ্রয়ী কলকাতা। পুরো পাঁচ দিনে সবকিছু বুঝে নিয়েছে কলকাতা, দেখেছে ছোট বড় অনেক ত্রুটি ঘটেছে অনুষ্ঠানে। ভারতবর্ষের সমস্ত সৎ শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিৎকে এখনো এক করতে পারে নি সম্মেলন, বিজ্ঞানীদের একেবারেই আমন্ত্রণ করা হয় নি—অনেক বড় বড় ত্রুটি ঘটে গেছে। সম্মেলনের উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে সবক্ষেত্রে বিশদ আলাপ-আলোচনার সম্ভব হয়নি, তাছাড়া আলাপ-আলোচনার জন্যে যথেষ্ট সময়ও পাওয়া যায়নি; উৎসবাংশে নাচ-গান-নাটকে লোকসংস্কৃতির প্রাণশক্তি থাকলেও অনেক সময়েই শিল্পরূপের অপরিণতি চোখে পড়েছে। কোন অপূর্ণতাই নজর এড়ায়নি কারো। তবু সব জেনে সব বুঝে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শান্তি-সংস্কৃতি অভিযানের এই মহৎ সূচনাকে অভিনন্দন জানাতে ৬ই এপ্রিল প্রকাশ্য অধিবেশনে কলকাতার সমস্ত রাস্তাই এসে মিশল ময়দানে। আর সেই রাস্তা ধরে কলকাতার মানুষের পাশাপাশি মিছিল ক'রে এল ভারতবর্ষ—সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-প্রতিনিধিদের অভিনব মিছিল এসে একাকার হ'য়ে গেল ময়দানের জনসমুদ্রে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় স্বপ্নালুনীল শান্তির পতাকার

নিচে দাঁড়িয়ে একলক্ষ মানুষের কাছে প্রসন্ন গলায় সভাপতি ভান্নাথোল বললেন, "মুখে আমাদের যদিও হরেক রকমের ভাষা, আচার যদিও হরেক রকম আমাদের, তবু হৃদয় আমাদের একটিই, একসূত্রে গাঁথা। আমাদের দাবি : মানুষ মানুষকে মারতে পারে না। ভালবাসা, শুধু ভালবাসাই আমাদের বেদ-বাইবেল-কোরান।" আর দশ-বারোটা লাউডস্পীকারে ময়দান জুড়ে আর ভিড়ভাঙা ছড়িয়ে-পড়া মানুষের মুখে মুখে আরও দূরের কলকাতায়, আরও দূরের ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হ'ল সম্মেলনের ডাক : "বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গির সব রকম তফাত সত্ত্বেও শান্তিরক্ষার পবিত্র দাবিতে কণ্ঠ মেলাও। বিজ্ঞান, সাহিত্য আর শিল্পকর্মের হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এসো শান্তির স্বপক্ষে।"

[এই প্রবন্ধের ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়]

সূচীপত্র

একবিংশ বর্ষ :: দ্বিতীয় খণ্ড :: পঞ্চম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

রাশিয়ান চিত্রকলা সম্বন্ধে	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১
নজরুল	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৬
কবিতাগুচ্ছ	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
	সুশীলকুমার গুপ্ত	
	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	
রাজধানীর কাহিনী	অনামী	১৭
'কল্লোল'-যুগ ও অচিন্ত্যকুমার	অচ্যুত গোস্বামী	২১
কামরু আর জোহরা (গল্প)	সোমনাথ লাহিড়ী	৩২
বাঙলায় শেক্সপীয়র	গোপাল হালদার	৫১
পুস্তক পরিচয়	সুশোভন সরকার	৬৩
	শান্তিময় রায়	
	ননী ভৌমিক	
	সত্যজিৎ দাশ	
	সিতাংশু ভট্টাচার্য	
সংস্কৃতি সংবাদ	ধরণী গোস্বামী	৮৪
	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	

ছবি : চিত্তপ্রসাদ

প্রচ্ছদপট : মুর্শিদাবাদের রেশমী বালুচর শাড়ির আঁচলা, আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্পাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস, ৭৭।১, সিমলা স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় : ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

রাশিয়ান চিত্রকলা সম্বন্ধে

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

'পরিচয়' ও 'উত্তরসূরী'র পৃষ্ঠায় সোভিয়েট চিত্রপ্রদর্শনীর আলোচনা পড়ে মন খুশিতে ভরে উঠল। অর্ধেন্দ্রকুমার, যামিনীপ্রকাশ ও অতুল বসুর মতামত সংগ্রহ করে আপনারা পরিচয়ের পাঠকবৃন্দের বিশেষ উপকার করেছেন। বিভূতিভূষণ মৈত্রও উত্তরসূরীতে ঐ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। অতএব বাঙলা-দেশে এখনও কালচারের প্রতি দরদ আছে। চিত্রালোচনা বাঙলাদেশে ফোটেনি; এখন আশা হয় শুরু হবে। গত চল্লিশ বৎসর আমাদের চিত্রকলা ও তার উপলব্ধি যেন একই খাতে বইছিল; এবার যেন মনে প্রশ্ন উঠেছে, নতুনভাবে দেখবার সাহস হচ্ছে। যামিনী রায়ের ধাক্কার পর এই দ্বিতীয় ধাক্কা পড়ল সন্দেহ হয়। 'সন্দেহ' লিখলাম এই জন্যে যে মাত্র চার-পাঁচটি প্রবন্ধের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে আসা যায় না; আরো এই জন্যে যে ঐ চিত্রপ্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম না। তা ছাড়া বাঙলাদেশ প্রতিশ্রুতি ভাঙতে সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "বাঙালী (মেয়েরা) জন্মায় গোখরো হয়ে, পরে হয়ে যায় ঢোঁড়া"। তবু আনন্দ হল; এবং বোধহয় সেই আনন্দের জোরেই লিখছি। যৎসামান্য অধিকার এই যে আমি এপ্রিল মাসে প্রাণ ভরে ট্রেটিয়াকফ্ গ্যালারি দেখলাম।

বলতে বাধ্য যে আধুনিক সোভিয়েট আর্ট প্রথম দর্শনে আমারও ভালো লাগেনি। বলিষ্ঠতা, সবলতা, ঋজুতা, জীবনের সঙ্গে যোগ, উজ্জ্বল রঙ, মোটা-মুটি যাকে আর্টের সাহস বলা চলে, তা সবই আছে। প্রোপাগান্ডা রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা ধর্ম-প্রোপাগান্ডার চেয়ে মোটেই বেশি উগ্র নয়। সোশিয়াল রিয়ালিজ্‌মের সঙ্গে ন্যাচারালিজমের পার্থক্যও স্পষ্ট দেখলাম। সামাজিক উদ্দেশ্যও খোলাখুলি। এর কোনোটিই আমাকে বীতশ্রদ্ধ করেনি, কারণ ও-সবে কোনো আর্টিস্ট কখনও ভয় পায়নি; এবং তারাই যখন ভয় পায়নি, তারা যখন ও-সব হজম করেছে, তখন আমার ভয় কিসের? সরকারের হাতও আমার চোখে পড়েনি। এমন কি একটা অনিয়ন্ত্রিত অথচ নিশ্চিত প্রতিবেশ, কাঠামো ও সামাজিক কল্পনার মধ্যে আর্টিস্টের ব্যক্তিগত পার্থক্যও লক্ষ্য করেছি। কেবল তাই নয়, ও-ক্ষেত্রেও বিচার, আন্দোলন চলছে। চাবুকের ভয়ে, সেনসরশিপ-এর চাপে যে রাশিয়ান আর্টিস্টরা সোশিয়াল রিয়ালিজম গ্রহণ করেছে তাও মনে হল না। আমার মনে হল ওটা সচেতন নির্বাচন, গ্রহণ নয়।

নির্বাচন-প্রক্রিয়াটির দুটি দিক আছে। ট্রেটিয়াকফ্ গ্যালারিতে রাশিয়ান আর্টের ইতিহাস লক্ষ্য করবার বস্তু। বাইজ্যানটিন যুগ থেকে শুরু, তারপরে শতাব্দী অনুযায়ী বিভাগ, শেষে বিপ্লবোত্তর যুগ। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে প্রথম যুগ, ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিপ্লবোত্তর যুগের ছবি দেখলাম। প্রথম যুগের আইকনগুলি সত্যিই অদ্ভুত। বলা বাহুল্য, আইকন হল একান্ত ধর্মপ্রাণ ছবি; যীশু, মেরী এবং ধর্মাত্মা সেন্ট-এর জীবনই হল বিষয়। কিন্তু এই প্রকার রাশিয়ান ধর্মপ্রাণ ছবির সঙ্গে ইটালিয়ান প্রিমিটিভ-এর (ফ্রা লিপ্পো কিংবা ফ্রা আঞ্জেলিকোর) তুলনা করলেই —যার অবসর আমি পেয়েছিলাম—বোঝা যায় যে ঐ রিয়ালিজম বরাবরই মূল দৃষ্টি-ভঙ্গি। ঐ রঙের উজ্জ্বলতা, ঐ মানুষী ভাব, ঐ মাটির সঙ্গে ঘন যোগ কখনও ও-দেশে ছিন্নভিন্ন হয়নি। রাশিয়ান আইকনের ডানা থাকলেও যেন উড়তে পাবছে না। (এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জয় হয়েছে কিন্তু ব্যালে নৃত্যে। লোকনৃত্যের সঙ্গেই রাশিয়ান আর্টের তুলনা হয়—ব্যালের সঙ্গে নয়। এ একটা রাশিয়ান কালচারেব বড় সমস্যা মনে হল)। ঊনবিংশ শতাব্দীর একখানি বিখ্যাত ছবি আছে—খ্রীষ্টের আগমন। এখানেও ঐ মাটির টান ও মানুষের যোগ। প্রতীক্ষারত প্রতি ব্যক্তিটির মনোভাব পৃথক। খ্রীষ্টও অবতার নন, মানুষ। অতএব সোশিয়াল রিয়ালিজম নতুন জিনিস নয়। নতুনত্ব সামাজিক চেতনায়। পূর্বে যেটা ছিল ট্রাডিশন—অন্য ভাষায় আর্টিস্টের স্বাধীনতা, আজ সেটা দর্শন, মেটাফিজিক্স নয়—দর্শন। মেটা-ফিজিক্স যে নয় তা আমি জোর করেই বলতে পারি। বহু দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হল, কারুর মুখে ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম কথাটি শুনতে পাইনি। ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই সিস্টেম-এ পরিণত হয়নি—এমন কি ইকনমিক প্ল্যানিং পর্যন্ত নয়। ওরা যেমন দেখে, তেমনই কাজ করে, তেমনই সংকল্প বদলায়। ওরা দেখে—এই জন্যই বললাম দর্শন। (এক মাসে মাত্র তিনজনের চোখে চশমা দেখি)। তর্ক উঠবে—এটা দর্শন নয়, কর্তারা যে-দ্রষ্টব্য স্থির করেছেন তাই দেখাকে কি দর্শন বলে? নিশ্চয়ই না ; কিন্তু চোখ খুলে দেখলে কি মোটামুটি একই জিনিস চোখে পড়ে না? সেটা মানুষ ছাড়া কি? মানুষ বাঁচতে চায়, ভালোভাবে, আরো ভালোভাবে—এইটেই কি সব দৃষ্টিরই লঘিষ্ঠসাধারণ 'গুণ' নয়? আমার ধারণা যদি সত্য হয় তবে সোশিয়াল রিয়ালিজমকে আধুনিক প্রোপাগাণ্ডা বলা যায় না, আর তাকে আর্টের শত্রুও বলা চলে না।

আরেকটি দিকও আমার চোখে পড়ল। সেটা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় থেকে রাশিয়ান আর্টিস্টের দেশাত্মবোধ। সাহিত্য কিংবা পলিটিক্যাল ইডিয়লজিতে যেমন Slavophile আন্দোলন এটা তার সমান্তরাল দৃষ্টিভঙ্গী, বোধহয় সম-গোত্রের নয়। পিটারের পর থেকে পিটার্সবার্গের দরজা দিয়ে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ প্রভাব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে, টাকার ব্যাপারে, কালচারে সর্বত্র—পোশাকে, পরিচ্ছদে,

ভাবভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায়। (তার প্রমাণ এখনও ধরা পড়ে লেনিনগ্রাডে)। তার বিপক্ষে শীঘ্রই প্রতিবাদ ওঠে, মস্কো শহরকে কেন্দ্র করে। এই প্রতিবাদের প্রধান সুর রাশিয়ার আত্মা, তার বিশেষত্ব, ধর্মে Orthodox Greek Church সাহিত্যে রাশিয়ান জীবনধারা, তার চাষার, তার লোকজনের জীবনযাত্রার বর্ণনা। চিত্রেও প্রতিবাদ আসে, কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়, একটু লুকিয়ে, নীরবে। ট্রেটিয়াকফ গ্যালারিতে এই টিপিকাল রাশিয়ান দৃশ্য, রাশিয়ান মুখ, রাশিয়ান বাড়ি, রাশিয়ান জীবনে এর অভিব্যক্তি বর্তমান। গত শতাব্দীর শেষ থেকেই চিত্রে এই রাশিয়ান টাইপের আবিষ্কার। দেশাত্মবোধ ও টাইপ তৈরি পূর্বোক্ত নির্বাচনপ্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিক। এই টাইপ দুই প্রকার—Real type যেমন রাশিয়ান চাষা, মেয়ে, বরফ, গাছ, নিসর্গ, ও Ideal type মার্কস নয়, ম্যাক্স হেবারের অর্থে। এই আইডিয়াল টাইপই রাশিয়ান ইতিহাসের হীরোর সঙ্গে মিশে গেছে। রাশিয়ার হীরো হল তারাই যারা বিদেশী ও স্বদেশী শত্রুর বিপক্ষে লড়াই করেছে, ও লড়াই করবার ফলে নতুন কিছু গড়ে তুলেছে। এরা হীরো বটে, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে রাশিয়ার চাষা—মাটি থেকে উঠেছে। পিটার, পুশকিন, টলস্টয়, কেউই চাষা ছিলেন না, কিন্তু এঁদের পোর্ট্রেট কি প্রস্তরমূর্তি টিপিকাল রাশিয়ান, মাটির মানুষ, একেবারে চাষা। শ্রমিকের মূর্তিও অনেক দেখলাম—কিন্তু সেই একই টাইপ—অর্থাৎ সবই টিপিকাল। যেকালে টিপিকাল সেকালে ন্যাশনাল; কিন্তু যেকালে টিপিকাল সেকালে ন্যাচারাল নয়, কারণ আইডিয়াল টাইপ (যেমন র‍্যাফেল প্রভৃতির হাতে যীশু, মেরী) ন্যাচারাল নয়। সোশিয়াল রিয়ালিজম এই দেশাত্মবোধ-প্রসূত, তার থেকে ছাঁকা, বেছে-নেওয়া আইডিয়াল টাইপ এরই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি। বলা বাহুল্য, এই আইডিয়াল টাইপ হল জনগণের টাইপ। অতএব আর্টের অ্যাবসট্রাকশন এখানে রয়েছে। বস্তুহীন ফোটোগ্রাফি মোটেই নয়।

এগুলো রাশিয়ান আর্টের তরফের যুক্তি। যুক্তি বন্ধ করলাম চোখের বিপক্ষে, তবু যেন প্রাণ ভরল না। এমন কি রেপিন, ভেরেস্‌চাগিন, আইভনফের ছবি দেখেও নয়, বিপ্লবোত্তর ছবি দেখে তো নয়ই। (সাহিত্যের বেলা অবশ্য পার্থক্যটা নিতান্ত পীড়াদায়ক। কোথায় লিও আর কোথায় আলেক্সি—অথচ আলেক্সির বিষয় কম ড্রামাটিক নয়। অন্যে পরে কা কথা।) আমি সাফ্ সাফ ওদের পণ্ডিতদের বললাম, 'তোমাদের ভিজুয়াল আর্টস দুর্বল, অনুন্নত, তোমাদের চেষ্টা এখনও চেষ্টাই রয়ে গেছে।' ওরা যেভাবে শুনলে, ও যেভাবে মেনে নিলে, তা দেখে আশ্চর্য হলাম। ভারতবাসী রুশভক্তদের ঐ প্রকার বিনয় নেই। সূর্যের চেয়ে বালু তপ্ত। দু ধরণের উত্তর শুনলাম। প্রথম উত্তরটি প্রায় সব সমালোচনার বেলায় শুনলাম : 'পাঁচ বছর শান্তিতে থাকতে পেলে সবই হবে, সব গলদ দূর হবে, সব দোষ কাটিয়ে উঠব।' এই উত্তরের মধ্যে সত্যটুকু হল ঐতিহাসিক, এর মর্যাদা হল জাতীয় আত্ম-

বিশ্বাস—কিন্তু আর্টের দিক থেকে এই উত্তর প্রতিশ্রুতি নয়। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে পারে তখনই যখন এদের আত্মবিশ্বাস এতটাই দৃঢ় হবে যে এরা অন্য দেশের ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সহজে গ্রহণ ও বরণ করে নিতে পারবে। রাশিয়ান আর্টের আত্মবিশ্বাস একটু উগ্র, অর্থাৎ একটু অন্তরে দুর্বল। তার চিহ্ন এই ঃ কোথাও—আমি প্রায় সব বড় গ্যালারিই দেখলাম, বড় বড় মিউজিয়ম ও লেনিন লাইব্রেরিও দেখলাম—কোথাও সীজান, ম্যানে, ম'নে, সীজলে, দেগা, ন্যাশ, সাদার-ল্যান্ডের ছবি নেই। কিন্তু ইমপ্রেশনিস্ট ছবির নামগন্ধ নেই—অন্তত আমার নাকে, কানে, চোখে আসেনি। অত ভয় কিসের? ইমপ্রেশনিজমের মধ্যে কি রিয়ালিজম নেই? ওটা নাহয় ভুয়ো-ক্লাসিসিজমের বিপক্ষে প্রতিবাদ হল, তবু রোমান্টিসিজমের মধ্যে ভালো কিছু নেই? প্রতিবাদের অংশটা? তাও না হয় ব্যক্তিসর্বস্ব, তবু সোশিয়াল রিয়ালিজমের মধ্যে কি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই? সোভিয়েট আর্টের জানলা যেন বন্ধ; অথচ রাশিয়ার ভূমি, তার আদর্শ, তার প্রচেষ্টা বিরাট, প্রশস্ত! আমার মনে হয় আইডিয়াল টাইপের সন্ধান, দেশাত্মবোধ—এই সবের মধ্যেই এমন কিছু বস্তু আছে যেটা আর্টের কাছ থেকে প্রত্যাশিত মুক্তিবোধের প্রতিকূল। পিকাসোকে নিয়ে কী করবে এরা বুঝতে পারছে না। একে কমিউনিস্ট, তার বিখ্যাত আর্টিস্ট, অথচ সোশিয়াল রিয়ালিস্ট নয় ছবিতে। দ্বিতীয় উত্তর পেলাম, 'হয়তো আপনার দৃষ্টিভঙ্গিরই দোষ, শিক্ষারই জন্য আপনি বুঝতে পারছেন না।' খুবই সম্ভব। আমার চোখ ইদানীংকার ফরাসী ছবিতে তৈরি, তার ওপর ভারতীয়, ওরিয়েন্টাল আর্টের ছানি, সবার ওপরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিথ্যা শিক্ষা, ইংরেজি ধরণের স্বাধীনতা-প্রিয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি। মেনে নিলাম। তবুও রাশিয়ান আর্ট আমার জন্যে, আমার শিক্ষার দোষেই ঐ রকম ঠেকল, না নিজের অন্তরের দুর্বলতাও রয়েছে? রাশিয়ান আর্ট যদি একেবারেই নতুন হত, তা হলে না হয় বুঝতাম যে নতুনত্বের ধাক্কা সইতে পারি নি। কিন্তু রিয়ালিজমের অন্য স্কুলও তো দেখলাম—ডাচ, স্প্যানিশ প্রভৃতি। গয়া, টেনিয়ার্স-এর ছবিতে, রেমব্রান্ট্, হল্‌স্ প্রভৃতির পোর্ট্রেটেও যথেষ্ট রিয়ালিজম্, এমন কি সোশিয়াল রিয়ালিজম্ খুঁজলেও পাওয়া যায়। তবু এদেরই ছবিতে প্রাণ ভরল কেন? এর উত্তর ওঁরা দিতে পারেন নি। আমিও হয়তো পারব না। তবু কথাটি না বলে রাখা অন্যায়। তবে অফিসিয়াল আর্ট, সেন্সরসিপ, ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব—এ সব বাজে ব্যাখ্যা। রাশিয়া এখনও পূর্ব-পশ্চিমের, দেশ-বিদেশের, পুরাতন-নতুনের সমন্বয় সাধন করতে পাবে নি। পারেনি, চেষ্টা চলছে এইটাই হ'ল ইতিহাসের দিক থেকে প্রধান কথা; তাই বলে সোভিয়েট আর্ট এখনও খুব বড় নয়।

আরেকটি ব্যাখ্যা মনে উঠছে; বিশদ করে লেখবার সময় নেই, ইঙ্গিতমাত্র দিচ্ছি। রিয়ালিজম প্রথম ওঠে মিশরে। মিশরী রিয়ালিজমের তুলনা হয় না। তার

কারণও পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন। মিশরীদের বিশ্বাস ছিল আত্মা ফিরে আসে; সেই কা (Ka) বিদেহী হ'লেও তার প্রকৃতি ছিল ভৌতিক—অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সাজসজ্জা, দেহের সব প্রয়োজনই তার থাকত। দৈহিক প্রয়োজনবোধে ফিরে আসতে হত তাকে পুরাতন আশ্রয়ে—সেইজন্যে মমির আবিষ্কার। কা যেন চিনতে পারে এইটেই ছিল উদ্দেশ্য। এই চেনার পিছনে দুটি বিশ্বাস ছিল, (১) মৃত্যু ও জীবন ভিন্ন নয়; অতএব (২) তাদের মধ্যে পারম্পর্য আছে। মিশর ছেড়ে দিলে একটু শেষের যুগের রোমান আর্টও তাই—সে-সময়কার বিশ্বাসও দেহের অমরত্বে। তাই আমার মনে হয় রাশিয়ান ঐ হিসেবে ভৌতিক, তার প্রতিজ্ঞা মৃত্যু নয়, জীবন-মৃত্যুর অভিন্ন পরম্পরা। অর্থাৎ সোভিয়েট আর্ট সোশিয়াল রিয়ালিস্ট হতে বাধ্য হয়েছে এই জন্যে যে রাশিয়ান ভূয়োদর্শন Phylosophy of history স্বর্গ থেকে বিদায় নয়, বিদেহী আত্মদর্শন নয়, মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে কয়েদ করার দর্শন। এটা 'অসভ্য' প্রিমিটিভ্ জাতির আর্টেও পেয়েছি। তাই কি সোভিয়েট আর্ট একটু মনে হ'ল, বিশেষত সভ্যতা, অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতা যখন মৃত্যুমুখী, মৃত্যুর পূজারী?
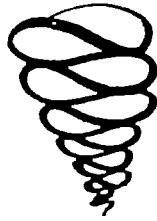
নজরুল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

মেসোপোটেমিয়া রণাঙ্গন থেকে যেদিন হাবিলদার কবি সর্বপ্রথম কলকাতার সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠান সেই কবিতার মধ্যেই নতুন যুগের আগমনী সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুত নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির দাবি ও প্রচেষ্টা, বিশ্বময় গণ-অভ্যুত্থানের বাণী নজরুলের কবিতা ও গানেই সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ-রূপ গ্রহণ করে। মানবতার মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার উদাত্ত মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের গানও তিনি গেয়েছেন অনেক, কিন্তু ঋষিকবির মুক্তিমন্ত্রে আমরা শুনেছি সুদূরের আহ্বান, তাঁর মানবত্বের মহিমায় দেখেছি ঔপনিষদিক ব্রহ্মানুভূতির রূপান্তর. তাঁর সংগ্রামী সঙ্গীতের মধ্যেও শুনেছি শত্রুর প্রতি প্রেম ও ক্ষমার আদর্শ। মহাকবির এই মহৎ সাধনা বুদ্ধি ও সংস্কৃতিপরায়ণ শিক্ষিত সমাজকে অভিভূত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নিপীড়নজর্জর সাধারণ সংগ্রামী মানুষ তাদের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ শঙ্খধ্বনি তার মধ্যে খুঁজে পায়নি। সে আহ্বান সর্বপ্রথম এল তার কাব্যে। বিশ্বজোড়া বিপ্লবের আবাহন তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন। যুদ্ধপিয়াসী যারা দুনিয়াময় সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে চলে, তাদের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করলেন, নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনেই যে বৈপ্লবিক ধ্বংস একথা জানলাম তাঁর "বিদ্রোহী"র মধ্যে—

> "আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
> নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।
> আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
> আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে,"

সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ সমাজ যখন প্রায় জড়ত্ব পেয়ে বসেছে তখন তারা শুনল এই বন্ধন মুক্তির গান। সারা দেশেই জাগল জাগরণ ও আত্মানুভূতির নতুন প্লাবন।

তারপর "বিশের বাঁশী" ও "ভাঙার গান"-এর সুরে তিনি দেশময় নতুন সাহস ও সংগ্রামী প্রেরণা সৃষ্টি করলেন। কোন হেঁয়ালি না রেখে সমস্ত আলঙ্কারিক আবরণ পরিত্যাগ করে স্পষ্ট ভাষায় ডাক দিলেন—

> "লাথি মার ভাঙরে তালা
> যত সব বন্দীশালায়
> আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা
> ফেল্ উপাড়ি।"

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তাতে কবির এই দীপক রাগিণীর আহ্বান অনেকখানি কাজ করেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতায় পৌঁছে নজরুল সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে। এবং তাঁরি সঙ্গে বাস করতে থাকেন। মুজফ্ফর আহ্মদের সাহচর্যেই নজরুলের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিনে দিনে অধিকতর দানা বেঁধে ওঠে এবং কিছুদিন পরে দুজনে এক সঙ্গে কৃষক-মজুরের মুখপত্র সাপ্তাহিক "লাঙল" পত্রিকা প্রকাশ করেন। নজরুলের সাম্যবাদে বিজ্ঞানসম্মত মার্কস-বাদ কতটা ছিল সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু যিনি বলতে পারেন—

"সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানবজাতির লজ্জা—সকলের অপমান।"

তাঁর সাম্যবাদ যে অন্তরের গভীরতলে দৃঢ়নিবদ্ধ—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে নজরুল যখন আদালতে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়ান তখন জবানবন্দীতে তিনি বলেছিলেন, "উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি, ভগবানের আঁখি জল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।"..."এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ওই উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ওই প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না! হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আর এক-জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।"..."আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের জাতির দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।"..."আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক।" কবির এ উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সংগ্রাম জাতীয়তাবাদের নয়, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে তাঁর রক্তলেখনী উদ্যত।

বিশ্বময় গণজাগরণের যে স্বপ্ন আজ সর্বদেশে সংগ্রামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করছে সেই স্বপ্ন নজরুল রূপায়িত করেছিলেন একাধিক কবিতায়।

ওই দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর।
মরিয়ার মুখে মারনের বাণী উঠিতেছে মারমার।
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ—
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!'

ছাত্রদলের গান, কৃষকের গান, অরুণ প্রাতের তরুণ দলের গান—গানে নজরুল সেদিন সারা দেশময় প্রলয়বন্যা সৃষ্টি করেছিলেন। আজকের জনজাগরণের মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে অভ্যস্ত মানুষ কল্পনাও করতে পারবেন না অমানিশার শেষে সেই প্রথম অরুণোদয়ের দীপ্ত মহিমা কি আবেগ সৃষ্টি করেছিল।

রাজনীতির ফাঁকা আদর্শ নজরুলকে অভিভূত করেনি, কঠোর বাস্তব তাঁকে কশাঘাত করেছিল, তাই বড় দুঃখে তিনি লিখেছিলেন—

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।"

দারিদ্র্য নিয়ে বাঙলা কাব্যে ইতিপূর্বে অনেক রোমান্স সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু দারিদ্র্যের নগ্ন নিষ্ঠুর মূর্তি নজরুলের কলমে যেভাবে ফুটে উঠেছে তার জুড়ি আছে কি না জানি না।

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
"পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস!"

এই পংক্তি কয়টি যেমন দারিদ্র্যের শাবকাঘাতে তীব্র, তেমনি প্রকৃত কাব্যরসেও মহীয়ান।

নজরুল সৈনিক, নজরুল যোদ্ধা, জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধের চারণ, তবুও যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, এই শান্তিময় পৃথিবীতে

যারা সর্বকিছুকে ধ্বংসের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে, তাদের উদ্দেশে কবি বলেছেন—

"নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান"

আরও বলেছেন—

"যে আকাশ হতে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টিধারা,
সে আকাশ হতে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কারা?
উদার আকাশ বাতাসে কাহারা
করিয়া তুলেছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত?   হবে না প্রতিবিধান?
ভগবান! ভগবান!"

আজকের জীবনে জনসংগ্রাম ও পূর্ণ স্বাধীনতার যে প্রত্যক্ষ রূপ আমরা দেখতে পাই, নজরুলের কাব্যে তার সব দিকই ধরা পড়েছিল।

সে যুগের অতি সাবধানী প্রবীণ সমালোচকবৃন্দ নজরুলের কাব্যে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের সুরে তৃপ্ত হতে পারেননি, কিন্তু সমগ্র তরুণ-সমাজ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাদের সংহত যৌবনশক্তিকে যে মুক্তির প্রয়াসে নিয়োজিত করেছিল, তার অধিকাংশ প্রেরণা এসেছিল নজরুলের কাব্য থেকে। নজরুলের গানের কলি গাইতে গাইতে অনেক শহীদ মৃত্যুবরণ করেছে, শেষমুহূর্তেও চিন্তা করেছে, 'ফাঁসি পরেই আনব হাসি, মৃত্যুজয়ের ফল।'

নজরুলের বিদ্রোহ ও বেহিসেবী যৌবনশক্তি শুধু যে তাঁর কাব্যেই রূপায়িত হয়েছিল, তাই নয়, তাঁর জীবনেও পরিপূর্ণভাবে তা ফুটে উঠেছিল। সাবধানী পথিকের মত পা ফেলে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না, তাই সে করেছে যখন চেয়েছে মন যা। কিন্তু তাঁর মন ত শয়তানের আবাস ছিল না। তাঁর মন ছিল সকলের জন্য প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসায় ভরপুর। সেই মনের খুশি মেটাতে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখেননি তিনি কোনদিন। অনেকে বলেন, তার জন্য জীবনে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু ঠকিয়েছে জেনেও সেই বন্ধুর কথায় আবার বিশ্বাস করেছেন, ঠেকে শেখেননি কোনদিন। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি এ বিশ্বাস কোনদিন হারাননি যে, মানুষ মাত্রই সৎ, অবস্থার বিপাকে পড়ে সাময়িকভাবে যতখানি নীচতাই সে প্রকাশ করুক না কেন! আমি জানি, নিজের দুঃসহ অর্থাভাবের মধ্যেও বন্ধুর দুঃখ কাহিনীতে বিগলিত হয়ে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করে সাহায্য করেছেন তাকে। পরে যখন জানতে পেরেছেন, যে-কথা বলে বন্ধু টাকা নিয়েছে, সেগুলি বানানো গল্প তাতে এতটুকু দুঃখ বা উষ্মাবোধ করেননি তিনি, বলেছেন, তার অভাবটা সত্য, আমাকে হয়ত ঠিক কথা বলতে সংকোচ বোধ করেছে। গল্পটা কল্পিত হলেও তার অর্থের আত্যন্তিক

প্রয়োজন কল্পিত ছিল না। বলা বাহুল্য, সে টাকা নজরুলকেই পরিশোধ করতে হয়েছিল।

একটা পয়সা যখন হাতে নেই, মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হওয়ায় দিন চলে যাচ্ছে, সেই সময়ও একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে কথা রাখবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিশ-পঁচিশ টাকার দায়ে পড়েছিল সে।

আমি তখন কলকাতায় সবে বাসা করেছি। প্রথমা কন্যাটির বয়স তখন তিন বছর। একদিন আদর করে নজরুল তাকে বলেছিল, মোটরে চড়িয়ে তোকে সারা কলকাতা দেখিয়ে আনব। কয়েক মাসের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার স্ত্রী-কন্যাকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হল। এমন অবস্থায় নজরুল এসে সকালবেলা হাঁক দিয়েছে আমাকে। আমি তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। শ্রীমতী জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'কাজীকাকু, আমায় মোটরে চড়ালে না, কালই দেশে চলে যাচ্ছি। দাদু ডেকেছে।'

একমুহূর্ত বিলম্ব হল না নজরুলের, বলে উঠল, 'বৌদি ওকে কিছু খাইয়ে দিন, বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' তারপর ট্যাক্সিতে বসে সারাদিন ঘুরল ওরা, কোথায় চিড়িয়াখানা, কোথায় খিদিরপুরের ডক, দক্ষিণেশ্বর কালীর বাড়ী—তারপর এখানে-ওখানে ওর যত আড্ডাখানা ছিল। ট্যাক্সিখানা সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছে। বিকেলবেলা যখন ওকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে যায়, তখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়ার টাকা? তা পরিশোধ করার কোন উপায়ই নেই ওর। এবার ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরা শুরু হল ওই ট্যাক্সির ভাড়ার টাকা সংগ্রহে। মুজফ্ফরকে ধরতে পারলে না অনেক চেষ্টা করেও, রাত আটটায় সময় তালতলায় বন্ধু কুতুবুদ্দীনের কাছ থেকে চেয়ে ট্যাক্সি ভাড়া যখন পরিশোধ করলে, তখন প্রায় পঁচিশ টাকার কাছাকাছি উঠে গেছে। আমি যথেষ্ট তিরস্কার করেছিলাম নজরুলকে এর জন্য। ও জবাব করেছিল, 'টাকা দিয়েই কি আনন্দের পরিমাপ করা যায় রে? যা ব্যয় হয়েছে, তার অনেক বেশি পেয়েছি আমি।'

যে নজরুল পরবর্তী জীবনে কালীর উপাসক হয়েছিলেন, মৌ-সভী যত মৌলবী আর মোল্লারা দেবদেবী নাম মুখে আনার অপরাধে যে 'পাজী'টার জাত মারবার ফতোয়া দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'কাফের কাজি ও', সেই নজরুলকেই জন্মত মুসলমান হওয়ার অপরাধে তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে কম নাকাল হতে হয়নি। আমার বাড়ীতে নজরুলের অবাধ যাতায়াত এবং খাওয়া-দাওয়া চলত—এই অপরাধে আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক আমার স্ত্রীর হাতে খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। অথচ কলকাতায় এসে আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী নজরুলের গানে এবং আলাপে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ ছেলে হিন্দু কি মুসলমান,

তা ভাববার অবকাশ নেই। ওর বন্ধুত্বের জন্য যদি সমাজে একঘরে হতে হয় সে মূল্যও যথেষ্ট নয়।'

ব্যাপারটা সব ক্ষেত্রেই এত সহজে মিটে যায়নি। কবি ও গায়ক নজরুলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার অপরাধে একটি বাঙালী হিন্দু মেয়েকে আত্মহত্যা করে সামাজিক ও পারিবারিক গঞ্জনা এড়াতে হয়েছিল।

১৩২৮ সালের কথা। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্বর্ধনা উপলক্ষে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের আমন্ত্রণে আমরা যারা মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, নজরুল ছিল তাদের অন্যতম। নজরুলের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে সেখানে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এবং প্রধান অভ্যর্থনা সভার পরের দিন নজরুল-অভ্যর্থনার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে নজরুলের গান শুনবার তাগিদে সে সভায় আসবার আগ্রহ কিছু বেশি দেখা যায়। কোন একটি কুমারী মেয়ের এই আগ্রহের মধ্যে তার অভিভাবকবৃন্দ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটিকে বড় করে তোলেন। কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও মেয়েটি সভায় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য গঞ্জনা ও শাসন তার পারিবারিক সীমাতেই আবদ্ধ থাকেনি। কোন মুসলমান তরুণের উপর হিন্দু মেয়ের এই টান সমাজের অনেকেই ধিক্কারের চোখে দেখেছিলেন। চারদিকে লাঞ্ছনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে হয়েছিল মেয়েটিকে।

তারপর নজরুল যখন হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করেন, তখন বাঙলার তদানীন্তন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দও এর মধ্যে সমাজ-ধ্বংসের বীজ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। সে যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দৈনিক—যার প্রতিষ্ঠা আজও অটল—সেই পত্রিকার স্তম্ভেই অজস্র কুৎসা রটনা করা হয়েছিল নজরুল-দম্পতি ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে। নজরুলের বন্ধু ও বিবাহের পান্ডা হিসেবে আমাকে চাকরি পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছিল।

আজ নজরুল সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব কেটে গেছে—একথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে। যাঁরা কাব্যরসিক ও মানব-প্রেমিক তাঁদের সকলেরই মনে নজরুল স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কিন্তু মনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কাজে রূপান্তরিত হয় না—এ হয়ত আমাদের জাতির অভিশাপ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আমরা অজস্র অনুশোচনা করেছি, উদাসীনতার জন্য অভিশাপ দিয়েছি নিজেদের। অনেকে প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম এর পুনরাবৃত্তি যেন আমরা আর কোন কবির জীবনে ঘটতে না দিই।

কিন্তু মনের অনেক সদিচ্ছার মত আমাদের সে ইচ্ছাও মনেই থেকে গিয়েছে। আমরা নজরুলের জন্মদিনের উৎসব পালন করি, তাঁর কাব্য-গীতি আলোচনায় গদগদ

হই, জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দানের কাহিনী বিবৃত করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, অথচ সকলের চোখের আড়ালে নিভৃত গৃহকোণে চিকিৎসা ও অর্থের অভাবে কবির জীবন-কুসুম যে একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি দুঃখে ও বেদনায় অসহনীয়ভাবে কাটছে—এ খবর আমরা সকলে জেনেও তার নিরসনের জন্য কোন ঐকান্তিক চেষ্টা করছি না।

আষাঢ় সংখ্যায়

প্রবন্ধ

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি স্মরণে
—রবীন্দ্র মজুমদার—

প্রগতি-সাহিত্যের নায়ক-চরিত্রের ভূমিকা
—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—

রামমোহন রায়ের ধর্মমত
—জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত—

পরিচয়-এর কুড়ি বছর
—হিরণকুমার সান্যাল—

অপরাজিতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যথার রাঙাজবা অপরাজিতা নীল যন্ত্রণার,
উদার শান্তির সন্ধ্যামণি আর জাগর রজনীর পলাশ ভোর,
রাতের তারা যত দু'হাতে লুঠে করা ফুলের ঝাড়
সকলি দেব আজ মৃত্যু ভুলে যাব দুহাতে তোর।
আমার বাঁচা-মরা আমার ভাঙা-গড়া
হাসি ও কান্নার জমানো তোড়া
দোলাবে নিদ্রাকে ভোলাবে রূঢ়তার কঠিন কোড়া।

সে যে একতারা বাজাই প্রেমের গান
বোশেখে শ্রাবণে হাটে-মাঠে গাঁয়ে পথে।
এ মাটি বাউল আমি বৈরাগী সেও তো প্রেমেরই টান
সারা জীবনের নজরানা দিই রক্তিম ফারখতে।
রাতের আকাশে দৌলতখানা
সারা হৃদয়ের হে হাসনহানা
দুলে যাও আর বুনে বুনে যাও স্বপ্নের মসলিন—
সে তো ভোলে নাক' এই ক্ষ্যা-ধরা দিন।
আমি বৈশাখে খ্যাপা মাঠে আনি লাঙলের তোলপাড়
কবে হবে তার লক্ষ্মীবরণ নতুন লগন্‌সার?
কেউটে-করাল বিজন দুপুরে শ্রাবনের শাওনীয়া,
মড়কের মাঠে মৃত্যুকে ঘিরে অভিনব আহেরিয়া।
বোনা ও ভানার, নীড়ে ও ডানার তাকে বার বার চেনা
তারই আঙিনায় বসাই সাঁঝের হেনা।

মণিমালা, ধিকিধিকি বিষজ্বালে তোমার দুপুর সব কালো হয়ে গেল,
মণিমালা, ঢুলুঢুলু দুটি চোখে নেমেছে অকাল সন্ধ্যা হাজার বছর,
মণিমালা, দিবা নিশা একাকার অন্ধ ক্রোধ পাতালের ভয়াল ছোবল।
পৃথিবী ভুলেছে বুঝি হয়তো অনেক রোদ দ্বীপে দ্বীপে ছড়াল দুপুর।

আখিবিখি ছুটে আসি আজীবন আযৌবন করে যাই আকুলি বিকুলি
আমিই ছিনিয়ে নেব কালকূট অজাগর ফণার পাহারা থেকে মণি,
সেই তো প্রেমের মণি—তারি আলো থমথমে অন্ধকার রেণু করে দেবে,
তোমার বুকের কাছে চলে যাব ভেঙে ভেঙে জটেবুড়ি জটিল কুয়াশা।
তোমার প্রেমের স্বপ্নে আরেকবার উজ্জীবিত হবে এই জীবনের দীঘি
কহ্লারে কুমুদে আর মধুমত্ত ভৃঙ্গরোলে ঢেউ তুলে হবে ঝিকিমিকি।

'কাউয়া করে কল্‌মল্‌ কোকিলে দেবে ধ্বনি,'
কার কন্যা জাগে গো কিসের আগমনী?
হাতের বাজু ঝলসে ওঠে রাঙা হাসির শাঁখা,
রৌদ্রমণি দুচোখ জ্বলে—উঠান ধানে ঢাকা।
কন্যা আসে নতুন দিন লাল সুর্যের টিপ,
পৌষ ফাগুনে মেলা আনবে সোনার জম্বু দ্বীপ।
'কাউয়া করে কল্‌মল্‌ কোকিলে দেবে ধ্বনি'
হৃদয় করে হৃদয় পণ দিবস গুণি, গুণি।

কখনা গম্ভীরা কখনো গাজনের নাচনে মেতেছি
কখনো দম্ভের পাগলা হাতি নামে—সইলাম
দাঁতাল বরাহের মাতাল ব্যভিচার ফলার গেঁথেছি
মহান মিছিলের রঙিন জিম্মাকে বইলাম।
জ্বালাও স্বপ্নের অমর দীপাধার
তোমার হাতছানি ভাঙুক কারাগার
আমার দেশজোড়া সোনার মন্দিরে খোল না নবদ্বার।
টিয়ার পালকের সবুজ শাড়ি পরে বকের পালকের মালা
দুহাতে তুলে দেবে প্রাণের পাত্রকে মদির মহুয়ায় ঢালা—
তুমি কাঙালিনী গাছকে সখি বলে বেঁধেছ আঁধারের ঘর
ব্যথা ও বেদনার ঝাঁঝর করতালে ওঠাবে দীপকের ঝড়।

দেশে দেশে কারাকক্ষে, বক্সার পাহাড়চূড়ে দমদমার রক্তিম দালানে
ভোর থেকে সন্ধে-তক ভরে তোলা হৃৎপিণ্ড দগ্ধ করা ক্লান্তিহীন গানে
তারি ডাক ভেসে আসে। তারি তো দুহাতে খোলা পৃথিবীর শেষ অভিধান,
সে যখন গান করে ফাল্গুনের আশালতা হাসি মুখে বলে তার নাম।
সমুদ্রের দোলনা থেকে দিগন্তের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আকাশের-আঙিনাতে
মেঘের বিরাট শিশু দুকে নিলে নারিকেল বাহুকে বাড়িয়ে। সেই রাতে

রাতের বাউল মাঠে জাগে তার ঘূর্ণিত উল্লোল। স্বৈরিণী পদ্মার বানে
তরঙ্গিনী মাঝি বৌ তার কাছে শেখা সুরে সাড়া দেয় মাঝির আহ্বানে।
কখনো মৃত্যুর লিপি জীবনের সুতীব্র আলোয়, কিংবা জীবনের পাঠ
মৃত্যুর মশালে পড়ি। পৃথিবীর দিশে দিশে আনো শান্তিসন্ধ্যার ললাট
সহস্র বর্ষের শান্তি, বিষণ্ণ মর্মের শান্তি, আঙিনায় চাঁদিনী আলাপে
পরিক্লান্ত সৈনিকের বিধুর সীমান্তব্যথা তোমাতেই সুর হয়ে কাঁপে।

আমি সেই প্রগল্‌ভ্ কিশোর, তুচ্ছ করে মৃত্যু, কাঁটার সঙিন ক্ষত সবি,
হে নন্দিনী তোমারি করুণ হাতে তুলে দিই জীবনের আরক্ত করবী।

আমার মা

সুশীলকুমার গুপ্ত

স্বর্গাদপি গরীয়সী, এত কাছে তবু কত দূর—
আমার সে মাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি;
যার অশ্রুবিসর্জনে সর্বহারা শ্রাবণের সুর,
সবার বসন্ত-শোভা যার ঠোঁটে ফোটে যবে হাসি।

কখনো মা জানালায় বসে দেখে বোমারু বিমান;
দুপুরে কাগজে পড়ে সর্বনাশী যুদ্ধের খবর;—
ক্রুশবিদ্ধ মনুষ্যত্ব, স্বার্থের কুটিল অভিযান,
আণবিক বিস্ফোরণে রক্তাক্ত পৃথিবী থরোথর।

তথাপি আমার মাকে দেখি রত সেলাইয়ের কাজে,—
ছিন্ন ভিন্ন জীবনের রিফু করে; তোলে ফুলপাতা
সোনালি ভোরের মতো আকাশের সাদা মেঘ ভাঁজে;
বাদুর বেড়াল কোলে আদরে বুলায় হাতে মাথা।

বাগানের চারাটিও মায়ের স্নেহের সুধা পায়;
পায়রার ঝাঁক এসে নির্ভয়ে মায়ের হাত থেকে
ধান খেয়ে উড়ে যায়; নিকানো ঘরের আঙিনায়
মা আঁকে আলপনা মৃত্যুধ্বংসের স্বাক্ষর সব ঢেকে।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে আলোকিত করে ইতিহাস;
ঘুমপাড়ানিরা গানে শঙ্খরবে জীবনের স্তব;
রান্নার আওয়াজে আনে আগামীর উদাত্ত আশ্বাস;
প্রাণের নির্মাণ শুধু, দুঃসাহসী শান্তির উৎসব।

তাই ম্লান দেয়ালের বুকে ছায়া ফেলে হিমালয়,
তরাই পাঠায় ডাক, ছাদ হ'য়ে দাঁড়ায় পামির,
ঘরের ভিতের বুকে ভারত সাগর উর্মিময়,
আমারই মায়ের মাঝে ফোটে মহাভারত শান্তির।

শপথ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আমরা দিয়েছি প্রাণ, অনেক অনেক প্রাণ, তবে
শান্ত নদীটির স্নিগ্ধ তীরে তীরে গড়েছি কুটীর,
ডেকেছি প্রিয়াকে কাছে ইসারায় সোহাগ-মদির;
একটি অমর গান ঠোঁটে তুলে অশেষ বৈভবে
বলেছি মানুষ সত্য, হৃদয়ের এক অনুভবে
একে ও অন্যকে ডেকে নির্বিশেষে বিশ্বাস সুস্থির
দিয়ে এঁকে গিয়েছি আলপনা, তবে শান্তির তিতির
সকলের গালে চুমা রেখে গেছে আনন্দে, উৎসবে।

এই বিংশ শতকের ধ্বংসদস্যু নগ্ন হাত ভরে
মৃত্যু-তলোয়ার তুলে ক্ষেতে ছুঁয়ে হানা দেয় ফের,
পাকা ধানে মই দেয়, চুরমার করে বাড়িঘর।
আবার সকলে মিলে অমর এ প্রাণের প্রবাহে
দুহাত বাড়ায়ে ধরে পৃথিবীর বিপদকে রুখে
বসন্ত-কল্যাণ দিয়ে করে-যাবো শান্তিকে অক্ষয়।

রাজধানীর কাহিনী

অনামী

কিছুদিন আগে দিল্লীর খবরের কাগজে (জানি না কলকাতার সংবাদপত্রেও কিনা) এই মর্মের এক খবর বার হয়েছিল: রাজধানীতে শেয়ালের সংখ্যা-শক্তি অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং তাদের যখন-তখন দৌরাত্ম্য এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শৃগাল-নিবহ-নিধনের ভার পড়েছে মিলিটারির উপর। রাষ্ট্রপতি ভবনের বিশাল উদ্যান, লোদী গার্ডেন ও শহরতলী ক্যারলবাগের কাছাকাছি জলাভূমি জম্বুক-বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। নয়াদিল্লীর পৌরসভার এক বিশেষ বৈঠকে অনেক বিশিষ্ট পৌরকর্তা নাগরিকদের অভয় দিয়ে জানিয়েছেন, এই সংকটত্রাণে অগোণে সশস্ত্র সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং জেনারেল কারিয়াপ্পা।

এ-সংবাদে রাজধানীর নাগরিকরা নিশ্চিন্ত হয়ে পরক্ষণেই মুখর হয়ে উঠেছে গুঞ্জনে আর গবেষণায়। এতাবৎ কানে এসেছে গোটা সাতেক মতবাদ। তার সবই আর সমান সরেস নয়। তবু কাকে ফেলে কাকে রাখি এই হয়েছে মুশকিল।

* * *

একদল বলছে:

স্বভাবভীরু ফেরুপালের যখন এমনতর বেয়াড়া বেপরোয়া ভাব, তখন নিঃসন্দেহে তারা স্থানীয় বাসিন্দা নয়। কেন না ষোলো আনা 'লয়েল্' বলে নয়াদিল্লীর বহুকালের একটা নিষ্কলঙ্ক ঐতিহ্য আছে। অতএব বেয়াদবের দল এসেছে অন্য কোথা—অন্য কোথা থেকে। এসেছে যথাস্থানে আর্জি পেশ করতে। ক্ষুধা, বড় ক্ষুধা, পেটের ক্ষুধা! গৃহস্থের ভাঙা বেড়া আজ আরো চওড়া, খিড়কির দরজা আজ আরো দরাজ; হলে কী হবে! মানুষ যেখানে টিঁকে থাকার জন্যে আপ্রাণ করছে শামুক আর হোগলার মূল আর তেঁতুল বিচি আর গুগলি গিলে, সেখানে হাঁস-মুরগীর একগাছা উচ্ছিষ্ট পালক পাবার আশা রাখা বাতুলতার সামিল। তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এরা ভারতের বিভিন্ন নিরন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি হয়ে প্রতি-বিধানের আবেদন জানাতে এসেছে স্বাধীন ভারতের রাজদরবারে।

* * *

আর এক দল হেসে ওঠে। বলে: এ-মত অচল, বড় বেশি কষ্টকল্পিত, সোজা কথায় ভাঁড়ামো। এরা বলছে: আসল ব্যাপার কী জানো? চতুষ্পদ শৃগালকে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছে ভারতের তাবৎ দ্বিপদ বঞ্চক সমাজ। (সংস্কৃত ভাষার পায়ে কোটি নমস্কার। বাসায় এসে অভিধান খুলে দেখি শৃগালের একটি প্রতিশব্দ 'বঞ্চক'।) নিজেদের মতটাকে যুক্তির উপর দাঁড় করাবার জন্যে এই দ্বিতীয় দল

জোর গলায় বলছে : দেখছ না, নানা আকারের আর নানান প্রকারের শেয়াল। কোটি কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি দেনেওয়ালা তাগড়া-তাগড়া খেঁক-শেয়াল থেকে শুরু করে গুঁড়ো হলুদে ইঁটের গুঁড়ো মিশ্রণের করিৎকর্মা পাতিশেয়াল পর্যন্ত সকল দরের সকল স্তরের এক-একজন করে প্রতিনিধি রাজধানীতে এসেছে আমদানি-রপ্তানির আটঘাট আরো বেশি ঠিকঠাক রাখার জন্যে মুঠোমুঠো ধুলিপড়া নিয়ে। পঞ্চাশ সালের বহু লক্ষ বলির রক্তমেদমজ্জা-পুষ্ট কালোবাজারী মসনদ দশ বছরের একটানা অবাধ আধিপত্যের পর হালে ভিতশুদ্ধ নড়ে উঠেছিল বৎকিঞ্চিৎ। বাজার দরে আবার ঊর্ধ্বগতি ফিরে এলেও শঙ্কা তাদের ঘোচেনি এখনো। তাই এ-ডেপুটেশন।

* * *

তৃতীয় দল মুখ বাঁকায় : এ একেবারে উদ্ভট কল্পনা! মানুষের হয়ে তদ্বির করতে শেয়াল আসবে কেন? শৃগালই এসেছে শৃগাল জাতির স্বার্থরক্ষায়। মানব-সমাজের অনধিকার চর্চায় জৌম্বক সমাজের আবহমান কালের কীর্তি ও কৃতিত্ব আজ বিপন্ন। ভাঙা বেড়ার বাহাদুরি আর খিড়কির দরজার চতুরালি আজ আর জীববিশেষের একচেটে হয়ে নেই। বোম্বাই-এর মোবারজী আর মাদ্রাজের রাজাজী থেকে শুরু করে বাংলার রায়-ঘোষ-সেন-মুখার্জি পর্যন্ত যে খেল্ খেলছে ও খেলাচ্ছে, তাতে করে ভীত শঙ্কিত হয়ে গোমায়ু জগতের মুখপাত্ররা রাজধানীতে এসেছে প্রচণ্ড নালিশ জানাতে। স্বভাবধূর্ত শৃগাল জাতির একান্ত নিজস্ব বিশেষত্বটাই যদি এমন করে বেহাত হয়ে যায়, তবে তাদের আর রইল কী?

* * *

এই মতটা মেনে নেবার জন্যে মন যখন লোভে কম্পমান, এমন সময় আর এক দল মাথা নাড়ে : নহে, নহে, নহে।

এরা বলছে : শৃগালরা মশাই নালিশ জানাতে আসেনি কো—এসেছে দাবি জানাতে। তাদের চৌদ্দদফা দাবিদাওয়া। সুলিখিত "চার্টার অব ডিমাণ্ডস্"-এর মুখবন্ধে তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে : "শৃগালত্ব আজ মানবত্বে উন্নীত। আমাদের এতকালের স্থূল কর্মকাণ্ড মানুষের হাতে পড়ে রীতিমতো ফাইন্ আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালে সাধারণ নির্বাচনের কালে শিবাবলীর গায়ে দেখলাম গণ-তন্ত্রের নামাবলী। তারপরেও দেখছি, আজ সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই জম্বুকত্বের জয়জয়কার। তবে আর কেন! মাঝখানের জৈবিক ব্যবধানের বেড়া এবার তুলে দাও। ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। আজ আমরাও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সুশীতল ছত্রছায়াতলে 'সিটিজেন্-শিপ্' চাই—চাই সকলরকম নাগরিক অধিকার। নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাবার অধিকার চাই, হেরে গেলেও বহাল থাকার স্বাধিকার চাই; পারমিট্ আর কন্ট্রাক্ট-সাব্কন্ট্রাক্টের সুযোগ-সুবিধা

চাই, রাতারাতি পুকুর চুরির বখরা চাই—চাই শাঁসালো সরকারী চাকুরি, চাই কন্ট্রোল আর কর্ডনের খবরদারি, জীপ-গাড়ি আর প্রী-ফ্যাব্ বাড়ির আবার নতুন করে ঠিকাদারির ফতোয়া জারি।"

*　　　*　　　*

বেশ একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নয়াদিল্লীর নাগরিকরা বেকুব না কি? সিডিশনের ভয়ডর নেই?

যাক্, তাদের গবেষণা আর বেশিদূর গড়াতে পারবে না। মিলিটারির তোড়-জোড় শুরু হয়েছে। চরমপত্র পৌঁছে গেছে শৃগালকুলের কানে।

শৃগালরাও নাকি চুপ করে বসে নেই। লেটেস্ট্ খবরে প্রকাশ, ঘন ঘন জরুরি সভা ডেকে অবশেষে তারা একবাক্যে সংকল্প করেছে সত্যাগ্রহ করবে। মরতে হয় মরবে, তবু দিল্লী ছেড়ে নড়বে না। মৃত্যু? সত্যাগ্রহীর সত্যোপলব্ধির তো মৃত্যু নেই।

শেষ আবেদনপত্র নিয়ে ক্যারলবাগের জন্মভূমি থেকে পত্রবাহক শৃগাল নাকি সেদিন দিনদুপুরেই রাষ্ট্রপতি ভবনের কোল ঘেঁষে, সেক্রেটারিয়েটের জোড়া ভবনের মাঝখানের গড়ানে পথ বেয়ে একেবারে পার্লামেণ্ট ভবনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। অজানা পথঘাট, অচেনা লোকজন। তবু এরই মধ্যে এক-আধজন চেনা লোকের গন্ধ পায়। পাশ দিয়ে হুশ্ করে ছুটে বার হয়ে গেল কত জমকালো মোটর গাড়ি। বলি-বলি করেও সে বলতে পারল নাঃ হে বন্ধু, আছ তো ভালো। লোভাতুর দৃষ্টি বুলায় চারদিকে। আধুনিক ইন্দ্রপ্রস্থের ইঁট-পাথরের এলাহী কাণ্ড দেখে বেচারা থ হয়ে গেছে। কোন্ দিকে কোন্ পথে কার কাছে যাবে তাই বুঝি ভাবছিল। এমন সময় এক বেরসিক পুলিসের তাড়া খেয়ে মুখের কাগজ ফেলে রেখে দে ছুট্। সেই আবেদনপত্রে নাকি লেখা ছিলঃ

"সংবর, সংবর অস্ত্র! বন্ধ কর ফেরুমেধের আত্মঘাতী আয়োজন। এবকম ট্রাজিডির নজির ইতিহাসে মেলাই আছে। এখনো সময় আছে। এত বড় এক ঐতিহাসিক ভুলের দায়ভাগী হয়ো না।"

*　　　*　　　*

তথাপি নিস্তার নেই। হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না।

এই সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের হাত থেকে অন্তত একটি শৃগালও কি রক্ষা পাবে না? সেই একজনের পেছনেও যদি সশস্ত্র ফৌজ লাগানো হয়, তার সন্ধানেও যদি তামাম ভারতের বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, নালাডোবা আর আঁস্তাকুড় বিলকুল ঘেঁটিয়ে শৃগালবংশ নির্মূল করে দেওয়া হয়, তা হলেও ঐ দিল্লী ফেরৎ সত্যাগ্রহী মরতে মরতেও কি আর এক সগোত্রের কানে তার সত্যোপলব্ধির বার্তা দিয়ে যাবে না? সেই সর্বশেষ শৃগালও কি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে

তাকাতে তাকাতে পলাতে পলাতে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে ভারত সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিলিটারিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে কোনো এক জনশূন্য নির্জন দ্বীপের ডাঙায় উঠে সেই একক শৃগাল-কবি ভাবনেত্রে সুদূরস্থিত নয়া-দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবনের সিংহদ্বারের দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্বের ইথার-তরঙ্গে তার শেষ বিদায়ের বাণী রেখে যাবেঃ শৃগাল-বংশ ধ্বংস করি কী আর করেছ সন্ন্যাসী, ভাবতময় রয়েছে তারা ছড়ায়ে!

'কল্লোল' যুগ ও অচিন্ত্যকুমার

অচ্যুত গোস্বামী

দুই

'কল্লোল'-এর লেখকদের সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা, ভাসা-ভাসা হলেও, করে নেওয়ার পর এবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখার আলোচনা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। 'আমার জন্যই আর্ট' এই কথা বলে এ-কালের লেখকরা আপন আপন ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর যত গুরুত্বই আরোপ করুন না কেন, তাঁরা যে তাঁদের কালের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন চিন্তাধারার দ্বারা সীমায়িত ছিলেন তা এতজন লেখকের চিন্তা ও রচনানৈপুণ্যের সামঞ্জস্য আবিষ্কারের মধ্যেই প্রমাণিত। তবে সেই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার্য যে. 'আমার জন্যই আর্ট' এই নীতিই মানুন আর নাই মানুন, প্রত্যেক লেখককেই আর পাঁচজন লেখকের থেকে আলাদা বলে চিনে নেওয়া যায়। বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমার, যিনি 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যিনি অনেকদিন পর্যন্ত বৃহৎ চতুষ্টয়ের অন্যতম বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, 'কল্লোল'-এর লেখকদের মূল প্রেরণা ছিল মূলত রোমান্টিক; এবং নিঃসন্দেহে নরনারীর যৌন ব্যাপারটা ছিল সেই রোমান্টিসিজমের প্রধান বিষয়বস্তু। অচিন্ত্যকুমারের হাতে এই রোম্যান্টিক প্রেমের চিত্র খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। প্রেম যে মানুষের মনে হঠাৎ অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি এবং দীপ্তি এনে দেয়, তার সর্বগ্রাসী মোহচ্ছায়ায় গোটা পৃথিবীটা যে সাময়িকভাবে নায়ক-নায়িকার সামনে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়, অচিন্ত্যকুমার তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় অলঙ্কার-বহুল ভাষায় তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এই প্রেমের চিত্র অত্যন্ত আবেগময়ী এবং তাতে ভাঁটা না আসা পর্যন্ত তাঁর নায়ক-নায়িকাকে অনুভূতির ঐশ্বর্যে পাঠকদের কাছে অত্যন্ত উচ্চস্তরের জীব বলে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন বইয়ের নায়ক-নায়িকাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে সবিশেষ করে তোলার ক্ষমতার অভাবে. এই প্রেমের চিত্র শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্যের অভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। সে যাই হোক. এই প্রেমের চিত্রের কিন্তু সর্বত্রই এক সময়ে যবনিকা পড়েছে. কোন বিরাট সংগ্রামে পরাজয়ের ফলে নয়, নিতান্তই নায়ক-নায়িকার নিজস্ব মানসিক কারণে; আর স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় সেটা প্রধানত গল্পের প্রয়োজনে।

আর অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসেই হোক্ বা ছোট গল্পেই হোক্, একটি নিটোল নিখুঁত সুঠাম গল্প থাকবেই। বুদ্ধদেব বসুর রচনায় প্রেম যাযাবর-ধর্মী ঃ তাতে উচ্ছ্বাস আর আড়ম্বর যতই থাক, নায়কের ষোলো আনা সত্তা তার মধ্যে তলিয়ে যায় না, অন্তত পাত্রান্তরে পক্ষবিস্তার করবার ক্ষমতাটুকু তার বজায় থাকে; আর এই গতিশীলতার জন্যই বুদ্ধদেবের কাছে গল্পের প্রয়োজন তত বেশি নয়। আর বাস্তবিক বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্প বা উপন্যাস কোন কাহিনীর সূত্রের মাঝখান থেকে যে-কোন একটা অংশ কেটে নেওয়া। প্রবোধ সান্যালের লেখাতেও গল্প আছে, কিন্তু তার গতি সুঠাম নয়; এক-একটা অতি-নাটকীয় ঘটনার ঝাঁকুনিতে সে-কাহিনী এগিয়ে চলে। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের গল্পে একটি সুস্পষ্ট আরম্ভ আছে, একটি সুপ্রসারিত মধ্যভাগ আছে এবং একটি পুনঃসংকুচিত উপসংহার আছে। প্রেমের কাহিনী হিসেবে বোধ করি অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম প্রেম' এবং 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' এই বই দুখানি সবচেয়ে উপভোগ্য; এমন কি, আজকালকার দিনেও এ-বই দুখানি প্রথম পড়তে গেলে খুব খারাপ হয়তো লাগবে না। এ বই দুখানিতেই সুস্পষ্টভাবে নায়ক-নায়িকার প্রথমেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদের মধ্যে এসেছে দুকূলপ্লাবিনী প্রচণ্ড প্রেমের বন্যা যা তাদের নিজেদের সীমাকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদের অজস্রতার মধ্যে প্রসারিত জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আবার শেষে এক সময়ে সামান্য কারণে তারা নিজেদের সীমা বুঝতে পেরেছে আর প্রেম বিসর্জন দিয়ে 'প্রথম প্রেমে'র নায়ক ভালো মানুষের মতো সাধারণ একটা চাকরির মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' বইতে অবশ্য প্রেমের পরিসমাপ্তি টানা হয়নি, কিন্তু নায়ক-নায়িকা উভয়েই যে পুনর্মূষিক হচ্ছেন তার আভাস আছে।

'ঊর্ণনাভ' 'তৃতীয় নয়ন' 'ছিনিমিনি' প্রভৃতি কয়েকখানি বইতে এই প্রেম আবার নিছক সরলরেখাত্মক নয়। সেখানে একটি ত্রিভুজাকৃতি সংগ্রামের মধ্যে ঈর্ষা, অধিকার-অর্জনের দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে প্রেমের ক্ষেত্রটি আরো জটিল এবং নাটকীয় হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষ পরিণতিটা কিন্তু সেখানেও রোমাঞ্চহীন, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ হতে একেবারে সরাসরি সমতলভূমিতে পতন। 'তৃতীয় নয়ন' বইটিতে যেমন নায়িকা মিনতি তার দয়িত মিহির অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রথমটায় তাকে আরো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করে অন্ধ মিহিরের কাছে নিজে তৃতীয় নয়ন হিসাবে কাজ করে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল; কিন্তু ক্রমশ তার বাস্তব বুদ্ধি এই রোমান্টিক প্রেরণার ঊর্ধ্বে উঠে এল এবং একটি না-চতুর না-স্বাভাবিক ঘটনার মারপ্যাঁচের ভিতর দিয়ে মিনতি শেষে মিহিরকে ত্যাগ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিত্তবান্ সতীশকে গ্রহণ করল। এই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত রোমান্টিসিজমের আত্মসমর্পণ, মনে হতে পারে মানুষের মনে ফ্রয়েড যে সুখসর্বস্বতা-নীতি pleasure principle-এর বাস্ব-নীতি

reality principle-এর স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, এগুলো আসলে সেই মনস্তত্ত্বেরই স্বীকৃতি, এবং সেই হিসাবে অচিন্ত্যকুমার একজন বস্তুতান্ত্রিক। এ-ও বলা চলতে পারে যে, আমাদের আশেপাশের অধিকাংশ প্রেমঘটিত ব্যাপারেরই এই পরিণতিই তো ঘটে থাকে। এবং এই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার খুব সরস এবং সংক্ষিপ্ত ফরমুলা পাওয়া যাবে অচিন্ত্যকুমারের 'অবশ্যম্ভাবী' গল্পে। মোটা মাইনের চাকুরে নায়কের একজন উচ্চশিক্ষার্থী প্রেমিকা। নায়ক অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকায় প্রেমিকাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক; মেয়েটিব একটি অবাঞ্ছিত বিয়ে হল। নায়কও প্রচুর যৌতুকের বিনিময়ে একটি স্বল্প-শিক্ষিতা তরুণীকে বিয়ে ক'রে সংসার-তরণীতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। এই হচ্ছে আদর্শ আধুনিক রোমান্স। প্রেমের জন্য নায়ক-নায়িকার মনে কোন বড় রকমের ত্যাগস্বীকারের বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার প্রস্তুতি নেই; এমন কি জীবনের এত বড় একটা স্মরণীয় ঘটনায় ব্যর্থতায় জীবনে এতটুকু একটু আঁচড়ও লাগছে না! প্রশ্ন উঠতে পারে শরৎচন্দ্রের দেবদাস যে তুচ্ছ একটা প্রেমের জন্য একটা উজ্জ্বল জীবনকে নষ্ট হতে দিল সেইটেই কি আদর্শ, না তা হামেশা ঘটে থাকে? আদর্শ না হতে পারে, খুব বাস্তবও না হতে পারে, কিন্তু মানুষের এই সামান্য স্বাধীন প্রেমের দাবিটুকুও কূপমণ্ডূক সমাজ স্বীকার না ক'রে মানবমনের উপর যে গুরুতর অবিচার করছে, সেই জিনিসটাকে তো অত্যন্ত রূঢ় স্পষ্টভাবে উপস্থিত করা গেল। আর এটাও স্মরণ রাখা দরকার গড়পড়তা বাস্তবতার চেয়ে অর্থপূর্ণ (cignificant) বাস্তবতার মূল্য যে-কোন ভাল লেখকের কাছে অনেক বেশি। মহৎ প্রেম, বিরাট প্রচেষ্টা বা সম্ভাবনা অচলায়তন সমাজ-প্রাচীরের গায়ে লেগে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, এই মহৎ ব্যর্থতাই শেকসপীয়র থেকে রোমাঁ রলাঁ পর্যন্ত যে-কোন শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া-ধর্মী সাহিত্যকে মর্মস্পর্শী ক'রে তুলেছে। যে জন্য শেলী বলেছেন 'our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts!' অবশ্য আজকের দিনের মনও অনেক জটিল, জীবন-প্রবাহ আরও জটিল, তার মধ্যে এই ব্যর্থতার রূপ নিশ্চয়ই দেবদাসের মতো হবে না। কিন্তু প্রেম নিবে গেলে তার ছাইটুকু পড়ে থাকবে না এমন রোমান্স বলা বা শোনা নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত এ-কথাও উল্লেখ করা দরকার যে অচিন্ত্যকুমারের এইসব এবং অধিকাংশ বই-ই একেবারেই বাস্তবপন্থী নয়; কারণ রোমান্সের পরিণামে যাই হোক, সেইটুকু নিয়েই তো গল্প আর লেখকের যত ভাষাগত কেরামতি। আসল কথা, রূপেরসে সমৃদ্ধ আড়ম্বরপূর্ণ রোমান্সের এই পরিণতি বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় আস্থাহীন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া চিন্তাধারার প্রথম পদপাত।

অচিন্ত্যকুমারের এইসব প্রেমচিত্রে বিদ্রোহাত্মক কিছু নেই: অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে প্রেমের বহু সার্থকতর ও বিচিত্রতর চিত্র ইতিপূর্বেই বাঙলা সাহিত্যকে

সম্বন্ধ করেছে। এবং বুদ্ধদেবের যাযাবরী প্রেমের চিত্র বিষয়বস্তু হিসাবে বিদ্রোহাত্মক, যদিও শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' বা 'চরিত্রহীনে'র মতো এটাকে কোন নতুন সমাজদর্শনের মালমশলা হিসাবে লেখক উপস্থিত করেননি। অচিন্ত্যকুমারেরর মধ্যে যা-কিছু অভিনব সে শুধু সাহিত্য-রীতিগত। বাঙলা সাহিত্যে আগে মুখ ছাড়া নারীদেহের বর্ণনা, বা প্রেম-ব্যাপারের কেন্দ্রস্থল শরীর হলেও প্রেমে শারীরিক ক্রিয়ার বর্ণনার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। অচিন্ত্যকুমারের এইসব বইতে সেই হংস-মার্গকে পরিহার করার চেষ্টা আছে। তা ছাড়া এই প্রেমে জাতিধর্মের প্রশ্ন বা অভিভাবকদের সম্মতির অনুপস্থিতি, এবং তার বেপরোয়া অকুণ্ঠ প্রকাশ বিদ্রোহলক্ষণাত্মক।

আর আছে ভাষা নিয়ে অনেক অভিনব পরীক্ষা করার চেষ্টা। বিচিত্র উপমা ও অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করে ভাষার মধ্যে অধিকতর অর্থময়তা সৃষ্টির প্রয়াস অচিন্ত্য-কুমার তাঁর প্রথম জীবনের লেখায় অনেক করেছেন। 'প্রেতায়িত ঠাণ্ডা' মধুর অশারীরিকতা' 'অন্ধকারের মত শাদা' 'স্থিতিমান নিস্তব্ধতা' 'তার সমগ্র দৃশ্যমানতায় বর্ণরাগের একটি রূঢ় প্রগল্‌ভতা' 'সময়ের মোড়ে মোড়ে মুটিনের রূঢ় সঙীন'—ইত্যাদি অনেক ভাষার কারিকুরি নেহাত বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা বলে পরে আর তার কোন অনুকরণ দেখা যায়-না। অচিন্ত্যকুমারের আরেকটা প্রচেষ্টা ছিল ইংরেজি ভাষার শব্দ-বিন্যাসের কায়দাকে বাঙলায় স্থান দেওয়া। পরবর্তীকালে এ-প্রচেষ্টারও কোন অনুকরণ দেখা যায়না। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের কোন কোন কায়দা সত্যিই অর্থময় এবং তার অনুকরণ করে পরবর্তী অনেক লেখক লাভবান হয়েছেন। যেমন 'অক্ষরের নির্ভুল পারম্পর্য' 'অমিত অতিশয়তা' ইত্যাদি। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি একমাত্র সাহিত্যরীতির দিক দিয়ে এবং ভাষার দিক দিয়ে কল্লোলের লেখকরা যে-অভিনবত্ব এনেছেন বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা-ই তাঁদের প্রধান অবদান।

সরল-রেখাত্মক প্রেম এবং ত্রিভুজাত্মক প্রেম নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের লেখা দুই শ্রেণীর উপন্যাস ও গল্পের আলোচনা করা গেল। অচিন্ত্যকুমারের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বিবাহ-পরবর্তী জীবনের জটিলতা নিয়ে লেখা, এবং এই শ্রেণীতে অনেক-গুলো বই আছে। 'ইন্দ্রাণী', 'জননী জন্মভূমিশ্চ', 'নেপথ্যে', 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ' 'আসমুদ্র', 'প্রাচীর ও প্রান্তর' প্রভৃতি অনেকগুলো বই এই শ্রেণীতে পড়ে। স্বভাবতই এই সব বইয়ে সাহসিকতাপূর্ণ অবৈধ প্রেমের কাহিনী উপস্থিত করার সুযোগ-সুবিধা কম; বিবাহ-পরবর্তী জীবনের মধ্যে রোমাণ্টিক আখ্যান সৃষ্টি করাও অসুবিধাজনক। অচিন্ত্যকুমার তাই বলে যৌনসমস্যা ছাড়া এই সব বইয়ে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এ কথা মনে করলে তাঁর রোমাণ্টিসিজমের উপর অবিচার করা হবে। নিতান্ত সাধারণ পরিবেশের মধ্যেও রোমান্স আবিষ্কারই যদি করতে না পারলেন, আর সেই পরিবেশকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যদি একটা বিকৃত যৌনসমস্যাই সৃষ্টি করতে না পারলেন তো অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব কোথায়।

'আসমুদ্র'-তে স্বামী-স্ত্রীর প্রচণ্ড প্রেমের রোমান্স শেষে অভ্যাসে পরিণত হয়ে তবে শালীনতা প্রাপ্ত হল; তখন স্ত্রীর বান্ধবী এলেন যতটা না স্বামীর সঙ্গে নতুনতর রোমান্স সৃষ্টি করতে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস-মন্থর রোমান্টিক জীবনে এবারে বিকৃত মানসিক সংঘাত সৃষ্টির প্রয়োজনে। 'প্রাচীর ও প্রান্তরে' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বিকৃত সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের বাঙলা সমাজের অতি-পরিচিত দেবরই যথেষ্ট বলে গণ্য হয়েছে। 'নেপথ্যে'র মধ্যে এই সংঘাত সৃষ্টির জন্য কোন জীবন্ত মানুষেরই দরকার হয়নি, মৃত সপত্নীই যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিনী। 'দিগন্ত', 'নায়ক-নায়িকা' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্পেও এই ধরনের স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক বৈচিত্রের চিত্র দেখানো হয়েছে। বিবাহিত জীবনে ঈর্ষাটা এমনি সনাতন জিনিস, যার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বলা চলে এটা আগেও ছিল, এখনো আছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও অনেকদিন পর্যন্ত থাকবে—যে তাকে কোন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু করে তার মধ্যে কোন সামাজিক আবেদন সৃষ্টি তো দূরের কথা, সাধারণ রকমের কোন উপভোগ্য কাহিনী বা 'কল্লোল'-এর লেখকদের প্রিয় ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কারিকুরি দেখানোও শক্ত। আসল কথা, প্রচলিত সমাজনীতির সঙ্গে কোন সংঘর্ষে না গিয়ে, নতুন কোন আধুনিক সমাজ-দর্শনকে উপস্থিত করার দায়িত্ব স্বীকার না করে, নরনারীর যৌন-ব্যাপারে যত-রকমের বিচিত্র ঘটনা ঘটা সম্ভব, অচিন্ত্যকুমারের রোমান্টিক মন তাই আবিষ্কার করাতেই পরম আনন্দবোধ করেছে। এটা একবারও তিনি মনে করেননি যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনে মৃত সপত্নী (যেমন, 'নেপথ্যে'র মধ্যে) বা মৃত পূর্বস্বামী ('নায়ক-নায়িকা'য়) যদি বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় তো তাতে সমাজের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-ধারারই সমর্থনে নতুন যুক্তি তৈরি হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অচিন্ত্যকুমারের দু'একখানা বইতে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে, এক সময়ে বেশ একটি সামাজিক সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই সময়ে নিজের মনের রোমান্টিক কল্পনার খেয়াল অনুযায়ী প্লট না সাজিয়ে লেখক যদি বাস্তব-পন্থী হতেন তো মধ্যবিত্ত জীবনের সুন্দর বাস্তব চিত্র উপস্থিত হতে পারত। 'ঢেউয়ের পর ঢেউ' বইখানাই ধরা যাক। সংসার-বিরাগী স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, স্ত্রী ফিরে এল পিত্রালয়ে। স্বামী-সঙ্গ-বঞ্চিত স্ত্রীর এই যে সমস্যা এটা বাঙলা দেশের একটা সামাজিক সমস্যা,—এই স্ত্রী না শ্বশুর-বাড়ি, না বাপের বাড়ি কোন সমাদর বা পরিতৃপ্তি পায়; এই পরিবেশের মধ্যে আধুনিক স্ত্রী হয়তো তার নিজস্ব কোন পথ খুঁজে নেওয়ার বিপদ-সঙ্কুল চেষ্টা করতে পারে। অচিন্ত্যকুমার কিন্তু তাঁর কাহিনীর এই বস্তুতান্ত্রিক সম্ভাবনার দিকে একেবারেই যাননি; স্ত্রীর পরিবেশটিকে তিনি প্রায় উপেক্ষা করে গেছেন। সামাজিক সমস্যাটি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মানসিক অতৃপ্ত যৌন-সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে; যে-স্ত্রী

স্বাভাবিকভাবে স্বামী-প্রেম পেল না তার যে-কোনভাবে যে-কারো-কাছে প্রেম পাওয়ার কাঙাল-পনার মধ্যে কাহিনীটি সমাপ্তির দিকে গিয়েছে। 'প্রাচীর ও প্রান্তরের' মধ্যে বিত্তবান নায়ক হঠাৎ বিত্তহীন হয়ে জীবন-সংগ্রামের নিষ্করুণ পরিবেশের মধ্যে তার কঠিন পদস্খলন হল। বাইরের কঠিন জগতে মানসিক বিরামের কোন সুযোগ না পেয়ে তার উপবাসী আত্মা স্ত্রী-দেহের অতিসম্ভোগের মধ্যে সেই বিরাম পেতে চাইল। এই দেহসর্বস্বতায় স্ত্রী যথোচিত সাড়া দিতে পারল না। এইখানে মধ্যবিত্ত পুরুষের যে অতি-পরিচিত রূপ, বাইরে শোষিত এবং ঘরে শোষক,—তার একটি চমৎকার কাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ ছিল। কিন্তু যৌনসর্বস্ব লেখক সে দিক দিয়ে না গিয়ে শুধু যৌনপ্রেমের নানা বিকৃত রূপান্তরের বর্ণনায় বইখানাকে ভারাক্রান্ত করেছেন। স্যাডিজমের এই ফেনানো ফাঁপানো কাহিনী পাঠকদের কাছে না হোক—লেখকের কাছে নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। 'ইন্দ্রাণী' আর 'জননী জন্মভূমিশ্চ' এই দুখানি বইতে রক্ষণশীল পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌন-জীবনের বিকাশে যে বাধার সৃষ্টি হয় তার কতকটা বস্তুতান্ত্রিক চিত্র আছে। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বই দু'খানি একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছে।

অচিন্ত্যকুমারের এই তিন শ্রেণীর গল্প এবং উপন্যাস সম্পর্কেই সাধারণভাবে বলা চলে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক ইচ্ছে করলেই যে-কোন ছোট গল্পকে উপন্যাসের আকার দিতে পারতেন, আবার যে-কোন উপন্যাসকেও সংক্ষিপ্ত ক'রে ছোট গল্পের পরিসরে নিয়ে আসতে পারতেন। অচিন্ত্যকুমার সব সময়েই একটি শোভন গল্পের ভক্ত, একথা আগেই বলেছি। এই গল্পের মালমশলা একটি সুন্দর ছোট গল্পের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরের জন্য পর্যাপ্ত একটি পটভূমিকা এবং একটি পরিবেশ সৃষ্টির মতো মালমশলা এই গল্পে নেই। সেইজন্যই অচিন্ত্য-কুমারের উপন্যাসগুলি প্রায়ই ফেনানো ফাঁপানো।

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', 'আকস্মিক' এবং বোধ করি আরও এক-আধখানা উপন্যাস ও ভিখিরী, সার্কাসের মেয়ে ইত্যাদিদের নিয়ে লেখা কয়েকটি ছোট গল্পকে একটি স্বতন্ত্র চতুর্থ শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করা যায়। অবহেলিত শ্রেণীকে নিয়ে লিখলেই বস্তুতান্ত্রিক রচনা হয় এই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই লেখাগুলোকে বস্তুতান্ত্রিক না বললে অনেকে হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। 'বেদে' বইখানা প্রকাশিত হওয়ার পরে দেশের সুধীমহল বইখানাকে অভিনন্দিত করেন; এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রশস্তি-বাণী উচ্চারণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বইখানা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ—সমগ্র অচিন্ত্য-সাহিত্যের একটি স্মরণীয় কীর্তি; কাজেই পাঠকমহল যে বইখানা পড়ে লেখক সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন তার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। পাঠকমহলের সে-আশা লেখক কোনদিনই পূরণ করেননি। 'বেদে' বইতে মার্জিত রুচিবান্ নায়ক (পরে তিনি উচ্চশিক্ষিত-ও হন,

কতকটা অবস্থার চাপে এবং কতকটা নিজের যাযাবর মনোবৃত্তির জন্য পরিব্রাজকের মতো নানারকম বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো দাতব্য আশ্রমে, কখনো চায়ের দোকানের বয়দের মধ্যে, পরে বড়লোকের-বাড়িতে চাকর-বাকর-মহলে, গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এবং পরিশেষে কলকাতার বস্তি-জীবনে। যাযাবর নায়ক তার যাযাবরী প্রেমের খোরাক হিসেবে প্রতিক্ষেত্রেই একটি নায়িকা সন্ধান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু নায়কের এই যাযাবর প্রবৃত্তি কেন? সে-সমাজের নিচের তলার লোকদের দুর্দশার কারণ অনুসন্ধানেও উৎসাহী নয়, সে সমাজ সংস্কারকও নয় বা পরোপকারের প্রেরণাও তার নেই। শুধু বিচিত্র পরিবেশে বিচিত্র মানবমনের বিচিত্রতর প্রকাশভঙ্গি দেখে বেড়ানোতেই তার সব জায়গাতেই সে প্রেম করছে, কিন্তু কোন প্রেমেই সে জড়িয়ে পড়ছে না : বহুবর্ণের পৃথিবীতে সে একজন পরিব্রাজক, নির্লিপ্ত কবি। কাজেই এই বইয়ের বহু চরিত্র, বহু ঘটনাসমাবেশ শুধু রস-বৈচিত্র্য আবিষ্কারের রোমান্টিক তাগিদ ছাড়া আর কিছু নয়।

'আকস্মিক' বইখানা এত স্পষ্টত রোমান্টিক নয়। সেখানে কোন মধ্যবিত্ত মনের ও রুচির নায়ক নেই। কিন্তু সেখানেও ঘন-ঘন পরিবেশের পরিবর্তন, যৌন-সমস্যার আধিক্য (যদিও নিচুস্তরের লোকদের জন্য লেখক একটু বর্বরতর প্রেমের ব্যবস্থা করেছেন), লেখকের একই মূলগত রোমান্টিক মনোভাবকে প্রকাশ করে। ছোট গল্পগুলিও রোমান্স-প্রধান; অনেক ক্ষেত্রে আবার ভদ্রলোক নায়ক এবং বস্তির নায়িকা। বোঝা যায় প্রেমের গল্পের একঘেয়েমি দূর করবার জন্য লেখক বস্তি-জীবনের সাহায্য নিয়েছেন। তবু বাঙলাসাহিত্যে অবহেলিত শ্রেণীকে এই স্বীকৃতিদানের মূল্য যে অনেকখানি এবং এটা যে লেখকের প্রগতিশীল দিকের প্রকাশ তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই কালে যে ক'জন লেখক অবহেলিত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শুধু 'পুতুল ও প্রতিমা' নামক বইতে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি ছোট গল্পের জোরে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। কোন নিপুণতার সমাজবিশ্লেষণ বা উচ্চস্তরের জীবনবোধ যে তাঁর ছিল তা নয়। রোমান্টিসিজমের সীমার মধ্যে তিনিও আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু রোমান্টিসিজমের শ্রেষ্ঠ গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন, তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি-বোধ এবং অনির্দেশ্য হলেও তীব্র প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিকার কী তিনি জানতেন না; কার কাছে প্রতিবাদ করতে হবে তাও স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা পড়তে পড়তে পাঠককে ক্ষণকালের জন্য হলেও মনে করতে হবে এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের লেখায় এই প্রতিবাদ তো নেই-ই, গভীর সহানুভূতিরও অনেক সময়ে অভাব,—আর একটা জগতের কাহিনী পড়ছি এই পর্যন্ত শুধু মনে হয়।

মোটামুটিভাবে চার শ্রেণীতে ভাগ ক'রে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম পর্যায়ের রচনার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল তার মধ্যে তাঁর অনেক লেখারই উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও বুদ্ধিমান পাঠক নিঃসন্দেহে সেগুলোকে এই চার শ্রেণীর কোন-না-কোন জায়গায় তালিকাভুক্ত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। অতঃপর পরিণত মন নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা পুর্ণোদ্যমে শুরু করার আগে অচিন্ত্যকুমার তাঁর মফস্বল-জীবনের অভিজ্ঞতার সীমার অন্তর্গত মার্জিত চেহারার আর অমার্জিত এবং অসামাজিক মনের বিচিত্র অফিসিয়াল শ্রেণীকে নিয়ে 'ইনি আর উনি', 'খাই-খালাসী', 'অতিরিক্তবাবু' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প লেখেন। অতঃপর ঠিক কোন্ সময়টা যে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা আরম্ভ করেন বলা শক্ত। কিন্তু এবারে তাঁর লেখার চেহারা একেবারে পরিবর্তিত। এবারে তিনি যে শুধু অবহেলিত শ্রেণীর থেকে চরিত্র আর বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন তাই নয়, পরিবর্তিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য ভাষাকেও তিনি অলঙ্কার আর আড়ম্বরের আকাশ থেকে গ্রাম্যতার মাটিতে নিয়ে এসেছেন। শুধু যে গ্রাম্য কথোপকথনই জুড়েছেন তাই নয়, তাঁর নিজের বর্ণনাতেও 'কেরদানি', 'ধেয়ে নাচুনি', 'চিকনচাকন' 'লদপদ', 'আচম্বা' প্রভৃতি নিতান্ত গ্রাম্যভাষার প্রচলিত কথা ব্যবহার করেছেন।

এই অতি বাস্তববাদী ঢঙের লেখার পরিমাণ খুব বেশি নয়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা 'যতন-বিবি' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প; সাম্প্রতিককালের সমস্যা নিয়ে কাঠ, কেরোসিন, বস্ত্র, চাবাড়ুবা প্রভৃতি কয়েকটি গল্প; খানদুয়েক শিশু উপন্যাস, 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' আর 'পাখনা' এই বোধকরি মোটামুটি সম্পূর্ণ তালিকা। এ ছাড়াও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের কাহিনী নিয়ে লেখা দুখানি উপন্যাস, 'যার যদি যাক' আর 'যে যাই বলুক'-ও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

গল্পগুলো পৃথিবীর ইতিহাসের করুণতম নিষ্ঠুরতম কতকগুলো ঘটনার নগ্ন, রূঢ়, বীভৎস ছবি। এই নিরবয়ব বীভৎসতাকে লেখক যেভাবে বাহুল্যবর্জিত ভাষায় সংযত উচ্ছ্বাসে বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় বর্তমানের পৃথিবী এমনি নির্দয় যে কল্পনাবিলাসী লেখককেও তাঁর নিভৃত কোণ থেকে টেনে এনে ফুটপাথে না নামিয়ে সে ছাড়েনি। লেখক যেন তাঁর সযত্ন-রচিত কোঁচা খুলে ফেলে সে পড়তি কাপড়টুকু কোমরে বেঁধে সাধারণ মানুষের মাঝখানে নেমে এসে বলছেন, আর কল্পনা নয়, আর যৌনসর্বস্বতার বিলাস নয়, এবার কঠিন বাস্তবই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

গল্পগুলি কিন্তু রসসৃষ্টি হিসাবে ভাল উতরোয় নি। এগুলো যেন পুরো গল্প নয়,—গল্পের উপাদানমাত্র। চরিত্রগুলো বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি; বিচ্ছিন্ন ঘটনা-গুলোর সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের যোগসাধন হয়নি। বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে

গল্প হয়; একটি গল্পে সমাজের পূর্ণ চিত্র দিতে হবে এ-ও জুলুমের কথা। কিন্তু লেখককে তো শুধু তাঁর গল্পবিশেষ নিয়ে বিচার করা চলে না, বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্রতায়; কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের এইকালের সমস্ত লেখা পড়েও সমাজ সম্বন্ধে আর একচুলও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন গল্পেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোন ছোঁয়াচ নেই। কিন্তু 'কাঠ' 'কেরোসিন' প্রভৃতি দু'একটা গল্পে লেখক কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ক'রে ব্যঙ্গ করেছেন। সরকারী অব্যবস্থা আর অসামর্থ্যে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বড় জোর ঘরে বসে দুটো গল্প লেখাই বোধ করি লেখক ভাল মনে করেন; তার অতিরিক্ত কিছু করতে গিয়ে কেউ শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা সৃষ্টি করলে লেখকের সুকুমার মনে তাতে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয় বৈকি!

'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি গোঁয়ার চাষার ছেলের একটি চাষার বৌয়ের প্রেমে পড়ে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করার ব্যর্থ চেষ্টা। 'পাখনা'তে স্বামীপরিত্যক্ত এক মুচির মেয়ে বেশ্যা হয়ে আর বৈষ্ণবীর ভেক ধরে যে কী অসাধ্য সাধন করল তার কাহিনী। বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশভঙ্গি থাকলেও, পরিবেশের খুঁটিনাটি পরিচয় থাকলেও, এ-গুলোও উপন্যাস হয়নি, বড় জোর উপন্যাসের উপকরণ বলে দাবি করতে পারে। ছোট গল্পগুলোতে তবু বর্তমান সমাজে রক্তমাংসবর্জিত কতকগুলো টুকরো হাড় সংগ্রহের চেষ্টা আছে, কিন্তু এ-উপন্যাস দুখানিতে তো মনে হয় 'কল্লোল' যুগের ভূত আবার লেখককে তাড়া দিতে শুরু করেছে। আবারও বলি, অবহেলিত শ্রেণীকে নিয়ে লিখলেই, অনতিরঞ্জিত ঘটনা যোজনা করলেই আর পরিবেশ অনুযায়ী খুঁটিনাটির বর্ণনা থাকলেই লেখা বস্তুতান্ত্রিক হয় না। অর্থময় ঘটনা যাতে সমাজের অন্তরীক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ হয়, যাতে সমাজের গতি ও প্রকৃতিকে জানা যায় বোঝা যায় চেনা যায়, আর সত্যিকারের রক্তমাংসের সমগ্র মানুষ,—এই দুই ন্যূনতম উপাদানকে সংযোজন করতে পারলে তবে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য হয়। প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়েও অচিন্ত্য-কুমার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

'যায় যদি যাক' আর 'যে যাই বলুক' বই দুখানিতেও লেখকের ঘাড়ে 'কল্লোল' যুগের ভূত চড়াও করে বসে আছে বলেই মনে হয়। 'যে যাই বলুক' বইখানা রাজ-নৈতিক পটভূমিকায় শুরু হলেও অল্প পরেই রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তা ছেড়ে নায়িকা অধঃপতিত নায়ককে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বর্গমর্ত্য ঘুরে বেড়িয়েছে। একটু রাজ-নৈতিক কর্মের গন্ধ দিয়ে 'যুগোপযোগী' করার চেষ্টা করা হলেও এ সেই পুরোনো যৌনসর্বস্বতা।

অচিন্ত্যকুমারের দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখাগুলো পড়ে মনে হয়, কী দেখে যেন আকৃষ্ট হয়েছিলাম কী যেন আশা করেছিলাম, অথচ তা পেলাম না।

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যপ্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁর সর্ব-শেষ রচনা 'পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'-র উল্লেখ না করলে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারের সম্পূর্ণ পরিচয়ের অনেকখানিই বাদ থেকে যায়। উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় এই ধর্মমূলক গ্রন্থটির নিজস্ব গুণাগুণের বিচার অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই বইখানি আত্মপ্রকাশ করার ফলে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পীমানসের ক্রম-পরিণতির যে-চিত্রটি আজ সম্পূর্ণতা লাভ করল তার তাৎপর্য কোনক্রমেই অবহেলা করা যায় না। একই লেখকের হাতে প্রথম পর্যায়ের রোমান্স-প্রধান সাহিত্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তব-প্রধান গল্প-উপন্যাস, এবং এই সবশেষ রচনা রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ যে আসলে বারবার ক'রে লেখকের মানসের কোন দিক্ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না, বরং তা যে লেখকের দুর্বল অপরিপুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য পরিণতি, সেটুকু আলোচনা করেই এ-প্রবন্ধের উপসংহার টানা চলবে।

'কল্লোল' যুগের অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে বিদ্রোহের একটা সুর ছিল বটে, কিন্তু তার কোন পরিপূর্ণ রূপ ছিল না। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-বুর্জোয়াধর্মী যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, যার ফলে আমাদের সামাজিক জীবনের অসঙ্গতি, অচিন্ত্যকুমারের মনে সেই বিশ্লেষণটা ছিল অনুপস্থিত। তার ফলে, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিসের জন্য বিদ্রোহ, বিদ্রোহের লক্ষ্য কী—অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে এসব প্রশ্ন স্পষ্ট করে দেখা দেয় নি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রশরৎপ্রতিভার সমাচ্ছন্ন বাঙলাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির একটি বিকল্প পন্থার সন্ধানেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনির্দেশ্য অসন্তোষকে যৎসামান্য কাজে লাগিয়েছিলেন।

মন্বন্তরের কালের, এবং তৎপরবর্তী কয়েক বছরের অতি-উৎকট অর্থনৈতিক সংকট আরও অনেক লেখকের মতো অচিন্ত্যকুমারের মনকেও নাড়া দিয়েছিল। সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মনে যে অনির্দেশ্য অসন্তোষটুকু ছিল, যার ফলে প্রথম পর্যায়ের লেখাতেও তিনি অবহেলিত শ্রেণীকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি, সেই অসন্তোষই সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সামনে তাঁকে সমাজবিমুখ হয়ে থাকতে দেয়নি। বরং এই সংকটকালীন বীভৎসতা তাঁর স্পর্শকাতর মনকে এমনভাবে নাড়া দিল যে এই সর্বপ্রথম রোমান্স বর্জন ক'রে পুরোপুরি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্প লিখলেন তিনি। তাঁর বিদ্রোহ তাই বলে এবারও কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে পারল না। সাধারণ মানুষের কাহিনী সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি প্রকাশ করলেন বটে; কিন্তু যে অসাধারণ মানুষেরা অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে যে-বিপর্যয় টেনে আনল, এবং সেই অসাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ অচেতন মানুষরাও যে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেল, অচিন্ত্যকুমার সে সবের খবর জানতেন না। ফলে তাঁর গল্পগুলো পুরোপুরি রক্তমাংসের গল্প হল না, হল গল্পের

কাঠামো। তাদের মধ্যে পাঠকের মনে খানিকটা সহানুভূতি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন গভীরতর আবেদন কোন সম্পূর্ণতর জীবনবোধ প্রকাশ পেল না। এরা যেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে অভিযানের জন্য রচনা-করা ছড়া।

এবং জীবনবোধের এই অসম্পূর্ণতারই অবধারিত পরিণতি হিসাবে অচিন্ত্য-কুমার শেষে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠলেন। শুধু চোরা কারবার নয়, মানুষের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে সুদূরপ্রসারী কারণ রয়েছে, তা আবিষ্কার করতে না পেরে, এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামে এবং পরিণামে সাফল্য সম্ভব, তা বিশ্বাস করতে না পেরে উপর তলার বাসিন্দা অচিন্ত্যকুমার শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। 'Man does not live by bread alone'—শুধু খাওয়ার জন্যই তো মনুষ্যজীবন নয়—মানুষের আরও উচ্চতর আদর্শ আছে, এবং তার মধ্যে উচ্চতম হল নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতা। কল্লোল যুগের প্রিয় ইংরেজ লেখক আলডুস হাক্সলীর মতো অচিন্ত্যকুমারও পীড়িত হৃদয় নিয়ে একদিন এই পলায়নী মনোবৃত্তির সত্য আবিষ্কার করে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন, এবং রামকৃষ্ণ-কাহিনী লিখতে বসে গেলেন। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন খাওয়া-পরার সমস্যারই যারা সমাধান করতে পারে না, তারাই তো চিরকাল বড় গলায় অনাহারী, নগ্ন মানুষের সামনে উচ্চতর আদর্শের এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার জয়গান ক'রে থাকে চিরদিন।

কামরু আর জোহরা

সোমনাথ লাহিড়ী

কামরুন্নেসা আত্মহত্যা করাই স্থির করল।

মানুষের আত্মহত্যা করার কারণ সম্বন্ধে নানান্ মত আছে। সেই জন্যেই কারণটা ঠিক করে বলা শক্ত। সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হওয়ায় লোকে আত্মহত্যা করে বসে, এ হ'ল ডাক্তারদের মত। কিন্তু কামরুন্নেসা ওরফে কামরুর মাথা খারাপ হয়নি। অন্তত কামরু তা মনে করে না। মাথা খারাপ হলে, ও ভাবে, ও বেঁচে যেত, দুশ্চিন্তার তিলে তিলে জ্বলতে হত না। আত্মহত্যাও করতে হত না।

অবশ্য ডাক্তারী মত সকলে মানে না। আগে যাঁরা আমাদের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁদের মত অন্যরকম। আত্মহত্যার চেস্টা করলে তাঁরা দু-মাস জেল দিতেন—বলতেন, যে আত্মহত্যা করতে পারে, সে সব-কিছু গোনাহ্ করতে পারে। কামরু কিন্তু আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন অপরাধ করতে পারে না। এমন কি একটা খুনও করতে পারে না। তা যদি পারত, তাহলে কি সেদিন ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে ও ছেড়ে দিত? পারেনি বলেই আজ তাকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে।

আজাদী পাবার পর আত্মহত্যা সম্বন্ধে আমাদের পাকিস্তানের উজীর-ওমরাহ্‌দের মত বদলেছে। বিশেষ করে সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের মালিকদের। নিজের নাক কেটে হিন্দুরা যেমন পরের যাত্রা ভাঙে, তেমনি শুধু সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্যেই লোকে খুদকশী করে—এই হল তাঁদের মত। কিন্তু কামরু বেচারী খোদ সরকারকে বেকায়দায় ফেলবে কি, একটা সরকারী মোলাজিমকেও চিট্ করতে পারেনি। যদি পারত, তাহলে আজ আর খুদকশীর ফিকির করতে হত না।

কামরু অবশ্য এতসব মতামত জানে না। ও শুধু জানে যে, ও আর পারছে না। সারা দেমাক দিয়ে ভেবে ভেবেও ও কোন কুলকিনারা দেখতে পাচ্ছে না। তার চেয়ে ডোবা ভাল, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে। তাই আত্মহত্যার সঙ্কল্প ওর মগজে দানা বেঁধেছে।

আত্মহত্যার পেছনে আপনারা স্বভাবতই একটা 'অজীব ও গরীব কিস্‌সা' কল্পনা করেন। কামরুর কিস্‌সা গরীব বা করুণ হতে পারে। কিন্তু তাতে অজীব অথবা আশ্চর্য কিছু নেই, ওর মতো বদ-কিস্‌মতী আজকাল হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ধমান না ২৪-পরগণা, পশ্চিমবাংলার কোন এক জেলা থেকে কামরুরা পাকিস্তানে আসে। একমাত্র রোজ্‌গেরে ভাইটা আসতে পারেনি, কারণ ওখানেই

দাঙ্গায় ফৌত হয়ে গিয়েছিল। অথর্ব বুড়ো বাপ-মা, চাচী আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত চাচা, অনেকগুলি অপোগণ্ড ভাই-বোন—দেশের সম্পত্তি বিক্রী করা সামান্য টাকায় আর ক'দিন চলে? সয়মের মাথা খেয়ে মেয়ে কামরুকেই বার হতে হল রোজগারের তল্লাসে।

সামান্য লেখাপড়া জানা কামরুকে কে চাকুরী দেবে? বাংলা ও ভালই জানে বটে, কিন্তু প্রজাদের ভাষায় তো রাজকাজ চালানো যায় না, তা হলে রাজার-প্রজার তফাৎ থাকে কই? কাজেই কামরু কাজ পায় না, নাহক ঘুরে ঘুরে হায়রানি। শেষ সম্বল যা ছিল, তাও বন্ধকের দোকানে বিকিয়ে গেল।

একদিন খবর পেল ওদের দেশের জোহা সাহেব এখানে পুলিসের বড় অফিসার, অনেক চাকরী নাকি তাঁর মুঠোয়। জোহা সাহেবের সঙ্গে খুব বেশী পরিচয় ছিল না। তবু ভয়, সঙ্কোচ সব ঝেড়ে ফেলে কামরু একদিন সোজা ঢুকে গেল তাঁর অফিসের খাসকামরায়। আর্দালীটা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবতী মেয়ে দেখে কি জানি কেন জোর করেনি।

জোহা সাহেবের অফিসে অনেক লোক, অনেক কাজ। বহুক্ষণ বসে থাকার পর কামরু তার পরিচয় আর প্রয়োজন বলবার সুযোগ পেল। কাজের ভিড়ে অন্য-মনস্ক জোহা সাহেব কিছু শুনলেন, কিছু শুনলেন না। আর একদিন আসতে বললেন।

এমনি আসা-যাওয়ায় ক'দিন গেল। জোহা সাহেব কখনো তার কথা শোনার সময় পান না। কখনও খানিকটা শোনেন, কখনও বা একটু দরদ দেখান, একটা কাজ হতে পারে বলে আশা দেন।

শেষ দিন একেবারে ছুটির সময় গড়িয়ে গেল। সব কাজ শেষ করে, সবাইকে বিদায় দিয়ে জোহা সাহেব অপেক্ষারত কামরুর দিকে চাইলেন। হাসিমুখে চাইলেন। আশায় কামরুর মনটা লাফিয়ে উঠল।

সত্যিই আশার কথা। "কাল তোমাকে পুলিসে চাকরী করে দেব; সব ঠিক করে রেখেছি", জোহা সাহেব স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন। আরও একটু দিলখোলা সুরে বল্লেন, "চাকরী দেওয়া কি সহজ? কত উমেদার কত বড় বড় লোকের চিঠি নিয়ে আসছে, কাকে ফেলি কাকে রাখি? তবে তুমি আমাদের কহিমের বোন, তোমার জন্যে একটা কিছু করতেই হয়। আহা, কহিম বেঁচে থাকতে আমাদের ওখানে অকসর আসত, বেগম সাহেবা তাকে বড় ভালবাসতেন।"

একটু থেমে আরও মোলায়েম করে বল্লেন, "তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখার জন্যেও বেগম সাহেবার বড় ইচ্ছে হয়েছে। যাবে তুমি? চল না আজ আমার সঙ্গে। পরে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।"

কৃতজ্ঞ কামরু সহজেই রাজী হল। ওকে মোটরে তুলে নিয়ে নিজেই গাড়ী চালিয়ে চল্লেন জোহা সাহেব। প্রথমে গেলেন একটা বিলায়েতী হোটেলে। বল্লেন, "এস, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

অত খানা, অত রকম খানা কামরু কখনো চোখে দেখেনি। আর তার সঙ্গে সরবৎ। ওঃ, সে যেন আগুনের সরবৎ, জিভ থেকে বুক পর্যন্ত ঝাঁঝে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। দিলদরিয়া হাসিতে সমস্ত ভয় দূর করে দিয়ে জোহা সাহেব গ্রাসের পর গ্রাস তার মুখে তুলে দিলেন। বল্লেন, "এ হল আসল হেকিমী সরবৎ, তাকত আর কুওতের ফোয়ারা। পুলিসে কাজ করবে, তাকত না হলে চলে?"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কামরুর সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে উঠল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। জোহা সাহেব হাত ধরে ওকে গাড়ীতে ওঠালেন।

কোথা দিয়ে কোন বাড়ীতে জোহা সাহেব নিয়ে গেলেন, কামরু তা এখনও মনে করতে পারে না। আধা-বেহোশ সেই মুহূর্তগুলির মধ্যে শুধু একটা দুঃস্বপ্নই তার সমস্ত স্মৃতিতে রগরগিয়ে আছে। জাপটে জড়িয়ে ধরে জোহা যখন তার শেষ সর্বনাশ করতে যাচ্ছে, তখন একবার সমস্ত সত্তা নিয়ে সে জেগে উঠেছিল। দুর্বল মুষ্টি দিয়ে, দাঁত আর নখ দিয়ে সে বুঝেছিল। কিন্তু পারেনি, আবার শ্লথ হয়ে চলে পড়েছিল। পারেনি, পারেনি, জানোয়ারটাকে সে রুখতে পারেনি।

পরদিন ডাকে অবশ্য ও পুলিসে চাকরীর নিয়োগপত্রটা পেয়েছিল। জোহা সাহেব খোশরাতের বখশিশ দিতে ভোলেননি। কে বলে আমাদের পাকিস্তানে ইন্‌সাফ নেই?

চাকরীর চিরকুটটা যেন কামরুর কলঙ্কের ইশ্‌তাহার। অক্ষরগুলো যেন্নার কালি দিয়ে লেখা। নখে টিপে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল কামরু।

পারেনি। অপোগণ্ড ভাইবোনগুলো কাঁদছে, দুদিন ধরে ওরা শুধু মাড় খেয়ে আছে। অথর্ব বুড়ো বাপ ছেঁচড়ে ছেঁচড়েই রাস্তার মোড়ে মাল ফেরি করতে গিয়েছিল। পুলিস হল্লা এসে সব মাল কেড়ে নিয়ে গেছে; নেহাত বুড়ো বলে হাজতে পোরেনি। দুঃখে, ভয়ে আব্বাজানের ভিমরি লেগে গেছে, আম্মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছেন। অসুস্থ চাচা আজ দু দিন ধরে নাড়ীর যন্ত্রণায় অনবরত চীৎকার করছেন, কিন্তু আট আনা পয়সাও নেই যে মালিশের ওষুধটা আনিয়ে যন্ত্রণার উপশম করে।

পারেনি কামরু চিরকুটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে। চোখের জল শুকিয়ে ফেলে সে পুলিস অফিসে হাজির হয়েছিল চাকরী করতে।

তাওতো ভারী চাকরী! এসিস্টেণ্ট সাব-ইনস্পেকট্রেস, সাদা বাংলায় জমাদারনী। গোয়েন্দা অফিসে মেয়ে আসামীদের পাহারা দিতে হবে। মাইনে ষাট টাকা।

এতগুলো প্রাণীর সংসারে ওতে দুবেলা ভাতের সংস্থানও হয় না। তবু কামরু লড়াই ছাড়েনি। হা-হা-করা পুড়ন্ত মনটাকে পাথর বানিয়েছিল—দেখি, যে কদিন সইতে পারি!

কিন্তু মাস দুই পরে যেদিন ও চমকে উঠে নিশ্চিত করে জানল ঐ জানোয়ারের ভ্রূণ ওর পেটের ভিতর, তিলে তিলে ওরই হৃদপিণ্ড শুষে বড় হচ্ছে—সেদিন ও আর পারল না। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না।

তবু কামরু শেষ চেষ্টা করেছিল।

ও শুনেছিল, লুকিয়ে চুপি চুপি ভ্রূণ নষ্ট করা যায়। কিন্তু পাঁচ সাত শো টাকা লাগে, অনেক কারসাজি লাগে। দু বেলা ভাত জোটে না, অত টাকা কোথায় পাবে? ক্ষতবিক্ষত দিলটাকে ও শেষবারের মতো দুহাতে চেপে ধরল। চূড়ান্ত পরাজয়ের কালি ওর সমস্ত রক্ত কেড়ে নিল। দাঁতে দাঁত চেপে একদিন গিয়ে দাঁড়াল জোহা সাহেবের দরজায়—সাহায্যের প্রার্থনা জানাতে।

জোহা সাহেব ওকে চিনতেও পারলেন না; দুয়ার থেকেই ফিরে আসতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার শিরাগুলো কি ছিঁড়ে গেল? গোনাহগারির বীজাণুগুলো কি রক্তের মধ্যে মাতাল হয়ে উঠল? জানি না। শুধু এই জানি যে, জিন্দগীর বোঝা বয়ে চলার ও আর কোন কারণ খুঁজে পেল না।

কি করে আত্মহত্যা করবে? গলায় দড়ি দেবে? অন্ধকার রাত্রে নদীর নীচে তলিয়ে যাবে? রেলগাড়ীর চাকার তলে মাথা পেতে দেবে? না, আজকাল যেমন মাঝে মাঝে শোনা যায়, আফিস-বাড়ীর তেতলা থেকে রাস্তার পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? সুঠাম নারীদেহটা মুহূর্তের মধ্যে বিকৃত হয়ে যাবে একটা বীভৎস রক্ত-মাংসের পিণ্ডে?

ভাবতে ও শিউরে উঠল। আবার হাসি পেল। বাতি যদি একেবারেই নেভাতে হবে, তবে কতখানি কালি পড়ল ভেবে লাভ কি? জীবন যখন ফুরিয়ে যাবে তখন দেহটাকে তো আর দেখতে আসব না।

কিন্তু যদি না ফুরোয়? ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তখনই যদি প্রাণ না যায়, আধা-মরণের যন্ত্রণায় শরীরটা যদি কাতরাতে থাকে? না, না সে যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। যন্ত্রণা ও সইতে পারবে না।

তার চেয়ে আফিং খাওয়া ভাল। তাতে কোন যন্ত্রণা হয় না ও শুনেছে। তন্দ্রা ছেয়ে যায় সারা চেতনার উপর, ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুঁজে আসে। দুশ্চিন্তার সমস্ত জ্বালা মুছে দিয়ে যায় কালো রাত্রি—ঘুমের ভারী পর্দা ঢেকে দেয় জীবনকে। যন্ত্রণাহীন চরম মুক্তি।

মাথার মধ্যে ভাবনাগুলো দিনরাত সুচ ফোটায়। চিন্তাতপ্ত কপালের ঘাম মুছে ফেলে আফিং খেয়ে মরাই ও স্থির করল। তখনকার মতো মন শান্ত হল।

দোকান থেকেই আফিং কিনে আনতে হবে, তা ছাড়া উপায় কি? আফিংয়ের দোকানের পাশ দিয়ে কামরু ঘুরে এসেছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। দেখেছে দু একজন মেয়েছেলেও আফিং কেনে। বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে ও কিনতে যাবে। কেউ চিনবে না, জানবে না।

আফিং কেনার টাকা জোগাড় করাও এক সমস্যা। মাইনের সবকটা টাকাই পয়লা তারিখে গুণে গুণে আম্মার হাতে তুলে দিতে হয়, তাতেও মাসের শেষদিকে খাওয়া জোটে না। ওদের মুখের গ্রাস থেকে কি করে টাকা নেবে ভেবে ওর কপালের শিরা কুঁচকে উঠল। পরক্ষণেই আবার ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসি জাগল। যখন থাকব না......মরে যাব (মরে যাব কথাটা উচ্চারণ করতে ওর এখনও বাধ বাধ লাগে), তখন ওদের মুখের গ্রাসের কথা ভাবব কি?

তবু ও টাকা চাইতে পারে না। কি বলে চাইবে? আম্মা দেবে কেন? একবার এগোয়, আবার পেছোয়। অনেক ভেবে কিনারা বার করল। পয়লা তারিখ মাইনাটা হাতেই রাখল। বাড়ীতে বলে দিল কি এক কারণে এবারে ৭।৮ তারিখ মাইনা হবে। নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, সাত আট তারিখ আর আমাকে দেখতে হবে না। আজই আফিং কিনে আনব।

. ..গোয়েন্দা আফিসে মেয়ে আসামীদের পাহারা দিতে দিতে কামরু এই কথাই ভাবছিল—আজ আপিসের পর আফিং কিনে বাড়ী যাবে।

মগ্ন চেতনার মধ্যে করুণ ক্ষীণ স্বর ভেসে এলঃ "আমাকে একটু পানি দা—ও!"

কামরু সম্বিত ফিরে পেল। এ ঐ নতুন আমদানী মেয়ে আসামীটার স্বর। থেকে থেকে ও শুধু এই একটা কথাই বলছে।

পুলিসের চাকরীতে কামরু এখনও কাঁচা। তাই মনটা মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। আহা, উনিশ বিশ বছরের মেয়েটা, কচি মুখ থেকে এখনও ছেলেমানুষির ছাপ মোছেনি! এ বয়সে হাসবে; খেলবে, বাপ-মা-সওহরের বুকে আনন্দের ঢেউ তুলে হাল্কা হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াবে—তা না আবার এসব সিয়াসী হাঙ্গামায় জড়ানো কেন বাপু?

আসামী আমদানীর খাতায় মেয়েটীর নাম লেখা আছে জোহরা। চার পাঁচ দিন হ'ল ওকে ধরে নিয়ে এসেছে।

ইনস্পেক্টর সাহেবদের মুখে মুখে কামরু ওর বৃত্তান্তও কিছুটা শুনেছে। ওদের নেতা আনওয়ার নাকি সরকারের ভয়ঙ্কর দুশমন। কেবল লোক খেপিয়ে বেড়ায়। বলেঃ "পাকিস্তান না খাকিস্তান, সরকারের মেহেরবানিতে গরীবের

কপাল-পুড়ে খাক হয়ে গেল। জালিম সরকার কিসানের জমি কেড়ে নিয়েছে, দানা কেড়ে নিয়েছে, সোনার পাকিস্তানকে করেছে ভুখা, নাঙ্গা। নামাও, নামাও, এই সরকারকে টেনে নামাও, ফিরিয়ে আনো লুটেরাদের হাত থেকে কিসানের সোনার জমিন। উঠুক আজাদীর ঝাণ্ডা, অওআমের রাজ"—বলে বলে চষে বেড়ায় পাকিস্তানের এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো পর্যন্ত, কিন্তু কিছুতেই পুলিস ধরতে পারে না। ওর মাথার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম জারি হয়েছে তবু ধরা পড়ে না, খবরও কেউ ফাঁস করে না। "শালা রুশিয়া থেকে যাদু শিখে এসেছে, যাদু", ইনস্পেক্টর সাহেব বলেন বিরক্ত হয়ে।

জোহরাব উপরও সাহেবদের খুব রাগ। সামান্য কিসান মেয়ে, ওকে তো পুলিস চিনত না। সেই সুযোগে ওই নেতাদের নিজের ঘরে লুকিয়ে আশ্রয় দিত, এখান থেকে ওখানে খবরাখবর নিযে যেত, আর গোপনে লোকের ভেতর ছড়াত আগুনে ইশ্‌তাহার।

কিন্তু আফিসের সাহেবদের এবার আশা হয়েছে। ঐ মেয়েটা সব জানে, ওর কাছ থেকে বাব করতে হবে ওব নেতাদের হদিশ। একটা সামান্য, জাহিল কিসান মেয়ে, ওকে জব্দ কবতে কতক্ষণ? বাপ বাপ করে সব বলবে।

তবু শুধু মুখের কথায়, ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে কাজ হয়নি। ও কোন কথার জবাব দেয় না। খালি বলে, "আমি কিছু জানি না, আমি ঘরে যাব গো।" প্রথম দিকে ওরা অমন করে, খানিকটা তো ওদের শেখানো থাকে—ইনস্পেক্টর সাহেব বলেন। তাই এবার শুরু হয়েছে আসল দাওয়াইয়ের পালা। আজ তিন দিন তিন রাত ওকে ডিগ্রী বন্ধ ফেলে রাখা হয়েছে—খানা বন্ধ, পানিও বন্ধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও ছট্ ফট করেছে, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পায়নি।

আবার জোহরার ক্ষীণ স্বব ভেসে এল, "একটু পা......নি।"

কামরু উঠে পড়ল। পাশাপাশি কটা অন্ধ কুঠরী, তার নাম ডিগ্রী। এই কটাতেই কামরুর পাহারা। অবশ্য জোহরার ডিগ্রীর সামনে স্বয়ং ছোট দারোগা তদাবক কবছেন। কামরু কাছে এসে দাঁড়াল।

মোটা লোহার গরাদে দেওয়া কবাট তালাবন্ধ। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর জোহরা বসে আছে। এক কোণে একটা শৌচের পাত্র। ব্যস ঘরে আর কিছু নেই, আছে শুধু ঐ উঁচু ছাত পর্যন্ত খাড়া পাথরের দেওয়াল, শাদা চুনকাম করা।

বন্ধ কবাটের বাইরে, জোহরার নাগালের বাইরে থরে থরে খাবার সাজানো। সোরাই ভরা ঠাণ্ডা পানি, গেলাসে গড়াবার জন্যে যেন উন্মুখ। ক্ষুধা আর পিপাসায় বিবর্ণ জোহরার তৃষিত দৃষ্টি বারে বারে যাবে সেদিকে, কিন্তু পাবে না।

"পানি? শুধু পানি কেন, খানা পাবে, সব পাবে," মোলায়েম করে ছোট দারোগা বল্লেন। "দেখছ কত খানা। গরম ভাত আর তাজা পাকানো গোস্ত—ঠাণ্ডা, মিঠা শরবৎ। সব পাবে, শুধু আমাদের সওয়ালের জবাবটা দিয়ে দাও।"

"কি বলব?"

"বল আনোয়ার কোথায় থাকে? কোথায় আসে? এবার দলের আড্ডা হয়েছে কোথায়?"

"আমি জানি না। আমি কিছু বুঝি না।"

"তবে রে হারামজাদী," রাগের চোটে ঝপ করে গরাদের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোট দারোগা জোহরার চুলের মুটি ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। ঠকাস করে ওর মাথাটা লোহার শিকে ঠুকে গেল। ও নেতিয়ে পড়ল, কামরু আর ওদিকে চাইতে পারল না, চোখ ফিরিয়ে নিল।

"আরে আরে, কি করছ, বেচারীকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?" ডেপুটি সাহেব হাজির হয়ে বল্লেন। এত মোলায়েম কথা শুনে কামরু শিউরে উঠল, এ কথার অর্থ ও জানে।

"খোল. দরজা খোল," বলে ডিগ্রীতে ঢুকলেন ডেপুটি। সব কিছুর জন্যে যেন ছোট দারোগাই দায়ী এমনভাবে তাকে ধমক দিলেন, "আসামীকে কি তোমরা মেরে ফেলবে? দাও, দাও, ওকে পানি দাও, খানা দাও।"

বলে সত্যিই খানা পানি দিলেন। অবাক হয়ে জোহরা চাইল। তারপর একটু-খানি খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্ল।

"কিছু ভেবো না তুমি. বিশ্রাম কর. শীগ্গিরই তুমি ছাড়া পাবে?" বলে মিষ্টি হেসে ডেপুটি চলে গেলেন।

ডিগ্রীর বাইরে পায়চারী করে রাউণ্ড দিতে দিতে কামরু ভাবে—চাতুরীর ফাঁদে কি জোহরা ধরা পড়বে? আহা কেউ ওকে একটু হুঁশিয়ার করে দেয় না? থাকগে ওর মধ্যে মাথা গলানোর কি দরকার, নিজের ঘায়েই জ্বলছি......

নিজের কথা ভাবতেই কামরুর মনটা টনটন করে উঠল। দুনিয়ার আর সব কিছু গেল লেপে পুঁছে একাকার হয়ে। প্রাণটাকে শেষ করতেও এত হ্যাঙ্গামা? অভিশপ্ত জীবনের বাকী ক ঘণ্টাই ওকে পাগল করে তুলছে।

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ছাড়া পেতে না পেতেই পা বাড়াল আফিয়েব দোকানের দিকে।

সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। তবু ভাবে, অত লোকের মধ্যে কি করে কিনব? গলার স্বরে যদি কেউ চিনে ফেলে? গলা দিয়ে স্বরই যদি না বার হয়?

দূর থেকে দেখা যায় দোকানের সামনে কোন ভিড় নেই। দেখে কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে গেল কি কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা।

অজানিতেই পা দুটো পিছন ফিরল, ফিরে চলল। আবার দাঁড়াল। কতক্ষণ পরে পা দুটোকে ঘুরিয়ে যেন টেনে টেনে নিয়ে চলল দোকানের দিকে।

দোকান বন্ধ। সাইনবোর্ডে লেখা আছে: "গভর্ণমেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত আফিংয়ের দোকান। রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে।" সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। পর দিন রবিবার, তার পরও ক'দিন ছুটি আছে। এ ক'দিনই দোকান খুলবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কামরুর বুকের ভেতর থেকে। ব্যর্থতার মনস্তাপে সে নিঃশ্বাস ভরা ছিল। কিন্তু শুধু তাই নয় হয়তো। দুঃসহ জীবনের মেয়াদ আরও কত ঘণ্টা বাড়ল, কিন্তু যন্ত্রণায় গা-টা রি-রি করে উঠল না তো! আসার সময় ও এসেছিল চোখ বুজে; পথ, ঘাট, পৃথিবী কিছুই নজরে পড়েনি। ফেরার সময় দেখল শহরের আলো। বাতি জেলে পিঠ দুলিয়ে দুলিয়ে ছেলেরা পড়ছে, মার হাতের তালে তালে দোলনায় খোকা হাসছে, মসজেদের গম্বুজের ওপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদ উঁকি মারছে......

রাতে, দিনে জোহরা ভালই খেতে পেল। কেউ বিরক্ত তো করেইনি, উল্টে সাহেবের হয়ে তাঁর আর্দালী খোঁজ নিয়ে গেল ওর সঙ্গে কেউ গোলমাল করেনি তো?

কিছু পরে ডেপুটি নিজে উপস্থিত। জোহরার পাশে ঐ ছেঁড়া কম্বলের ওপরই বসে পড়ে বল্লেন, "আহা, এরা বড় কষ্ট দিয়েছে, না মা? যাকগে তুমি ভেবনা, কাল পরশুর মধ্যেই যাতে ছাড়া পাও তার ব্যবস্থা আমি করছি।"

বিশ্বাস অবিশ্বাস মাখানো সন্দেহের দৃষ্টি জোহরার চোখে। দেখে ডেপুটি হেসে বল্লেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যিই তোমাকে ছেড়ে দেব। এখন আর তোমার কাছ থেকে জানবার কিছুই নেই, আনোয়ারের প্রধান সাকরেদ হবিবই তো ধরা পড়ল।"

"কবে? কোথায়?" সব ভুলে কাতরে উঠল জোহরা।

"এই তো কাল। পলাশবাড়ীর কাছে," বলে ডেপুটি কান খাড়া করে রইলেন।

"তা কি করে হবে? তাঁর তো থাকার কথা বিরি.... .", আবেগে বলতে বলতে হঠাৎ জোহরা দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল।

"হ্যাঁ, বল, বল কি বলতে যাচ্ছিলে, কোথায় তার থাকার কথা", আগ্রহে লাফিয়ে উঠলেন ডেপুটি।

"কই আমি তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম না।" তখন জোহরা সামলে নিয়েছে।

"কেন, এই যে বলছিলে হবিবের কোথায় থাকার কথা।"

"আপনি ভুল শুনেছেন। হবিব আবার কে?"

ডেপ্রটির মুখ লাল হয়ে উঠল। সভ্যতা, ভদ্রতা, ইলমদারীর মুখোসটা খসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বেরিয়ে এল গোয়েন্দা অফিসাররূপ জানোয়ারের স্বমূর্তি। জঘন্য, ইতর গালাগালিতে ফেটে পড়ল ডেপুটি— "বেজন্মা, রাঁড়ী, বেশ্যা মাগী! হবিবকে নিয়ে থাকিস, আর তাকে চিনিস না! বল্ বল্ বলতেই হবে।"

জোহরা লা-জওয়াব। জানোয়ারটা পাগলের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, চড়, ঘুষি মেরেই চলল। জোহরার ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু সে ঠোঁট দিয়ে শব্দ উচ্চারিত হল না আর একটিও।

ব্যর্থ ডেপুটি হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, "দরওয়াজা!" যে সেপাই দরজার কাছে থেকে তার ঐ পুলিসী নাম। সেপাই ছুটে আসতেই ডেপুটি হুকুম দিল, "লাগাও খাড়া হাতকড়া। দেখব মাগী কতক্ষণ চুপ করে থাকে।"

জোহরার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ওকে দেওয়ালের কাছে হিড় হিড় করে টেনে আনল সেপাইটা। দেয়ালে মাথার চেয়েও উঁচুতে আংটা লাগানো। জোহরার হাত-কড়া বন্ধ হাত দুটোকে সেই আংটার সঙ্গে তালা দিয়ে আটকে দিল। দেয়ালের দিকে মুখ করে মাথার উপর হাত তুলে জোহরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাগুলো ঝিঁঝিঁতে ঝন্ঝন্ করবে, কাঁধ থেকে বাহু যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে, খসে পড়তে চাইবে—কিন্তু ছুটি নেই, যতক্ষণ না মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে।

প্রথম যখন অনেকক্ষণ ধরে পা দুটো ঝিঁ ঝিঁ করল, আস্তে আস্তে মনে হল পায়ের চর্বি মাংস ভেদ করে রগরগে শিরাগুলোর উপর দিয়ে যেন ফোঁটা ফোঁটা গরম পানি গড়িয়ে যাচ্ছে, জটে জটে ফোস্কার জ্বালা। তখন ও লাফিয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত মাটিতে পা ঠুকেছিল, যতক্ষণ পারে।

জ্বালাটা উঠল। পায়ের শিরা বয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠল—কোমরের মাঝ-খানটা জ্বালিয়ে দিয়ে, পিঠের পেশীগুলোকে আক্ষেপে কোঁচকাতে কোঁচকাতে। গভীর রাত্রে বাহু আর কাঁধের জোড়টা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ল। না, না মোটা সুই দিয়ে কে যেন দুটোকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে জুড়ছে, কাঁচা মাংস আর হাড় ভেদ করে পটপট সুই বিঁধছে।

যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখ আর নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখের ওপর ভোরের আলো এসে লাগল—একটা নতুন দিন জন্ম নিচ্ছে। যন্ত্রণার তীব্রতা বোঝার ক্ষমতা তখন ওর হারিয়ে গেছে। কিংবা হয়তো ব্যথার ভয়কেই ও তখন জয় করেছে। নতুন দিনের আলোর পানে চেয়ে ও স্বপ্ন দেখে : সে আলোর পেছনে আরো আরো আলো— দূরে দূরে গাঙের ধারে ওদের শ্যামল গাঁয়ের মাঠে যেখানে সবুজের শীষের ওপর সোনালী দিন ছুটল। কত মানুষ জাগল। এল হবিব, এল আনোয়ার, এল তার পেছনে লক্ষ পায়ের শব্দ। চুরি গেছে, লুট হয়ে গেছে তাদের মাটি, তাই মাটির

সন্তানরা জাগল, মাঠে, জঙ্গলে, শহরে বন্দরে—শেকলবাঁধনের ঠক ঠক ঠং ঠং ছাপিয়ে উঠল শেকল ভাঙার উন্মাদ ঝঙ্কনা......আগুনের হল্কা এসে বুকে বেঁধে, আগের মাথা হয়তো লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, বন্ধু, সাথী, সমব্যথীর বাড়ানো হাত তাকে কোলে তুলে নেয়। এক আর লাখ, লাখ আর এক—একাকার। সেই তো সেখানে নতুন দিনের আভাস। কটা বুক বিঁধবি, ওরে দুশমন?......

এমনিভাবে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা। এমন সময় সেপাই সঙ্গে নিয়ে ডিগ্রীতে ঢুকল ডেপুটি। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে ও হন্যে হয়ে উঠেছে। মুখ খিঁচিয়ে বল্ল, "কিরে মাগী, ঠেলা টের পেয়েছিস? ভাল চাস তো সব বলে ফেল, নইলে রক্ষা নেই।"

জোহরার কোমর থেকে পা পর্যন্ত দেহটা কি হারিয়ে গেছে? অসাড় পাথরের থামের মতো মাটির বুকে গেঁথে গেছে? আধা-অজ্ঞান আবেশে ও ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল।

পিত্তি জ্বলে গেল ডেপুটির। "আচ্ছা তবে দেখ," বলে সেপাইকে ইশারা করল।

সাধারণ সিপাইরা পর্যন্ত এ কাজে আসে না। তাই সরকারী পয়সায় শরাব খাইয়ে একটা মাতাল সেপাইকে তৈরী করে এনেছিল ডেপুটি। মাতালটার চোখে লোলুপ উত্তেজনা। জোহরার বুকের আচ্ছাদনটাকে দুহাতের টানে ফ্যাড় ফ্যাড় করে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর কদর্য চোখে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে রইল।

সে দৃষ্টি আঘাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর। লজ্জায় অপমানে মন্থর রক্তস্রোতেও জ্বালা ধরিয়ে দেয়। দেয়ালে হাত বাঁধা জোহরা ছট্‌ফট করতে লাগল।

ডেপুটি আর সেপাই বিকট হাসি হেসে উঠল। এগিয়ে গিয়ে জোহরার কোমরের কাপড় খুলে ফেল্ল। তারপর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে বল্ল, "এবার বলবি, না আরও চাস?" ওদের চোখে জয়ের কুৎসিত উল্লাস। সে চোখে চোখ পড়তেই জোহরা হঠাৎ ঘেন্নায় কালো হয়ে গেল। লজ্জা আর অপমান রূপান্তরিত হল শান্ত, নীরব ক্রোধের দৃষ্টিতে আগুনভরা চোখে ও আবার দাঁড়াল নিশ্চল, সোজা হয়ে।

উল্লাস মিলিয়ে গেল ডেপুটির। ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁত কিড়মিড় করে লাফিয়ে জোহরার চুলের গোছা ধরে টান দিল পাগলের মতো। "বল্, বলবি কিনা বল্", চীৎকার করতে করতে রাগে দিশাহারা হয়ে হাতের রুলটা দিয়ে আচমকা প্রচন্ড আঘাত করল ওর ঘাড়ের দুর্বল জায়গায়।

একবার শিউরে উঠেই জোহরার মাথাটা হঠাৎ অবশ হয়ে ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ল। হাঁটুর কাছে পা দুটো যেন দুমড়ে গেল, দেওয়ালে আটকানো হাত থেকে ঝোলানো শরীরটা অজ্ঞান হয়ে দুলতে লাগল।

ঘরে ঢুকলেন বড় সাহেব। ইনি পাকিস্তানী সাহেব নন, খাস বিলাতের গোরা সাহেব। সম্প্রতি গোয়েন্দা দফ্‌তরের কর্তা হয়েছেন। আজাদীর পর কি আর গোরাদের রাখা হয়? তাই ছোটখাট পোস্ট থেকে তাদের সব তাড়ানো হয়েছে, বড় বড় পোস্ট ছাড়া কিছু আর-তারা পাবে না।

বিলায়েতী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাছাই করা লোক ইনি, পাকিস্তানী খরচায় মার্কিন পুলিস দফ্‌তর থেকেও খাস তালিম নিয়ে এসেছেন। ভেতরে ঢুকেই ডেপুটিকে ইংরেজীতে ধমকালেন, "আরে, ওখানে অমন করে মারে, বেওকুফ!"

"কেন, স্যর, আদালতে মারের দাগ দেখতে পাবে ভাবছেন? না না স্যর, ও দাগ থাকবে না।" ডেপুটি বিনীতভাবে জবাব দিলেন।

"দূর! দাগে কি পাকিস্তানের হাকিমদের ভোলানো যায়? তাঁরা দেখেই বুঝতে পারেন যে, ও হয় মশার কামড়, আর না হয় আসামী নিজের ঘাড় নিজেই কামড়েছে। দাগের কথা বলছি না। বলছি যে, ওরকম মারাতে আসামী অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তাতে তো ও বেঁচেই গেল। যতক্ষণ জ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ আর তুমি কিছু করতে পারবে না।"

অপ্রস্তুত ডেপুটিকে একটু ভাববার সময় দিয়ে বড় সাহেব আবার বল্লেন, "ও-সবে হবে না, হার্লফিলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধর—যাতে দম্পে দম্পে কথা টেনে বার করে আনে। এটা বিজ্ঞানের যুগ জান তো! কাল থেকে ওর 'লাইট ট্রিটমেন্ট' লাগাও, ব্লাডি বিচকে কথা বলতেই হবে। কালকের জন্যে ওকে তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করে তোলাও, বুঝলে?"

আসামীকে নার্স করে তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানোর জন্যে জমাদারনী কামরুকে হুকুম দিয়ে সাহেবরা চলে গেলেন।

. . .মেঝের কম্বলের ওপর জোহরাকে শুইয়ে কামরু ওর মাথায় হাওয়া করছিল, আর মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণে কালশিরা-পড়া ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জোহরার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু কামরু ওকে ছেড়ে যেতে পারেনি। আজাদীর মাল ও দওলত তো কামরুর কপালে বখশায়নি, তার জওয়াহেরের জ্বালাই বরং ওকে দিওয়ানা বানাতে চলেছে। তাই এই রোগা, কালো, মজলুম কিসান মেয়েটার দুঃখে ওর মায়া পড়ে গেছে। যেন আদরের ছোট বোনটি।

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কামরু দরদ দিয়ে ভাবে—মেয়েটাও দিওয়ানা! যন্ত্রণার কাতরানির মধ্যেই আবার খোয়াব দেখে, বলে, "আপা আমরা কি একা? না, না, আমরা হাজার, লাখ, আমরা বাড়ব।" ঘাড়ে হাত দিয়ে কাতরায় উঃ বড় দরদ! তারপর আধো-বোঁজা চোখে তন্দ্রা ছায়, জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে কী আশার স্বপ্ন—"আপা, আপা, ঝাণ্ডা উড়ল, আকাশ লালে লাল। বাজনা বাজছে, গোলা

ভরছে, ধানে ধানে ভরা মাঠ সব মজলুম মানুষের জায়দাদ, বোন। গাও গাও জয়গান গাও......

স্বপ্নের আবেশে কামরুর শরীরেও কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারপর ওর যন্ত্রণা-কোঁচকানো মুখের দিকে চায়, স্বপ্ন ভেঙে যায়।

দুর্বল ক্ষীণ গলায় জোহরা ডাকে, "একটু পাশ ফিরিয়ে দাও! উঃ মাগো, বড় যন্ত্রণা, আর পারিনে মা।" ছাঁত করে ওঠে কামরুর বুকের ভেতরটা। "ভেঙে পড়বে কি জোহরা? পারবে না, সইতে পারবে না? না, না, দোহাই আল্লা ওকে রক্ষা কর।" তারপর অতি সন্তর্পণে ওকে পাশ ফিরিয়ে দেয়। চোখের পাতাদুটো ভিজে আসে।

স্বপ্ন ভাঙার রূঢ় বাস্তব দুর্ভাবনাকে ছড়িয়ে দেয়। মনে পড়ে ঘরের কথা। বুড়ো চাচা হাঁপানির অভাবে কাতরাচ্ছে, ছোট ভাই-বোনগুলি খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে মেঝের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছে একটা চোখ। শয়তানী চোখ, জোহা সাহেবের......

ছুটির দিনও গোয়েন্দা দফতর খোলা থাকে, কিন্তু আফিংয়ের দোকান বন্ধই ছিল। যেদিন দোকান খুলবে সেদিন কামরু একটু সকাল সকাল আফিস থেকে বার হল। নইলে সূর্যাস্তের পর আবার দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

দোকানে পোঁছাল প্রায় শেষ সময়। তখন আর খরিদ্দার নেই। দেখে ও একটু আশ্বস্ত হল। তবু পা সরে না। মনে হয় রাস্তার সব লোকই যেন ওর দিকে চাইছে, ওর দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। বোরখায় ঢাকা মাথাটা হেঁট করে ও হনহন করে দোকান ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু গতি ক্রমে মন্থর হয়ে এল, একটু দূরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশে বাসনের দোকানে সাজানো মালগুলোই যেন ও পরীক্ষা করছে, এমনভাবে দাঁড়িয়ে তারপর আফিংয়ের দোকানের দিকে চাইল।

চাইতেই বুকটা ধক করে উঠল। দোকানী দোকান বন্ধের উদ্যোগ করছে। আজও বুঝি ফসকে যায় এই ভয়ে মুহূর্তের মতো ও আবার সব ভুলে গেল। দ্রুত গতিতে দোকানীর সামনে হাজির হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল, "এক ভরি আফিং দিন তো।"

বুকটা তখনও ধকধক করছিল। দোকানী হয়তো সন্দেহ করবে, কত হয়তো জেরা করবে। দোকানী কিন্তু কেনা-বেচার অতি-সাধারণ নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, "পারমিট খাতা? পারমিট খাতাটা দিন।"

আজাদ পাকিস্তানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বড় পবিত্র অধিকার। তাই নেশা করার স্বাধীনতায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবু দস্তুরমতো হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রত্যেক আফিংখোর তার নাম, ঠিকানা, সাপ্তাহিক আফিং খরচা প্রভৃতি সব-

কিছু লিখিয়ে তবে আফিং কেনার পারমিট পায়। এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। পারমিট খরচার জন্য ফি নেওয়া হয় অতি সামান্য; এতেও যারা বলে, সরকার মানুষকে আফিং খাইয়ে লাখ লাখ টাকা করছে, তারা গদ্দার, দেশদ্রোহী।

বেচারী কামরু অতশত জানে না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "পারমিট তো নেই।"

"পারমিট ছাড়া এক সঙ্গে দু-আনার বেশী আফিং পাবেন না; সরকাবের মানা আছে", দোকানী জানাল।

সরকারের কী বিবেচনা! পারমিট অভাবে বেচারা আফিংখোরদের মৌতাত না মাটি হয় তার জন্যেও দু-আনা বরাদ্দ!

কামরু দু-আনাই কিনে নিল। দু-দু-আনা করেই ডাঁর ভরে তুলবে।

বাসায় ফেরার পথে ক'টা মুহূর্ত মন্দ লাগেনি। তিক্ত জীবনের দুর্ভোগ শেষ করার দিন আরও পিছিয়ে গেল, কিন্তু সে ব্যর্থতাকে ক্ষণেকের জন্যে ছাপিয়ে উঠেছিল জীবন্ত দুনিয়ার বিচিত্র রং।

মনের সঙ্গে শরীর তাল রাখতে পারে না। গা কি রকম ঘোলাচ্ছিল। বাসায় পৌঁছাতেই মাথাটা ঘুরে গেল। অবসন্ন হয়ে ও শুয়ে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে আম্মা এলেন। "সারাদিনের খাটাখাটুনীতে নাড়ী চুইয়ে গেছে; একটু কিছু মুখে দে, ভাল হয়ে যাবে", বলে খাবার এগিয়ে দিলেন।

খাবার দেখেই মোচড় দিয়ে উঠল সারা শরীরে। উঠে যাবারও তর সইল না, ঘরের পাশেই বমি করে ফেলল।

একটু আরাম। তারপরই বুকটা ভয়ে ধড়াস করে উঠল। আম্মাজানের চোখে কি সন্দেহের ছায়া? কিছু আঁচ করেননি তো?

"নাঃ, তোর পেটেই বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। দাঁড়া পেটে তেল-পানি মালিশ করে দিই", কইলেন আম্মা।

কামরু চমকে উঠল। প্রায় আর্তস্বরেই বলল, "না, না, কিছু করতে হবে না। খাটনীতে মাথাটা একটু ঘুরে গেছে মাত্র। আমাকে খানিকক্ষণ একলা চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও; আপনি ভাল হয়ে যাবে।" বলে বালিশটা আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

রাত্রে খাবার নিয়ে আম্মা আবার ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ও উঠল না। মনের ভেতর তখন তোলপাড় করছে, আত্মহত্যার সঙ্কল্প ক'দিন ধরে বাধা পড়ায় বিনিদ্র দুশ্চিন্তায় ও শিউরে শিউরে উঠছে। না, না, এ কলঙ্ক কেউ ঘুণাক্ষরে টের পাবার আগেই অভিশপ্ত জীবনকে শেষ করতে হবে; জীবনের সব আলো এই কলঙ্কের কালিতে কালো হয়ে যাবে, সে আমি সইতে পারব না। অ্যায় খোদা, আমাকে মাফ্ কর।

সূর্যোদয়ের জন্যে ও তন্দ্রাহীন রাত্রের প্রহর গুণছিল। সকালেই গিয়ে দু-আনার আফিং কিনবে, তারপর আবার বিকালে। পরদিনের ভেতর আধ ভরি পুরে যাবে, একটা জীবনের হিসাব চোকাতে তাই যথেষ্ট। সময়ই যেন এখন ওর বড় দুশমন।

আফিসে বিশেষ কাজ আছে বলে আফিসের অনেক আগেই ও বেরিয়ে গেল।

তখনও আফিংয়ের দোকানে ভীড় জমেনি। এবার আর কামরুর পা কাঁপল না; সোজা এগিয়ে গিয়ে দু-আনি আফিং চাইল।

গত দিনের সেই দোকানীই। কামরুর দিকে প্রথমে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, "কালই আপনি দু-আনি নিয়ে গেলেন না? বিনা পারমিটে হপ্তায় দু-আনির বেশী দেওয়া তো নিয়ম নেই।"

কামরু কি জবাব দেবে। তবু ফিরে যেতে পা সরে না। আফিং যে ওর চাই।

ওর ভাব দেখে দোকানী একটু নড়ে বসল। গলাটা নামিয়ে সহানুভূতির সুরে বল্ল, "আপনার বুঝি খুব জরুরী দরকার? তা...মানে আর একজনের ভাগ থেকে ভরিখানেক আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু দাম লাগবে পঞ্চাশ টাকা। আইনের ঝুঁকি, তার ওপর সরকারী কর্তাদের ঘুষঘাষ দেওয়ার খরচ জানেনই তো—পঞ্চাশ টাকা না হলে আমার কিছুই থাকে না। নেবেন পঞ্চাশ টাকায়?"

প—ঞ্চা—শ টাকা! এ মাসের মাইনে, যা সঙ্গে রয়েছে, তার প্রায় সবটাই। জনাজার খরচার পয়সাও থাকবে না? ভাবতে ভাবতে কামরু হাত দুটোকে পেটের ওপর জোড় করল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পেটের ভেতর নড়ে উঠে সমস্ত দেহটাকে মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণায় অবশ করে দিল। দুশমনের সন্তানটা পেটের মধ্যেও দুশমনি করছে।

দোকানের খুঁটিটা ধরে ফ্যাকাশে মুখে কামরু বসে পড়ল। অবসন্ন মাথার ভেতর দিয়েও কতকগুলো দুশ্চিন্তা যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে গেল। আর ক'দিন পরে কাপড় বা বোরখার আচ্ছাদনেও এ কলঙ্ক ঢাকবে না। আম্মা জানবে, চাচী জানবে, আফিসের লোকগুলো কুৎসিত ইশারা করবে, কলঙ্কের ঢেউ উঠবে. . .

আর কথা না বলে ও পঞ্চাশ টাকা বার করে দিল। তারপর আফিং-এর মোড়কটা সন্তর্পণে মুঠোর ধরে ভাবতে ভাবতে চল্ল আফিসের দিকে।......আজই শেষ। আপিস থেকে ফিরে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন ও আফিং খাবে। ব্যস! রাত দশটার পর চুকে যাবে দুনিয়ার দেনা-পাওনা। জীবনের মেয়াদ আর বার ঘণ্টা মাত্র।

শুধু বার ঘণ্টার ওয়াস্তা! ভাবতেই হঠাৎ এক পরম প্রশান্তিতে মন ভরে এল। যে কলঙ্কের দুর্ভাবনা ওকে মাথা হেঁট করে রেখেছিল, যে দুশ্চিন্তার

পোকাগুলো দিনরাত মগজের মধ্যে হুল ফোটাচ্ছিল, হঠাৎ সেগুলো যেন খসে পড়ল। ও সোজা হয়ে চাইল সামনের দিকে। আফিং-এর মোড়কটাকে হাতে চেপে অনুভব করে আরামে চোখ বুজল। রাত দশটা, তারপর আর কোন দায়িত্বের যন্ত্রণা থাকবে না। চোখ বুজে আসবে গাঢ় ঘুমে। সে ঘুমের জাগরণ নেই; দুঃস্বপ্ন নেই। জ্ঞান আর ভাবনার ভারী বোঝা দুটো একেবারে নেমে যাবে। আসবে শান্তি। আর.........

আজ তিন দিন ধরে জোহরার উপর 'লাইট ট্রিটমেন্টের' বৈজ্ঞানিক উৎপীড়ন চলছে।

ডিগ্রীর মেঝেতে ওকে চিত করে শুইয়ে রেখেছে। ওপর থেকে চোখমুখের ওপর পড়ছে একটা সার্চ-লাইটের ধাঁধালো আলো—অনবরত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। আর পাশে বসে অফিসারেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলছে, দিনেরাতে সর্বক্ষণ।

পাশ ফিরবার জো নেই। চোখ আর মস্তিষ্কের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। ঝলসানো আলো চোখের স্নায়ুগুলোকে অনবরত জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত, দুর্বল শরীর অবসাদে ঘুমের জন্য টনটন করে, কিন্তু শয়তানী আলো চোখের শিরায় শিরায় রক্তকে তোলপাড় করে নাচিয়ে বেড়ায়।

"আমাকে একটু ঘুমুতে দিন", ক্ষীণ স্বরে জোহরা কাতরায়।

সরকারের পার্শ্বচরেরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমোতে দেব বৈ কি; নিশ্চয় দেব। শুধু আর একটু জবাব দাও দেখি। হবিবকে শেষ কোথায় দেখেছিলে? ও, হবিবকে চেন না? আচ্ছা মনসুরকে? তাও না! আচ্ছা তোমার ফুফার নাম কি? তোমাদের ক'বিঘে জমি আছে? বাঃ, এই তো ভাল জবাব দিচ্ছ। হ্যাঁ, গত বছর ফসল হয়েছিল কত? জোতদার ফসল নিয়ে গেল? আ-হা! তা আনোয়ারেরা কিছু বলে না? বলে? ও, ভুলে বলেছিলে, আনোয়ারকে চেন না? আচ্ছা, তোমার চাচা মারা যান কোন্ সালে?.... .

এমনি অনবরত, অনর্গল প্রশ্ন। এলোমেলো! কখনো বাজে কথা, কখনো তার মধ্যে দু-একটা বাস্তবিক সওয়াল। জবাব না দিলে খোঁচা দেয়, এলিয়ে গেলে কঠোর ধাক্কায় ফিরিয়ে আনে, আবার প্রশ্ন করে। নিদ্রাহীন, উন্মত্ত স্নায়ুগুলো কোন্ সময় মনের শাসনকে ভেঙে ফেলবে, অবান্তর কথার জবাবের ফাঁকে সত্য জবাব বেরিয়ে আসবে, সেই পরিণতির জন্যেই ওরা পিশাচের আগ্রহে প্রহর গোনে। প্রশ্ন করতে করতে এক অফিসার হাঁফিয়ে যায়, আর একজন তার স্থান নেয়, কিছুতেই বিরাম নেই।

জোহরা পাশ ফিরেছিল। রূঢ় ধাক্কায় ওকে চিত করে দিয়ে অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করে চল্ল।

চোখ বুজল জোহরা। একটুখানি, একটুখানি ঘুম আসুক, মুহূর্তের জন্যেও স্নায়ুগুলো বিশ্রাম পাক, তা হলেও ও যেন বেঁচে যায়। কিন্তু তার উপায় নেই। বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করে ঝলসানো আলোর ঝাঁঝ প্রবেশ করে, চোখের নাড়ীতে নাড়ীতে উত্তেজনা জাগিয়ে পাগল করে তোলে।

অনর্গল বকিয়ে চলে অফিসার: "তোমার এখনো শাদী হয়নি কেন? গরীব বলে? কেন, গরীবরাও তো সবাই শাদী করে। তা না, হবিবের সঙ্গে তোমার আশনাই বলেই আজো শাদী হয়নি, না? ও আশনাই নেই, আশনাই থাকলে শাদীই হতে পারত? তা বটে। তা তোমাদের ভেতর তো শাদীর দরকার হয় না—আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঘর করে! মিথ্যে কথা? কেন, ঐ আমিনা আর আনোয়ার তো বিনা শাদীতে এক সঙ্গে থাকে। তাদের শাদী হয়েছে? বেশ বেশ। তবে আমিনা আবার বিল্টুর সঙ্গে থাকে কেন? বাজে কথা? সে শুধু লোক দেখানোর জন্যে, লুকিয়ে থাকার সুবিধার জন্যে? তা হবে। কিন্তু তারা যে এক ঘরে শোয়. তাদের এখনকার আড্ডায় ঘর তো একখানাই! দু-খানা ঘর? হোঃ, তুমি জান না. কোন্ আড্ডার কথা তুমি বলছ? কোন্ গাঁ বল্লে? শাহবাজ না কি, কি, বল, বল সাফ্ করে বল!"

জোহরা হঠাৎ কাঠ হয়ে গেল। ক্লান্তি আর নিদ্রাহীন উন্মত্ততার আধা-চৈতন্যে মনের শাসন অজানিতে কখন ভেসে গেছে, ঝিমানো মস্তিষ্ক কখন যন্ত্রবৎ জবাব দিয়ে ফেলেছে। ওদের লুকিয়ে থাকা গাঁয়ের নামটা পর্যন্ত আর একটু হলে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

হায়, হায়, এতগুলো মানুষের বিশ্বাস কি ভেঙে পড়বে আমার হাতে? এত বড় লড়াইয়ে আমার জিভটাই হবে দুশমনের হাতিয়ার?—এই ভাবনার তীব্র আঘাতে জোহরার ক্লান্ত, উৎপীড়িত মাথাটা হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে গেল। ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে এল হাত-পা। অচৈতন্য হয়ে ও এলিয়ে পড়ল।

ডিগ্রীর বাইরে পাহারারত কামরুর বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে উঠল। উৎপীড়িত মেয়েটার প্রতি দরদে ওর সারা দিলটাই যেন আজ ভরে গেছে। নিজের যন্ত্রণা থেকে চরম মুক্তি পাবার ভরসায় সারা দুনিয়ার যন্ত্রণাকে ও আজ আপনার করে নিতে চায়।

পুলিস সার্জন এসে অচৈতন্য জোহরাকে কি ইনজেক্শন দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে অফিসাররাও চলে গেল, কামরুকে বলে গেল আসামীর জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে, আর জ্ঞান হলেই খবর দিতে।

তারপর ডিঙ্গীর ভেতর কামরু আর জোহরা একা। ব্যথিত কামরু আস্তে আস্তে হাওয়া করছে জোহরার মাথায়।

অনেকক্ষণ পরে জোহরা নড়ল। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে অস্ফুট প্রশ্ন করল, "কেন-?" কামরুর দিকে চেয়ে তাকে চিনল, বল্ল, "আমি কি বেহোশ হয়েছিলাম?"

ক্রমে ক্রমে সারা অবস্থাটা মনে পড়তেই শিউরে উঠে ও কামরুর হাত চেপে ধরল। করুণ মিনতিতে ক্ষীণ আর্তনাদ করে উঠল, "আমার জ্ঞান ফিরেছে ওদের জানতে দিও না, দিও না আপা!"

চোখের জলে ভেজা ম্লান হাসিতে জোহরার দিকে চেয়ে কামরু ওর হাত দুটো কোলের উপর তুলে নিল। বল্ল, "ভয় নেই।"

"তুমি না থাকলে অনেক আগেই অসহ্য হয়ে উঠত", দুর্বল স্বরে জোহরা কৃতজ্ঞতা জানাল।

তারপর ঠিক কামরুর ছোট বোনের মতোই ওর কোলে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার মধ্যে থেকে থেকে শোনা গেল ওর টানা টানা স্বর, "কিন্তু আর আমি পারিনে, আর সইতে পারিনে গো। শয়তানদের অত্যাচারের কি শেষ নেই?"

ব্যথায়, দুঃখে কামরুর মন ভরে গেল। এত সত্ত্বেও কি শেষকালে ও শয়তানদের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে? সাহস দিয়ে জোহরাকে বল্ল, "না, না, শয়তানরা হারবেই। বেশী নয়, আর একটু সবুর কর।"

"কি করে করি?" এলিয়ে-পড়া সুরে জোহরা বল্ল, "শরীরের কষ্ট হলে দাঁতে দাঁত চেপে হয়তো সইতে পারতাম। কিন্তু এখন আধা-তন্দ্রার ঘোরে কোন্ কথা কখন বেরিয়ে পড়ে তার যে ঠিকানাই পাইনে।"

একটু থেমে শিউরে-ওঠা ভয়ের সুরে ও বলে চল্ল, "আমার মুখ দিয়েই কখন সাথীদের সর্বনাশ হবে, সেই ভাবনা আমার মন ভেঙে দিয়েছে। মনের জোর যে ফেরাতে পারছিনে। উঃ মাগো, একটু বিষ দাও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু বিষ দাও, তাহলে আর শয়তানদের ভয় থাকবে না।"

বলতে বলতে একটা হঠাৎ আশার উত্তেজনায় জোহবা উঠে বসল। কামরুর হাতটা চেপে ধরে বল্ল, "তুমি পার, তুমি তো বাইরে যাও। দোহাই আল্লার, তুমি আমাকে বিষ কিনে এনে দাও। আপা, আপা, সাথীদের সর্বনাশ থেকে আমাকে বাঁচাও! দয়া করে একটু বিষ এনে দাও, নইলে নিজেকে সামলাতে পারব না।"

চমকে উঠল কামরু। কিন্তু কোন জবাব দিল না। গভীর চিন্তার মধ্যে ও তখন হারিয়ে গেছে। উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় জোহরা আবার নেতিয়ে পড়ল। চিন্তামগ্ন কামরু ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

কিছু পরে জোহরা প্রকৃতিস্থ হল। কথা বলার শক্তি ফিরে পাবামাত্র তার ঠোঁটে ভাষা পেল সেই একই আবেদন, "তুমি আমার অনেক উপকার করলে। এবার শেষ উপকার কর। আমাকে মরতে দাও যাতে সবাই বাঁচে।"

চিন্তামগ্ন কামরু তখনও নিরুত্তর।

এমন সময় সার্জন আর অফিসারেরা কামরুকে ডিগ্রীর বাইরে ডেকে জিজ্ঞাসা করল জোহরার জ্ঞান ফিরেছে কি না। অম্লানবদনে কামরু মিথ্যে জবাব দিল, "না।"

"কি রকম ডাক্তার আপনারা, একটা মূর্ছা ভাঙাতে পারেন না", সার্জনের প্রতি অফিসার খিঁচিয়ে উঠল। "আজ সারা রাত আসামীকে লাইট ট্রিট্‌মেন্টের উপযুক্ত করে দিতেই হবে। আ-হা-হা আড্ডার ঠিকানাটা প্রায় বলেই ফেলেছিল, মূর্ছা হয়ে ফস্কে গেল। নিন, নিন, ডাক্তারী-শাস্ত্রের সমস্ত বিদ্যে লাগিয়ে চাঙ্গা করে দিন। ওর কাছে কথা বার করতে আর দেরী হলে অ্যাবস্‌কন্ডারদের ধরা যাবে না, ব্যাটারা সরে পড়বে। কে জানে, হয়তো সরে পড়েছেই।"

"ডাক্তারী শাস্ত্রের কসুর নেই; আসামীর হার্টটা বড় উইক কিনা, শকে মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ছে", সার্জন কৈফিয়ৎ দিল। "তবে ভাববেন না। একটা স্পেশাল ইনজেকশন তৈরী করছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। ওটা লাগাতে পারলে আজ সারা রাত আপনাদের ট্রিট্‌মেন্ট চালানোর অসুবিধা হবে না।"

বলে তারা বিদায় হল। তখন কামরুর ছুটির সময় হয়েছে। ওর বদলী ও বন্ধু দ্বিতীয় জমাদারনী সুফিয়া এসে পৌঁছেছে, দূর থেকে দেখা গেল।

চট করে কামরু ডিগ্রীর ভেতর ঢুকল। ব্লাউজের মধ্যে বুকের কাছ থেকে আফিং-এর মোড়কটা বার করে ধীরে ধীরে জোহরার হাতে গুঁজে দিল। অস্ফুট, ভাঙা গলায় বল্ল, "এই বিষ।"

চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। নীচু হয়ে আস্তে আস্তে জোহরার কপালের উপব একটি চুমা এঁকে দিল। তার সঙ্গে মেশানো ছিল চোখের জল।

পরদিন কামরু আফিস যায়নি। একদিন বাদ দিয়ে আবার যখন সে ঐ পাষাণপুরীতে পৌঁছালো তখন দ্বিতীয় জমাদারনী সুফিয়া এদিক-ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ওকে একটা মোড়ক দিল। বল্ল, "সেই ডিগ্রীর আসামী তোকে দিয়ে গেছে। কিছু দামী জিনিস থাকলে ভাগ দিস কিন্তু।"

কামরুরই আফিং-এর মোড়ক সেটা। আফিং তেমনই আছে, শুধু মোড়কের কাগজটার মাথার কাঁটা দিয়ে ফুটো ফুটো আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ঃ—

"আপা, এমন করে মরলে শয়তানরা ভাববে আমরা ভীতু, এরপর সবাইকেই এমনি করবে। ওদের কাছে হার মানব না, তাই ফেরৎ দিলাম। তোমাকে সেলাম, তুমি আমার আপনার আপা। জোহরা।"

কামরুর গলায় একটা দলা ঠেলে উঠল। কোনরকমে সুফিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, আসামী কেমন আছে।

"আসামী? জোহরা? আ-হা-হা, আজ সকালে ও মারা গেছে।" সুফিয়া জবাব দিল।

"মিথ্যে কথা—" কামরু প্রায় চীৎকার করে উঠল। "ও মরেনি, ওকে মেরে ফেলেছে", বলে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আষাঢ় সংখ্যায়

গল্প

সমরেশ বসু

পুস্তক পরিচয়

গোপাল হালদার

নিখিল চক্রবর্তী

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ও অন্যান্য

* * "পরিচয়-এর কুড়ি বছর" এ-সংখ্যায় স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

* * "আসামের লোককলা" সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ এ-সংখ্যায় ছাপা হবার কথা ছিল। কিন্তু এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্প্রতি আমাদের হাতে কিছু নতুন মালমশলা এসেছে। সেই কারণে প্রবন্ধটি এ-সংখ্যায় ছাপা হল না। পুনর্লিখিত হয়ে প্রবন্ধটি পরবর্তী এক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

বাঙলায় শেকসপীয়র

গোপাল হালদার

নতুন সূচনা

"বাঙলা দেশে ১৮১৭-খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের স্থাপনার দিন হইতে শেকসপীয়র অনুশীলনের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থাকিলেও তাহা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে।" সেই ঐতিহ্যের ব্যাপকতর প্রসারের উদ্দেশ্যে এক বৎসরের উপর হল (৯ই এপ্রিল, ১৯৫১) সংগঠিত হয়, "বঙ্গীয় শেকসপীয়র পরিষদ"। পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য—"বাঙলা অনুবাদ ও অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে শেকসপীয়রের রচনার সহিত বাঙালীর পরিচয়কে আরো ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত করা।" পরিষদের বিদ্বান উদ্যোক্তাবা যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করেই বসে নেই—তার প্রমাণ তাঁদের প্রস্তুতি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই এক বৎসরের কয়েকটি আয়োজনঃ প্রথম ২৮শে সেপ্টেম্বরের "শেকসপীয়রের পাঠ-সন্ধ্যা", সেদিনও শেকসপীয়রের কিছু কিছু মূল পাঠ, দৃশ্যাভিনয়, কিছু কিছু বাঙলায় অনুদিত অংশের অভিনয় হয়েছিল। দ্বিতীয় আয়োজন—১৯৫২-এর জানুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনেকগুলি শেকসপীয়রীয় সনেটের অনুবাদ পাঠ ও অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহের সে-সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখা "শেকসপীয়র ও শ-এর নাটকে ক্লিওপেট্রার চরিত্র" প্রবন্ধ দিয়ে তৃতীয় আয়োজন হয ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) মাসে। মার্চ মাসে অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার গুহ একটি সুলিখিত প্রবন্ধে শেকসপীয়রের ট্রাজিডিতে নায়কগণের স্বভাববিরোধী আচরণের সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন। সে-আলোচনা জমে ওঠে। এর পরে গত ২০শে এপ্রিল (১৯৫২) সন্ধ্যা ছ'টায় শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে 'শেকসপীয়র দিবসের' আয়োজন—বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক শেকসপীয়র আলোচনার ইতিহাসে এটি এক শুভ সূচনা—উপস্থিত দর্শকদের মনে তা নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

২৩শে এপ্রিল শেকসপীয়রের মৃত্যুদিবস। শেকসপীয়রের জন্মদিন অনিশ্চিত। "যেদিন উদিলে তুমি বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু পারে"—আসলে সেদিনটি আর জানবার উপায় নেই, কিন্তু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তাঁর তিরোধানের দিবস, সে-দিনটিই পৃথিবীর পঞ্জিকায় শেকসপীয়র দিবস। রবীন্দ্রনাথের ওই শ্রদ্ধাঞ্জলিও শেকসপীয়রের তিনশত বৎসরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত হয় ১৯১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল।*

---

*রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতাটিও ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে তখনকার প্রকাশিত শ্রদ্ধাঞ্জলি "এ বুক অফ্ হোমেজ টু শেক্সপীয়র"-এ স্থানলাভ করেছে; রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে এখনো তা স্থানলাভ করেনি। "বঙ্গীয় শেকসপীয়র পরিষদ" তাঁদের এই বার্ষিক কার্যসূচীতে মূল ও অনুবাদ দুই-ই প্রকাশিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

'ম্যাকবেথ'-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার প্রথম কারণ, অভিনয়, আয়োজন ও অভিনয়কলায় 'ইউনিটি'-থিয়েটারের প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ ছিল না আর সেদিকে "গণনাট্য-সংঘ" পূর্বাবধিই ছিলেন সতর্ক ও সাবধান। দ্বিতীয়ত, শেকসপীয়রের মূল অভিনয় যতই উপাদেয় হোক, বাঙালী হিসেবে আমাদের কাছে অনুবাদ ও তার অভিনয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই আমরা যদি সেদিনের ম্যাক-বেথের অভিনয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দান করি তা হলে সেদিনকার কৃতী বক্তা ও উদ্যোক্তারা আমাদের ক্ষমা করবেন। এমন কি, এ প্রবন্ধে ম্যাকবেথেরও অভিনয়-সার্থকতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করে, অনুবাদের উৎকর্ষ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তা হলেও আশা করি—'গণনাট্য-সংঘ' ও তার অভিনেতা, তার প্রযোজনা-শিল্পী, আলোক-শিল্পী প্রভৃতি শিল্পীদের কৃতিত্ব খর্ব হবে না। সে-বিষয়ে এই কথাই সম্ভবত যথেষ্ট হবে যে, ক্লাসে-পড়া 'ম্যাকবেথ'ও এই নাট্যাভিনয়ের সূত্রে না দেখলে তার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারতাম না; এবং সেদিনের 'ম্যাক-বেথ'-অভিনয়-নৈপুণ্য দেখেই আমরা আশান্বিত হয়েছি—বাঙালীও শেকসপীয়র অভিনয় করতে পারবে।

কিন্তু বাঙালীর সে-কৃতিত্ব নির্ভর করবে অনেকাংশে বাঙলা ভাষায় শেকসপীয়রের অনুবাদ-কৃতিত্বের উপরে। যাঁরা তাই বাঙলায় শেকসপীয়রের অনুবাদ অগ্রসর হবেন তাঁদের দায়িত্ব গুরুতর; অথচ সে-তুলনায় সাধুবাদ অপেক্ষা অপবাদই তাঁদের ভাগ্যে জুটবার অধিক সম্ভাবনা। ম্যাকবেথের এই দুই অঙ্কের অনুবাদক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়ও সাধুবাদ অর্জন করেছেন সেদিনের অভিনয়ের পরিচালক ও অভিনেতাদের কাছ থেকে—যাঁরা সে-অনুবাদ খুঁটিয়ে বিচার করতে পেরেছেন। কিন্তু সে-তুলনায় তাঁর অনুবাদে কুণ্ঠাবোধ করেছেন শ্রোতৃ-সমাজ যাঁরা অনেকে মূলের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু জানতেন না অনুবাদের স্বরূপ; মনে রাখেন নি, হয়তো অভিনয়-কালীন আবৃত্তির আকস্মিক ভুল-ত্রুটি। অনুবাদের ত্রুটি তাঁদের কানে আরও বিশেষ করে, বিঁধেছে আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে—প্রথমত, 'ম্যাকবেথ' ইতিপূর্বেই বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তার অভিনয়ও হয়েছিল প্রথম ১৬ই মাঘ, ১২৯৯ সালে—সম্ভবত জানুয়ারির ৩১শে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে); আর সে-অনুবাদের সঙ্গে অনেকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলেও জনশ্রুতিতে তার খ্যাতি সর্ব-স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত অনুবাদের মূলনীতি ও রীতি সম্বন্ধে বাঙলায় আজও কোন সিদ্ধান্ত নেই। অনুবাদের নামে কার্যত যা অনেক ক্ষেত্রে চলে তা শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অপবাধজনক।[১]

---

[১] সম্প্রতি একটি রুশ উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের বাঙলা 'অনুবাদ' হাতে এসেছিল। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার ইংরেজি লেখাকে ২০০ পৃষ্ঠা বাঙলায় সংক্ষিপ্ত করেও বাঙালী 'অনুবাদক' তৃপ্ত হন নি। জানিয়েছেন, দুইটি ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং কিছু

অনুবাদ সমস্যা

ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুবাদ একটা কঠিন সমস্যা। কারণ, সে-সাহিত্যের ভাব-জগৎ এক ভিত্তির উপর গঠিত—গ্রীক-লাতিন-হিব্রু (সম্প্রতি যন্ত্র-শিল্পজাত ইওরোপীয়) উপাদান তাতে প্রধান। আমাদের ভাবজগৎ অন্য ভিত্তির উপর তৈরি—প্রধানত তা ভারতীয়, অতি ক্ষীণ উপাদান আছে ফারসী-আরবীর। পাশ্চাত্ত্যদের সামাজিক জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আমাদের সামাজিক জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশেও পার্থক্য অনেক। অবশ্য আধুনিককালে শিল্পোদ্যোগের প্রসাদে বিচ্ছিন্ন দেশ ও সমাজ আর নেই, সকলেই সহগামী; ক্রমশই তাদের মিলের দিক অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে। তাই আধুনিক অনেক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের জগৎ আমাদের নিকট যত সহজগ্রাহ্য পূর্বতন কোন কোন পাশ্চাত্ত্য লেখকের জগৎ তত সহজবোধ্য না ঠেকতেও পারে। অব শ্য এটা বাইরের হিসাব, মামুলি বিচার। এই বাইরের বিচারে গর্কী-টলস্টয়-চেখব্ আমাদের যতটা নিকটের, গোগোল-পুশকিনও ততটা নিকটের নয় (অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার পাবলেনকো-আজায়েভ-নিকোলায়েভ প্রভৃতিদের জগৎ মনে হয় আরও সুদূর—কারণ, যেখানে 'নতুন মানুষের' আবির্ভাব ঘটেছে)। কিংবা, ডিকেন্‌স যতটা নিকটের সে-তুলনায় শেকসপীয়র দূরবর্তী। অবশ্য ভিতরের দিককার বিচারে জীবনের নাট্যকার শেকসপীয়র "তুমি আমি, সকলের আত্মার আত্মীয়"। তা হলেও তাতে অনুবাদকের সমস্যা কিছুমাত্র লাঘব হয় না। ভাবজগতের দিক থেকেও শেকসপীয়রের অনুবাদ ভারতীয় অনুবাদকের পক্ষে তাই এক কঠিন সাধনা।

কিন্তু শুধু ভাবজগতের বিষয়কে ভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করলেই কি তাকে অনুবাদ বলা ঠিক? না। কারণ, বড় জোর তা ভাব-পরিবেশন,—ভাবানুবাদ বা মর্মানুবাদ কথা দুটো অবশ্য অর্থহীন স্ববিরোধী—অনুবাদ নয়। ভাব ও রূপের যে অর্ধনারীশ্বর রূপে সাহিত্যের প্রকাশ অখণ্ড, অনুবাদকের পক্ষেও দায়িত্ব সেই অখণ্ডিত রূপকে ভাষান্তরে রূপ দান। অনুবাদকালে কোন সাহিত্য-সম্পদের রূপায়ন বৈশিষ্ট্যকে তাই একেবারে অগ্রাহ্য করা তো চলেই না, 'নিতান্ত গৌণ' বলাও অনুবাদকের পক্ষে ত্রুটি। অবশ্য একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন—অনুবাদ মানে আক্ষরিক ভাষান্তর-সাধন নয়। এবং তাই অনুবাদকের পক্ষে মূলভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে হুবহু রূপান্তরিত করাও সম্ভব নয়—বিশেষত নতুন ভাষার প্রকৃতি আর মূলভাষার প্রকৃতি যদি সত্যিই নানাদিকে স্বতন্ত্র হয়। যেমন, ভারতীয় হিন্দু-আর্য ভাষা-

---

কিছু সংযোগ করেছেন, এবং তাঁর "বিবেচনায় এ অধিকার অনুবাদকের আছে।" মূঢ়তার ও ধৃষ্টতার কি কোন সীমা নেই? সাদাসিধা বললেই হয়—এ অনুবাদ নয়; বাঙালীর নিকট শুধু উপন্যাসটির কাহিনী পরিবেশন। তা তেমন দোষাবহ নয়।

গোষ্ঠীর এই প্রকৃতি মোটামুটি এক—তাদের বাক্যরীতি (সিনট্যাক্স), এমন কি বাগ্‌-ধারা (ফ্রেজ, ইডিয়ম) প্রভৃতিতে মিল অনেক। সম্ভবত, ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যেও এরূপ প্রকৃতিগত মিল আছে। কিন্তু ইউবোপীয় ভাষাগুলির প্রকৃতি আর ভারতীয় ভাষাসমূহের এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র—এক গোষ্ঠীর ভাষার কথাকেও তাই অপর গোষ্ঠীর ভাষার কথায় ঢালা সময় সময় অসম্ভব। পাশ্চাত্ত্য যে-কোন গ্রন্থের অনুবাদে এ-সমস্যা বাঙলায় উঠবে। এ-সমস্যা গুরুতর হয় কাব্য অনুবাদের প্রশ্নে—কাব্যের প্রাণ অনেকাংশে নির্ভর করে ছন্দ ও চিত্রকল্পের (ইমেজ-এর) উপরে। ভিন্ন ভাষায় সেই চিত্রকল্প ও সেই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব বলেই কোন কোন মনস্বী বলেন—কবিতার অনুবাদ চলে না, চলে নব-রূপায়ন। এতটা না মানলেও শেকসপীয়রের বেলা মানতে হয়—এই সমস্যা আরও কঠিন। কারণ, শেকসপীয়র রিনাইসেন্সের যে-জগতের মানুষ, সেখানে মানুষ কথা নিয়ে, শব্দ নিয়ে নতুন করে বিমুগ্ধ হতে আরম্ভ করেছে—কথার খেলায় শব্দের ঝঙ্কারে। শেকসপীয়র সেই বাড়াবাড়িকে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু নিজেও তিনি আবার এক-আধ সময়ে সুযোগমতো এ খেলায় মেতে উঠেছেন। সে-সব স্থানে ভারতীয় ভাষায় যিনি শেকসপীয়র অনুবাদ করতে সত্যই যত্নশীল, তাঁরও মনে হবে —এর অনুবাদ অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই হল অনুবাদকের সাধনা—একের পর একে সে সাধনায় স্থান নেবে, সিদ্ধিকে করবে সন্নিকট, প্রায় সমায়ত্ত। কারণ, আমাদের ভাষাও তো আর গতিহীন অচল জিনিস নয়। তার প্রকৃতিরও প্রকাশ ঘটবে, বিকাশের নিয়মে সে-প্রকৃতি আত্মসাৎ করে নেবে নতুন রীতি, নতুন পদ্ধতি। বাঙলা ভাষা আজ যে নতুন রূপ লাভ করেছে, এক শত বৎসর পূর্বে কে তা কল্পনা করতে পারত? আগামী পঞ্চাশ বা এক শত বৎসরে তার প্রকাশ-গতি হয়তো আর অত ত্বরিত ও চমকপ্রদ হবে না; কারণ, আজ সে কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পৌঁছে গিয়েছে, তার বৃদ্ধি এখন হবে ধীরে, প্রাণশক্তির ও পুষ্টিশক্তির স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু বৃদ্ধি হবে—পাকিস্তানী জেহাদ বা হিন্দুস্থানী শুদ্ধি-দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও শ্রীবৃদ্ধিই হবে। ব্যবহারিক জীবনে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বাঙলা ভাষা, আরও প্রাঞ্জল হবে, স্বচ্ছন্দ হবে, নমনীয় হবে, বলিষ্ঠ হবে, সরল হবে, সুদৃঢ় হবে, আবার হবে কঠিন তির্যকগতি। এক কথায়, পৃথিবীব্যাপী মানুষের অজস্র ভাব ও চিন্তা ও বহু-মুখী জীবনধারা প্রকাশের মতো শক্তি আহরণ করবে বাঙলা ভাষা—আপনার প্রকৃতিকেও ভেঙে ভেঙে গড়ে গড়ে—তাতে সন্দেহ নেই। তাতেই বাঙলার অনুবাদক-গোষ্ঠীরও কাজ দিনের পর দিন আরও সহজ হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, বাঙলা ভাষার সেই সমারব্ধ বিকাশের ধারায় যেমন দান জোগাবেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক ও কারুজীবী কাজের মানুষ, তেমনি শক্তি জোগাবেন বাঙালী অনু-

বাদক-গোষ্ঠীও। এ-কথাও বলা অন্যায় হবে না—এ শঙ্কিতা, সংকুচিতা বঙ্গবাণী সাহিত্যস্রষ্টার হাত ধরে যদি এগিয়ে যান এক পদ, এমন সার্থক অনুবাদকও থাকবেন যিনি তাঁকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এই বিকাশের পথে আরও একটি পদ।

অবশ্য এইখানেই একটা সমস্যাও আছে; কারণ, সাহিত্যিকের হাতে-হাত মিলিয়ে ভাষা বিকশিত হয় স্বচ্ছন্দে। কিন্তু অনুবাদকের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধবার কালে তার সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ সেখানে মাঝখানে থাকে ভিন্ন ভাষার একটি খাদ; তার ওপর দিয়ে সেতু নির্মাণ না হলে অনুবাদের পক্ষে বাহ্য আকর্ষণে ভাষালক্ষ্মীর পক্ষে পতনই অনিবার্য। মূল ভাষাব তুলনায় অনুবাদ্য ভাষার শক্তি কোন্ স্তবে নিবন্ধ, দুই ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য তাদের সমান্তরাল বিকাশে কতটা সেতু-সম্পর্ক সম্ভব হয়ে উঠেছে—অনুবাদের ক্ষেত্রে এ-বিচার তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে-বিচারে অনুবাদক যদি গতানুগতিক হন তা হলে তাঁর অনুবাদ হবে প্রাণহীন। কিন্তু সে-বিচারে যদি তিনি অতি-অগ্রগামী হন তা হলেও তাঁর পক্ষে পদস্খলন অনিবার্য। আমাদের ভাষা আজ কতটা অগ্রসর শুধু তাই নয়, আমাদের ভাষা এর পরে কোন্ পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত,—এ-বোধ যেমন অনুবাদকের থাকা প্রয়োজন, তেমনি এই বোধও প্রয়োজন—যে-পা ভাষালক্ষ্মী বাড়াননি এখনো, তারও পরেকার পদক্ষেপের জন্য এখনি সেই পাটি ধরে টানাটানি করলে লক্ষ্মী ধরাশায়িনীই হবেন।

শেকসপীয়রের অনুবাদ-আদর্শ

অনুবাদের এই সাধারণ সূত্র নিবে আলোচনা ছেড়ে বিশেষ অনুবাদের কার্যগত রীতিপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করাই বোধ হয় শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই—বাঙলায় শেকসপীয়র আমরা কিরূপে পেয়েছি ও কিরূপে পেতে পারি। সাধারণ আলোচনায় আমরা প্রধান সমস্যাগুলি দেখেছি পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভাবগত ও পরিবেশক পার্থক্য; দুই ভাষা-গোষ্ঠীর প্রকৃতিগত পার্থক্য, ও রূপায়নের সমস্যা; আর শেকসপীয়রের নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্যের রূপায়ন-সমস্যা। পাশ্চাত্ত্য জগতেও শেকসপীয়র অনুবাদে সমস্যা আছে। কিন্তু তা ঠিক ঐ ধরনের নয়; যেমন ফরাসী ভাষার প্রকৃতিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এখনো ধাতস্থ হয়নি, ফরাসীতে তাই শেকসপীয়রের কাব্যপ্রতিভাকে কিভাবে রূপদান করা হয়, তা বোঝা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বহু বৎসর ধরে তবু শেকসপয়ীরের অনুবাদ-সাধনা পাশ্চাত্ত্য দেশে গড়ে উঠেছে। আমরা বিশেষ করে তার পরিচয় পেয়েছি রুশিয়ায়—সেখানে এ-সাধনা একটা রীতিতে প্রায় সিদ্ধির দিকে চলেছে। শুধু শেকসপীয়রের ভাব ও কাব্য-সম্পদই ভাবান্তরিত হচ্ছে তা নয়; সোবিয়েৎ অনুবাদকেরা মূলের সম-পংক্তিতে তা অনুবাদ করছেন রুশ ভাষায়। শেকসপীয়রের বাক্-চাতুর্য, বাক্-বৈশিষ্ট্য সবই তাঁরা রুশ ভাষায় পরিবেশন করতে ব্রতী। মনে হয়, এই শেকসপীয়র-অনুবাদের মধ্য দিয়ে সোবিয়েৎ

অনুবাদকেরা পৃথিবীতে অনুবাদ-কলার এক নতুন আদর্শ স্থাপন করছেন, এক বিপ্লব সূচিত করছেন।

কিন্তু বিপ্লব রপ্তানি করার মতো পণ্য নয়। হয়তো অনুবাদ-বিপ্লবেরও জন্য চাই ভাষার ভূমি-সংস্কার, উপযুক্ত ক্ষেত্র-প্রস্তুতি। রুশ ভাষার জমি যেরূপ তৈরি হয়েছে, বাঙলার জমি তেমনি উর্বরা হলেও তেমনিভাবে তৈরি হয়েছে কি? এ-প্রশ্ন আমাদের 'বাঙলার শেকসপীয়রের' দাবি করবার সময়ে আজ তাই মনে উদিত হয়েছে। আর এ-প্রশ্নই 'ম্যাক্‌বেথের' প্রথম দুই অঙ্কের অনুবাদ-সূত্রে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্বাভাবিক নীতি-নিষ্ঠার ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার বলে শ্রীরঙ্গমের সেই অভিনয় উপলক্ষে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন।

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় 'ম্যাক্‌বেথের' দুই-অঙ্কের অনুবাদের আধুনিকতম ও উচ্চতম অনুবাদ-আদর্শই গ্রহণ করেছেন। তিনি সমপঙ্‌ক্তিক অনুবাদ-নীতিই শুধু গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছেন সে সঙ্গে তেমনি অন্যান্য রীতি ও পদ্ধতির আদর্শ। এ-আদর্শ হল মূলকে ভাব বা ভাষার অবিকৃত রেখে যথাযথ অন্য ভাষায় পরিবেশন। মূলের বৈশিষ্ট্য পবিবর্তন করা চলবে না, মূলের শব্দগুণ ও শব্দজোট (ফ্রেজিওলজি) যথাসম্ভব রক্ষা করতে হবে; জিনিসটি হবে অনুবাদ—মূল রচনা নয়, বা মূলের মর্মবাদও নয়। নতুন ভাষার অর্থ ও বাক্‌-শুদ্ধির (ইডিয়ম) দিকে চক্ষু রেখে মূলের ভাষাও যথাযথ রূপে রূপান্তরিত করতে হবে, রাখতে হবে মূলের অলঙ্কার—যত তাতে কষ্টকল্পনা থাক; মূলের বাক্‌-বিন্যাসের (ডিকশন) খেয়ালি-পনা,—এমন কি, যেটুকু প্রাচীনত্বের ছাপ থাকে মূল ভাষায় ভাষান্তরেও রাখা চাই তেমনি ছাপ, তেমনি বিচিত্র গদ্য, তেমনি মিলান্তিক পদ্য।

এই নীতি অনুসরণ করে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় 'ম্যাক্‌বেথের' দু-অঙ্ক যেভাবে ভাষান্তরিত করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট। এই অনুবাদ-নীতি জানা না থাকলে শ্রোতার পক্ষে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পক্ষে অবিচাব করা স্বাভাবিক। পাঠকের পক্ষে তাই এই নীতি অনুযায়ী তিনি যে-কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা মূলের সঙ্গে এবং অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করে আলোচনা করা সম্ভবপব। পাশাপাশি মূল এবং সকল বাঙলা অনুবাদ এক সঙ্গে উপস্থিত করতে পারলে পাঠকেব পক্ষে এ-কাজ সুসাধ্য হত। কিন্তু তার স্থানা-ভাব। এখানে আমরা শুধু প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি ও আলোচনা দিয়ে পাঠকের দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পারি, এবং আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারি, তার বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।

শেকসপীয়রের অনুবাদে সকল ভাষার অনুবাদকের পক্ষেই 'ম্যাক্‌বেথ' এক কঠিনতম পরীক্ষা। কারণ, শেকসপীয়রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁব ট্রাজিডি কয়খানি, আর সে-ট্রাজিডির মধ্যে অদ্ভুত রচনা 'ম্যাকবেথের' ডাইনী-ভগ্নীদের দৃশ্যাবলী, কথাবার্তা।

'ম্যাকবেথ' নাটকের উদ্বোধনই তাদের দিয়ে। এ-দৃশ্যের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের পরেও নীরেন্দ্রনাথ রায়ও যে সার্থকতা অর্জন করেছেন তা নিঃসন্দেহ। সুপরিচিত হলেও তুলনার সুবিধার জন্য দৃশ্যটি ক্ষুদ্র বলেই আমরা মূলের সঙ্গে বিভিন্ন বাক্যাংশ যথাক্রমে উদ্ধৃত করছি:

First Witch—When shall we three meet again
In thunder, lightning or in rain?

রবীন্দ্রভাষ্য—ঝড়বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিন জনে

গিরিশভাষ্য—দিদি লো, বল্‌না আবার
মিলব কবে তিন বোনে?
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্ চকাচক্ হানবে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঘন্‌ঘনে?

নীরেন্দ্রভাষ্য—আবার কবে মিলব মোরা তিন জনে
বৃষ্টিবাদল বাজ-বিজুলীর ঘন্‌ঘনে?

Second Witch—When the hurlyburly's done,
When the battle's lost and won.

রবীন্দ্রভাষ্য—ঝগড়াঝাটি থামবে যখন
হারজিত সব মিটবে রণে।

গিরিশভাষ্য—যখন বাঁধবে, মারবে, হারবে,
জিনবে, থামবে লড়াই রণ্‌রণে।

নীরেন্দ্রভাষ্য—হুটোপুটি থামবে যখন
হারে-জিতে শেষ হবে রণ।

এখানে নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। কারণ, তা সর্বাপেক্ষা বেশি মূলানুসারী, ভাবে-ভাষায়, ছন্দোনিয়মে, শব্দ-যোজনায়। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ নিখুঁত, কিন্তু দুই ডাইনীর কথা এক সঙ্গে না নিলে তার ছন্দ পূর্ণ হয় না। সেদিকে তা মূলানুযায়ী নয়। গিরিশচন্দ্রের ভাষ্যকেও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু তা অনুবাদ অপেক্ষা মর্ম-গত রচনা, প্রায় নতুন রচনা।

এর পরের অংশটুকু নেওয়া যাক:

Third Witch—That will be ere the set of sun.

First Witch—Where the place?

Sec. Witch—Upon the heath.

Third Witch—There to meet with Macbeth.

রবীন্দ্রভাষ্য: তৃতীয়—সাঁঝের আগেই হবে সে তো,
প্রথম—মিলব কোথায় বলে দে তো।
দ্বিতীয়—কাঁটাখোঁচা মাঠের মাঝ।
তৃতীয়—ম্যাক্‌বেথ সেথা আসচে আজ।

গিরিশভাষ্য: তৃতীয়—চিকিচিকি ঝিকিমিকি,
ডুব্‌ ডুব্‌ হবে চাকি,
লড়াই কি আর থাকবে বাকী।
প্রথম—কোন্‌খানে, বোন্‌ কোন্‌খানে,
বোন্‌ কোন্‌খানে?
ঠিকঠাক বলে দে লো,,
যেতে হবে কোন্‌খানে?
দ্বিতীয়—ঢ্যঙো রাঁঢ়ীর মাঠে যাব।
তৃতীয়—ম্যাকবেথেরে দেখা দেব,
ঘাপটি মেরে এক কোণে।

নীরেন্দ্রভাষ্য: তৃতীয়—সূর্য্যি ডোবার আগেই সেইক্ষণ।
প্রথম—ঠাঁইটা কোথায়?
দ্বিতীয়—সেই মাঠে রে।
তৃতীয়—ভেটিব সেটা ম্যাকবেথেরে।

এখানেও সেই এক কথা। তবে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রাঞ্জল। সহজগতি, সহজসাধ্য কথাবার্তা। নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদ সে-তুলনায় আড়ষ্টগতি, প্রাচীনতা-চিহ্নিত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তা অগ্রাহ্য নয়, বরং শোভন। তা ছাড়া, মূলে যে-শব্দের উপর কথার জোর যে-ভাবে (প্রথম ডাইনীর প্রশ্ন ও দ্বিতীয় ডাইনীর উত্তর দ্রষ্টব্য) সাজালে পড়ে, তিনিও ঠিক সেভাবেই অনুবাদে শব্দ সাজিয়েছেন—'ম্যাক্‌বেথ' শব্দটি এজন্যই পংক্তির শেষে আনা অনিবার্য।

এর পরের দৃশ্যের শেষাংশ এক সঙ্গে দেখা যাক:

First Witch—I come Graymalkinx!
Sec. Witch—Paddock calls.
Third Witch—Anon.
All—Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air.

রবীন্দ্রভাষ্য: প্রথম—কটা বেড়াল যাচ্ছি ওরে!
দ্বিতীয়—ওই বুঝি ব্যাঙ্‌ ডাক্‌ছে মোরে!
তৃতীয়—চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা করে।

সকলে—মোদের কাছে ভালোই মন্দ,
মন্দ যাহা ভালো যে তাই;
অন্ধকারে কোয়াশাতে,
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

গিরিশভাষ্য: প্রথম—যাই যাই যাই লো দিদি,
ডাক্‌ছে মেনী ন্যালনেলে;
দ্বিতীয়—পাঁদাড় থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ওই ফ্যারকা জিব্‌টা মেলে।
তৃতীয়—আয় যাই চলে, আয় যাই চলে,
আয যাই চলে।
সকলে—ভাল মোদের কাল, মন্দ মোদের ভাল,
আঁদাড়-পাঁদাড় আনাচ-কানাচ ঘুরে বেড়াই চল।

(দ্রঃ এর পরে একটি ডাইনীদের কোরাস নতুন করে আমদানি করেছেন গিরিশচন্দ্র। লেঃ)

নীরেন্দ্রভাষ্য: প্রথম—যাচ্ছি দাঁড়া, কটাশে মেনি!
দ্বিতীয়—ব্যাঙ্‌টা ডাকে
তৃতীয়—আমিও যাই
সকলে—ভালোটাই মন্দ আর মন্দটাই ভালো,
কুয়াশা আর নোংরা হাওয়ায় উড়ে বেড়াই চলো।

বলা বাহুল্য, দৃশ্য শেষের এই জোটকের শব্দ কয়টির গুরুত্ব নাটকের ১ম অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে পরিস্ফুট (৩৮নং পংক্তি)। কারণ, ম্যাকবেথ রঙ্গমঞ্চে প্রথম পদার্পণই করেন এই শব্দ কয়টি বলে:

So foul and fair a day I have not seen.

রবীন্দ্রনাথ শুধু ডাইনীদের কথাবার্তাই অনুবাদ করেছেন, তাই ম্যাকবেথের এ-কথা কিভাবে তিনি অনুবাদ করতেন, জানা নেই। গিরিশচন্দ্র এ-বাক্যের অনুবাদই প্রায় করেননি। তাঁর ভাষ্যে ম্যাকবেথ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এই বলতে বলতে:

এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হিমকর,
দুর্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।

এখানে প্রথম দৃশ্যের 'ফেয়ার অ্যান্ড ফাউল'-এর শব্দানুষঙ্গ একেবারেই অজ্ঞাত। নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদে তা সুরক্ষিত হয়েছে। তাতে ম্যাকবেথ মূলানুযায়ী প্রবেশ করেই বলেন:

'এত মন্দ এত ভালো দিন দেখিনি কখনো।' মূলের গাম্ভীর্য যেন একটু ফিকে হয়েছে। কিন্তু এ-অনুবাদ মূলানুযায়ী।

সম্ভবত নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই দৃশ্যের অনুবাদ থেকেই পরিষ্কার হয়েছে। এবং এখানে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। 'ম্যাকবেথের' যতটা তিনি অনুবাদ করেছেন তাতে এই বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু বৈশিষ্ট্য সর্বত্র ততটা সার্থক নয়। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই; কারণ, দেখতে পেয়েছি গিরিশচন্দ্র মূলানুযায়ী অনুবাদ করতে অত দৃঢ়-প্রযত্ন নন। তিনি নিজের ইচ্ছামতো মূলের মর্মানুসারী রচনা করেছেন। নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদে যেরূপ স্থলে শ্রোতা বা পাঠক পরিতৃপ্ত হন না সে-সব স্থলে তাঁর অনুবাদ আদর্শ-সম্মত, কিন্তু বাঙলায় কষ্ট-কল্পনা ও কষ্ট রচনা। এরূপ দু'একটি উদ্ধৃতি দিলেই কথাটা বোঝা যাবে। ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে ব্যাংকো ম্যাকবেথকে বলছেন:

"মহাশয়, কেন চমকান, যেন পেয়েছেন ভয়
শুনি এই মঙ্গল বারতা?"...ইত্যাদি

এখানে সম্মান-সূচক সর্বনাম ('আপনি') ও ক্রিয়াপদ ('চমকান', 'পেয়েছেন') অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙলার ঐতিহ্যে অচল। সাধারণ মধ্যমপুরুষই প্রশস্ত। নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদেও তো এ-দৃশ্যের রস্ প্রমুখ পাত্ররা সেরূপ ভাবেই ম্যাকবেথকে সম্ভাষণ করছেন:

"ম্যাকবেথ, মহারাজ মহাসুখী আজ
তোমার সাফল্য শুনে..." ইত্যাদি

কিন্তু এটি তুচ্ছ ত্রুটি। তার অপেক্ষা জটিল প্রশ্ন এই ধরনের অনুবাদ:

"একি, শয়তানও বলে সত্য কথা! (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

গিরিশচন্দ্রের—' একি, প্রেতে কহে সত্য কথা'—মূল্যহীন। কিন্তু নীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদ ইংরেজিগন্ধী। প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে

(১) ম্যাকবেথের পত্রের—"একথা তোমার হৃদয়ে জমা রেখো, এখন বিদায়" ('Lay it to thy heart, and farewell) বাঙলায় আমরা কথা মনে (বা হৃদয়ে) 'জমা' রাখি না; লুকিয়ে রাখি, গোপন রাখি, হয়তো চেষ্টা করলে 'সঞ্চিত' রাখি—নইলে বাঙলা ইডিয়মের উপর কিছু জবরদস্তি ঘটে।

(২) লেডি ম্যাকবেথের প্রসিদ্ধ উক্তি (৩৮-৪০ পংক্তি)

"সেই বায়সের স্বর-ভাঙা, যার কণ্ঠে ধ্বনিতেছে
ডানকানের শেষ আগমন আমার প্রাকার মধ্যে।
(The raven is hoarse that croaks)

এখানে পাশ্চাত্ত্য একটি ধারণাকে বাঙলায় গ্রথিত করা হয়েছে তা বোঝা যায়। কিন্তু এ-অনুবাদ আপত্তিকর নয়, এই আমাদের মত।

(৩) কিন্তু, "তার ও সাফল্যের মাঝে নাহি যেন রাখে ব্যবধান"
এ অনুবাদও তত সঠিক নয়। বাঙলায় এ-বাগ্‌ভঙ্গি কানে ও মনে বাধে।
(৪) এরূপই,

"আমার জিহ্বার জোরে তিরস্কারি দূর করে দিই,
যা-কিছু বিঘিন্নছে তোমা হতে সেই সোনার মুকুট,
ভাগ্য আর অমানুষী শক্তি যাহা মনে হয়,
পরায়েছে তোমার মাথায়।"

And chastise thee with the valour of my tongue,
All tha impedes thee form the golden round,
Which fate and metaphosical aid doth seem,
To have thee crowned withal.

এখানে 'তিরস্কারি' প্রভৃতি নামধাতুর প্রয়োগ আপত্তিকর হত না—মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের ঐতিহ্যে তা সচল। কিন্তু আসল বাধা রিলেটিভ ক্লজ-এর বঙ্গানুবাদে সেরূপ বাক্যরীতি দিয়ে। কথিত বাঙলায় এরূপ বাক্যরীতি হয়তো কিছু কিছু (যৎ-তৎ যোগে) পূর্বাপরই ছিল। আধুনিক কালে ইংরেজির প্রভাবে তা আরও নানা আকারে ও নানা প্রকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রকৃতি এ-জাতীয় বাগ্‌ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, এখনো তা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেনি। সে-চেষ্টা আরও বাধা পায় ছন্দোবদ্ধ কবিতায়, এবং তখন 'তিরস্কারি' 'বিঘিন্নছে' প্রভৃতি গ্রাহ্য রূপও বাঙলার স্বভাব-গতিকে বিঘিত করে।

উপরের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে সম্ভবত এ-কথা পরিস্কার হয়েছে যে, পাশ্চাত্ত্য ভাবজগৎ ও কবি-কল্প (ইমেজ) গ্রহণ করতে ততটা আপত্তি হয় না (যদিও তাতে অন্য জগতের গন্ধ থাকে), কিন্তু অসুবিধা হয় (ক) পাশ্চাত্ত্য ইডিয়ম পরিপাক করতে: (খ) 'গুরুচণ্ডালী' দোষে (চলতি ও সাধুভাষার মিশ্রণে নয়, চলতি ও সাধুভাষার বি-মিশ্রণে বা প্রীতি-মিশ্রণে); এবং (গ) ইংরেজি রিলেটিভ ক্লজ বাঙলায় মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে। শেকসপীয়রের ভাষায় ঋজু-কঠিন মিশাল আছে; এলিজাবেথীয় যুগে সাহিত্য-বিধাতাদের হাতে ইংরেজি ভাষা তখন ওসব অদ্ভুতত্ব নিয়ে গড়ে উঠছে, কিন্তু 'গুরুচণ্ডালী' দোষ যাকে বলে তা নেই (বিদ্রূপের উদ্দেশ্য ছাড়া)। যা আছে তা এখন আর্ষ প্রয়োগ হিসেবে কানসহা। এ-দোষ অনুবাদকের পক্ষে কিন্তু বর্জনীয়। ইডিয়ম ও যৎ-তৎ বাক্‌রীতি সম্পর্কে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। কারণ, বাঙলা ভাষা এ-সব রীতিকে আয়ত্ত করবার জন্য সচেষ্ট, স্বেচ্ছায় ও বাধ্য হয়ে। নীরেন্দ্রবাবু বাঙলা ভাষার সেই ভাবী সামর্থ্যকে গণনা করেছেন, এবং নিজের প্রয়াসের দ্বারা সে-সামর্থ্য সঞ্চয়ে ভাষাকে সাহায্যও করছেন। এ-যুক্তি মানলেও বলব—কোন কোন স্থানে তিনি বাঙলার বর্তমান রূপ থেকে সেই ভাবী রূপকে

বেশি জোর দিয়ে বর্তমান অবস্থার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তার মূল কারণ—তিনি অনুবাদের যে-আদর্শ গ্রহণ করেছেন তা পাশ্চাত্য ভাষার পক্ষেও শেকসপীয়র অনুবাদে আজই সম্ভব হচ্ছে। বাঙলা ভাষা সে-তুলনায় কয়েকটি স্তর পশ্চাতে রয়েছে। তাই ঠিক সেই অনুবাদ-আদর্শের সম্পূর্ণ প্রয়োগ এখনো সম্ভব নয়—তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, এবং এমন পথেও গিয়ে ঠোক্কর খায় যা পরবর্তী কালে বাঙলা ভাষার স্বচ্ছন্দ বিকাশে দেখা যাবে আসল অন্ধ গলি। আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে তাই প্রয়োজন—ভাষার উপস্থিত পরিস্থিতি সম্বন্ধেও চেতনা।

এই মাত্রার দিকটি অমান্য না করেই শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র রায় 'ম্যাকবেথের' এই দু' অঙ্ক অনুবাদে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বাঙলা অনুবাদের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। শুধু তাঁর আদর্শই যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা নয়, সেই আদর্শের সুষ্ঠু প্রয়োগেও তিনি অধিকাংশ স্থানে সিদ্ধকাম। দীর্ঘ প্রবন্ধকে দীর্ঘতর করবার উপায় নেই, নইলে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেত—'ম্যাকবেথের' অমর কাব্য-উক্তি কতটা সার্থকভাবে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়। আমরা তাই সাহিত্যবিদ্‌দের নিকট নিবেদন করব—তাঁরা বাঙলায় অনুবাদ-আদর্শ, বিশেষত শেকসপীয়রের অনুবাদ-আদর্শ সম্বন্ধে বিচার করুন (আমাদের বিবেচনায় শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় যথার্থ আদর্শই গ্রহণ করেছেন) এবং তার প্রয়োগ-ক্রমও নির্ধারণ করুন। অবশ্য সে-আলোচনার সুবিধা হয় যদি নীরেন্দ্রবাবু তাঁর 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। বাঙলায় শেকসপীয়র পরিবেশনে তিনিই নতুন পথিকৃৎ, এ-স্বীকৃতি বাঙালীর নিকট তাঁর প্রাপ্য হবে।

পুস্তক পরিচয়

AUTOBIOGRAPHY OF AN UNKNOWN INDIAN

Nirod Ch. Chaudhuri, MacMillan & Co , Ltd.

গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী দেশী ও বিদেশী পাঠক-মহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদানুবাদ শোনা গিয়েছে নানাদিকে। তাই বইখানি হাতে আসামাত্র আদ্যোপান্ত দুইবার পড়ে দেখবার লোভ সামলানো গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গ্রন্থ অনেকাংশে অসামান্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রন্থকারের ভাষার দীপ্তি, লেখার প্রসাদগুণ, প্রকাশ-ভঙ্গির বলিষ্ঠতা। অনেকের মতে নীরদবাবুর ইংরাজি ঠিক আধুনিক ইংরাজ লেখকের পর্যায়ে পড়ে না, আমার মনে হয়, এখানে সে-প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর। লেখক যদি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর স্টাইল সার্থক, প্রচলিত রীতি থেকে পৃথক হলেও সার্থক। নীরদবাবুর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য আছে, পাঠককে তিনি স্পর্শ এমন কি অভিভূত করতে পারেন।

মৌলিক স্বকীয় চিন্তার যে-ছাপ আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও অসাধারণ বলা উচিত। নির্ভীকভাবে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রচলিত সংস্কারকে তীব্র আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হননি, জাত্যভিমান ও আত্মতুষ্টির ভাবকে করেছেন অগ্রাহ্য, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত অনেক গলদকে দিনের আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন। স্তোকবাক্যে আমরা অনেক সময় মন ভোলাই, বক্তৃতা ও কথার 'প্ল্যাটিচুডে'র স্রোতে ভেসে চলি, নির্মম সমালোচনায় কশাঘাতকে তাই শ্রদ্ধা করাই সঙ্গত। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি অধ্যায়ের উল্লেখ করব—ভারতীয় রেনেসাসের জয়যাত্রা, মহানগরী কলিকাতা ও জ্ঞানচর্চার উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগুলি-নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য।

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রন্থকার-পাশ্চাত্ত্য জগতে 'অজ্ঞাত ভারতীয়' হতে পারেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা একেবারে অবিদিত নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলের বাইরে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় অপরিচিত পাঠক সহজে ভুলতে পারবেন না। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বদাই কৌতূহল জাগায়, লোক-

চক্ষুর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মচরিতের উদ্দেশ্য যদি আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনা-সমষ্টি নয়। ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু। বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে তিনি আমাদের অজ্ঞানতার মোহ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি এই যে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমেঘমুক্ত স্থির সিদ্ধান্ত। (গ্রন্থের ১২৯, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫১৩ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু সুলিখিত, মৌলিক ও ব্যক্তিস্বাচিহ্নিত হলেই কি সিদ্ধান্ত ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়ায়? সত্যের মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয়। মতভেদ অবশ্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক, একদেশদর্শী ও অনেকটা কল্পনাবিলাসী। তাঁর আত্মজীবনীর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে—বাংলা তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতীয় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন প্রাণের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ইওরোপে স্পেংলার যে-বিভীষিকা দেখেছিলেন, তারই অনুবর্তনে গ্রন্থকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবসান ও পতনের করাল ছায়া। মাথার উপরে ধ্বংস নেমে আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা-কিছু মূল্যবান তাই আজ নষ্টপ্রায় (৪৮, ১২৯ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত অবনতির যুগে আমরা বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নিষ্প্রভ, সমালোচনার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে, চারিদিকে ক্ষয়ের চিহ্ন এগিয়ে আসছে—(৩৬৪, ৩৩৪, ৪৪৪, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থকারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধুনিক জগতের বিচ্যুতি নয়। সমাজের স্থিতিশক্তির পতন স্পষ্ট হয়েছে ১৯১৯-এর পর থেকে, ১৯৩০-এর পরে কলিকাতা আর তাঁর মনকে তৃপ্তি দিতে পারেনি—(৪০৩, ২৫৯ পৃষ্ঠা)। তাঁর যৌবনের যুগেই বাংলার জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে-দুর্দশা সারা ভারতে সাম্প্রতিক বর্বরতার পুনরাবির্ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া—(১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা)। পূর্ববর্তী যে-যুগের তুলনায় এই অধঃপতন সে-যুগ হল উনিশ শতকের পুনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাঁসের আমল, যার পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ-শতাব্দীতে। (২২১ পৃষ্ঠা)।

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূল্যনির্দেশ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে অতি-রঞ্জিত নয় কি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ আমলে আমাদের

মধ্যশ্রেণীর কীর্তির দুর্বলতার দিকটা অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্ধকলোনির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-জাগরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপুটে যে-প্রাণস্পন্দন তাকে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা দুরাশা বৈ কি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য, জন্মগত স্ববিরোধিতা আমাদের রেনেসাঁসকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' থেকে সংস্কৃতিবান বাঙালী ভদ্রলোকের যে-ছবি গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাবটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধ্যে কি আমরা ইওরোপের পনের-ষোলো শতকের দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় খুঁজে পাই? উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নেতাদের মতন সিপাহি-বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মার্কসের দৃষ্টিতে তার যে সবল দিকটা ধরা পড়েছিল, নীরদবাবুর চোখে তা অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এখানে অবশ্য বলা যায় যে, ইওরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় না হলেও আমাদের রেনেসাঁস-ই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলাধার। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণপ্রাণভাব, স্ববিরোধিতা, স্বল্পপ্রসার ও আংশিক উৎকর্ষের বিচার না করলেও চলে না। উনিশ শতকের অবদানের দুর্বলতা উপলব্ধি না করলে আমাদের কেবল কয়েকটা বাঁধাবুলির আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁসকে অতিরঞ্জিত করে গ্রন্থকার সাম্প্রতিক অধঃপতনের যে-চিত্র এঁকেছেন তাকেও একদেশদর্শী অতিকথন বলা চলে। গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে ভারতে নতুন কিছুই মাথা তোলেনি এ হল গায়ের জোরে প্রচার। গান্ধীজীর আমলে জনজাগরণ, দুঃসাহসিক ও স্বার্থত্যাগী বিপ্লবী অভিযান, পরবর্তী যুগে শ্রমিক বা কিসান আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-সংগ্রাম, কোনও কিছু নীরদবাবুর সভ্যতা ও প্রগতির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ-সমস্তই জাতীয় পতনের নির্দেশক। উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চারিত্র-শক্তি গ্রন্থকারকে শ্রদ্ধায় অবনমিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে আমরা এ-যুগের অনেক মানুষের উদ্যম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করব? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন, অসীম সাহসে দুঃখকষ্ট বরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শক্তি—এমন সাধনার অভিজ্ঞতা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে? নীরদবাবুর অভিজ্ঞতায় এমন দৃষ্টান্তের পরিচয় না থাকলে সেটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, জাতির নয়। আর সংস্কৃতিকে যদি দেয়ালঘেরা সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলেও কি বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় চিন্তা গত পঁচিশ বছরে অনেকটা পুষ্টিলাভ করেনি? কেবল কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাবেই জাতীয়

সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহাস-আলোচনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদির বিস্তারও সংস্কৃতির একটা দিক।

ভূমিকাতে গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ সূত্রের সন্ধান, ব্যতিক্রমের নয়। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি ব্যতিক্রম না সাধারণ নিয়ম? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছু আলোড়নকে অযথা স্ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশক্তির স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত।

নৈতিক, মানসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে-দৃশ্য গ্রন্থকারকে ব্যথিত করেছে, তার মধ্যে অনেকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সত্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের মধ্যে নীরদবাবু তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দৃষ্টি প্রসারিত করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, একটা গোষ্ঠীর অধোগতি সারা জাতির পতনের সমার্থক নয়। অবশ্য এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গির কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের।

জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবুর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্যণীয়। লোকের ভিড়কে তিনি শুধু অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনে তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন গণ-অভ্যুত্থানে নয়, সামরিক সুসম্বদ্ধ বিদ্রোহে (২৪৯ পৃষ্ঠা)। গান্ধিযুগে জনবিক্ষোভ তাঁর মনে এনেছিল ক্রোধ—(৪০৭ পৃষ্ঠা)। ছাত্রাবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে, সাবেকী কোনও ঐতিহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে canaille মাত্র। শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি এই দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন।

ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় গ্রন্থকার বাস্তবনিষ্ঠ পন্থার আদর্শ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদার্থ নয়, আদর্শ যে শুধু কথায় কাটে না সে-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন। তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন গ্রীক ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস জাতি বা দলমত প্রভাবের উর্ধ্বে—(৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিংবা যেন বিশপ স্টাব্‌স্‌কে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারেনি।—(৩৫১ পৃষ্ঠা) বলা বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও ঐতিহাসিক একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। যে-ফরাসী ঐতিহাসিকের বাণী তিনি একাধিক বার উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইতিহাস কথা বলছে, তাঁর সেই দম্ভ আজ আর কেউ শিরোধার্য করে না। দেশ-কাল-শ্রেণী-নির্বিচারে ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাবি নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা উনিশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যে-মতে মনে হ'ত যে রাষ্ট্র একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি অথবা বুদ্ধিবাদ বুঝি সামাজিক পরিবেশের উর্ধ্বস্থিত সনাতনী এক প্রক্রিয়া। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অগ্রাহ্য করবার কথা উঠছে না, কিন্তু ঐতিহাসিকের ফতোয়া মাত্রকেই বিচারের বাইরে রাখা চলে না।

সুতরাং নীরদবাবুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকেও বস্তুনিষ্ঠার কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। ইওরোপের যে-জয়যাত্রা শুরু হ'ল, তার পিছনে ইস্‌লাম-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রভাব গ্রন্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন—(৫০৬), অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আর্থিক প্রেরণা যে ইওরোপীয়দের মুস্‌লিম-বর্জিত আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপর তিনি জোর দিলেন না। স্পেংলারের প্রতিধ্বনি করে' তিনি গোটা ইওরোপীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রায় বলে' মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা), কিন্তু ইওরোপের অনেকাংশে প্রাণশক্তির জোয়ার তাঁর নজরে পড়েনি কেন না ইউরেশিয়ার অনেকটাই নাকি আজ সত্যভ্রষ্ট—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমুনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চার্চিলের মতন 'জিনিয়াস' নাকি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৩২০ পৃষ্ঠা)। আর আমাদেব ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল সূর্যস্বরূপ আমেরিকার চারিদিকে গ্রহের মতন প্রদক্ষিণ—(৫১০ পৃষ্ঠা)। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আশা-ভরসার কথা বোঝা সহজ, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার পাদটীকা হিসাবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

দেশের ইতিহাস আলোচনাতেও তেমনি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। গ্রন্থকার ধরে' নিয়েছেন যে গোষ্ঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তাবোধের নামান্তর (৪০৯ পৃষ্ঠা); সেই যুক্তিতে তাহলে মধ্যযুগের ইওরোপে ক্রিশ্চান সত্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দিতে হয়। হিন্দু সাধারণের চোখে নাকি দেবদেবীরা মানুষের উৎকোচেব নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পৃষ্ঠা), অথচ সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ-অভিযোগ আনা সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এদেশে দুই জাতির তত্ত্ব তিনি ঐতিহাসিক 'ফ্যাক্ট্' বলে গণ্য করেছেন—(২৩১ পৃষ্ঠা), আবার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বিখণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্যায় ও অস্বাভাবিক।—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত ও উদার মনে হয়েছে, গান্ধিবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রতিক্রিয়া ও অন্ধ-সংস্কারের স্তূপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমটির সুকুমার ঔদার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে—(৪৩৫, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু জাতীয় মধ্যশ্রেণীর বিবর্তনের দুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই যুগের মধ্যে যে-সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে তাব দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠার নামে এই ভাবে পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদী বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ।

নীরদবাবুর ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণ হয়েছে অতিরঞ্জিত, সামাজিক স্তরবিশেষেব সাম্প্রতিক অধোগতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তরিত হয়েছে, আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতায় সমাজবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, স্বদেশের সমাজবিবর্তন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি

আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, এখানে তার গুরু টয়েন্‌বি।

ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে টয়েন্‌বি মূলত ধর্মগত সংস্কৃতির প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে তাই ইওরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিক-কাল একই পশ্চিম-ইওরোপীয় সমাজের রূপ গ্রহণ করেছে। এইরূপে নির্দিষ্ট সমাজগুলির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নির্ণয় তাঁর লক্ষ্য। নীরদবাবুও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট অথচ তাঁর মতে স্বতন্ত্র সভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন—হিন্দু, ইসলামি ও ইওরোপীয়। প্রত্যেক সভ্যতার লীলাস্থল ভারতের মাটি হ'লেও সৃষ্টিকর্তা হ'ল বহির্জগতের একটা প্রবল আলোড়ন অর্থাৎ আর্যজাতির দিগ্বিজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইওরোপের সাম্রাজ্যবিস্তার। সুতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভ্যতার চালক ও শাসকশক্তি হ'ল বৃহত্তর বিদেশী সংস্কৃতি। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরাজি পর পর তিন পর্যায়ের তিন সংস্কৃতির বাহন। খাস সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতের তিন সভ্যতাকে ক্রমশ নিম্নগামী বলা চলে, রাষ্ট্র-সংগঠনের দিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর হয়েছে—কিন্তু আসল সত্তা ও স্বভাবের বিচারে প্রত্যেকেই বিদেশী, শুধু বহিরাগত নয়। প্রতি পর্যায়ে সভ্যতার বাহন হ'ল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর ও অনুচরেরা। দেশের অধিকাংশ লোক মনে প্রাণে তখনকার সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেনি তাই সর্বদাই সভ্যতার সঙ্গে 'অসভ্যতা'র একটা লড়াই চলেছে। ' এখানে অমার্জিত 'অসভ্য' লোকেরা অবশ্য হ'ল জনসাধারণ, টয়েন্‌বির ভাষায় আভ্যন্তরীণ প্রলেটেরিয়াট্। কালক্রমে এক একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে—প্রধানত দেশের নির্মম জলবায়ু আবহাওয়ার চাপে, খানিকটা বিদেশী সৃষ্টি-কর্তার অবসাদ ও শক্তিক্ষয়ে। চালক ও শাসক শক্তির পতন এসেছে 'অসভ্য' জন-সাধারণের চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সর্বদাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় নিকৃষ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশি নির্জীব। তবে একটা সভ্যতার যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্টগোলের সৃষ্টি করে, সে-বিশৃঙ্খলা যেন সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের আস্ফালন। সভ্যতার পুনর্জন্ম আসতে পারে আবার কোনও বিদেশী সংস্কৃতির হস্তপ্রসারে। গ্রন্থকার-নির্দিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসের ছক বা প্যাটার্ণ হ'ল এই।

প্যাটার্ণের মাহাত্ম্যই এই যে তাতে একটা মনের মতো ছবি আঁকা চলে, যে-তথ্য ছকে পড়ে না তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট, বিপরীতমুখী তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সম্ভাবনা গ্রন্থকার এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্য-জাতির আগমন পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দু সভ্যতা হ'ল বিদেশী আর্য মার্কা অথচ অন্যান্য অনুরূপ অঞ্চলে টয়েন্‌বি-নির্দিষ্ট হেলেনিক, পশ্চিম-

ইওরোপীয়, পূর্ব-ইওরোপীয়, ইরাণী ইত্যাদি সমাজে আর্যপ্রভাব আর বিদেশী রইল না—এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক ধাক্কার ফল—দেশের মাটি ও সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের—এ-তত্ত্বও চমকপ্রদ। গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোন্ বিদেশী অনুপ্রেরণায় তা-ও রয়ে গেল অব্যক্ত। নীরদবাবুর ব্যাখ্যায় ভারতে বহিরাগত ধাক্কাগুলি বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যাখ্যায় First Cause কে মনে আনে। ভারতীয় আর্য সমাজে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর নগণ্য, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ কিন্তু সেইজন্য টয়েন্‌বি পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সমষ্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত করতে ভরসা পান নি। খাঁটি মুসলমান ধর্ম, ভাষা, রীতি-নীতি যদি মধ্যযুগীয় ভারত-সভ্যতার প্রধান নির্দেশক হয়, তবে সে যুগের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে' দেখবার প্রয়োজন কোথায়? মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবকেও এভাবে তুচ্ছ করে' দেখবার অর্থ কি?

হিন্দু ও মুসলমান আমলকে ব্যাপ্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রন্থকার-কল্পিত দুই পৃথক সমাজের থিওরির চাইতে কম শক্তিশালী নয় কারণ ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার ধরন, গ্রাম-সংগঠন, সমাজ-সংস্থান মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায় বহুদিন ধরে'। প্রচলিত মতে সে-সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে আজও বিদ্যমান। আর যদি বিরাট আর্থিক পরিবর্তনে সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় বলে' স্বীকার করি তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ায় নূতন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এ কথাও বলা চলে। গ্রন্থকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক সভ্যতাব অস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা।

আসলে মনে হয় ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যা এ-গ্রন্থে গৌণ কথা। গ্রন্থকারেব মনের নিবিড় অনুভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপত্তি। কাম্য আদর্শের সন্ধানে প্রথম যৌবনে তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সংগে যুক্ত করেছিলেন, তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীন ছবি আর বিদেশী আশ্রয় ও পটভূমিকা হ'ল ইওরোপীয় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দিক। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে-জগৎ ভগ্নপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইওরোপও আজ আবর্তের মধ্যে এবং গ্রন্থকাবের চোখে পথভ্রষ্টপ্রায়। এ-অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর মনে বাজছে যুগাবসানের সুর। যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ বর্বর জনতা মাত্র, সেইজন্য ভারত কিংবা ইওরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নিজস্ব প্রাথমিক স্থির বিশ্বাসের

সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি তাই অনিবার্যভাবে দেখতে পান এক-মাত্র ধনিকতন্ত্রী আমেরিকায়। নীরদবাবু তাই পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ষায়—এই বিদেশী শক্তিই নাকি ভারত উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাস-দর্শন রচিত। ভারতীয় সভ্যতার অনুপ্রেরণা যদি বিদেশী সংস্কৃতিতে আরোপ করা যায় তাহলে ত্রাণকর্তা আমেরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে' গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিকা ত ইওরোপীয় সভ্যতারই সন্তান। সুতরাং গ্রন্থকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতীয় অর্থাৎ ইন্ডো-ইওরোপীয় সভ্যতার এখনও সমাপ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখছি মাত্র। আমেরিকার ইন্‌জেক্‌শনে আমাদের নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে। অতএব মা ভৈঃ।

নীরদবাবু সান্ত্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র। এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সুশোভন সরকার

যে গল্পের শেষ নেই॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়॥ ন্যাশনাল পাবলিশিং কোং, কলকাতা ২০॥ ১ম খণ্ড—১৮০, ২য় খণ্ড: ২৲॥

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'যে গল্পের শেষ নেই' বইখানি পড়ে খুব ভাল লাগল। বাঙলা ভাষায় কিশোরদের উপযোগী ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে খুব একটা হয়নি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই দিকে কিছুটা কৃতিত্বের দাবি রাখেন। তাঁর লেখা 'গল্পে ইতিহাস' ও 'অমর ভারত গড়ল যারা' কিশোর-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

(১) অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে যে-বয়সে কিশোর মন পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়, সে-সময়ে জাগতিক সমস্যার যে-কাহিনী সে জানবে, বুঝবে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে তার মানসিক বিন্যাস। সেই কারণেই কিশোর-মনের সামনে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের অতীত ও বর্তমানকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। দেবীবাবুর বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্ব সেইখানেই।

(২) এই বইয়ের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এর অসাধারণ সরল ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ-ভঙ্গি। কঠিন শব্দ ব্যবহার না করে অনেক কঠিন সমস্যা কত সহজভাবে বোঝানো যায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে প্রতিটি অধ্যায়ে।

(৩) এর তৃতীয় দিক হচ্ছে সকল যুগের শোষক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব। শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিরোধ যে চিরদিনই ন্যায় ও সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত—ইতিহাসের অমোঘ বাণী হিসাবেই এ-কথা ইনি কিশোরদের কাছে বিতরণ করেছেন—যাতে সকল যুগের শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের মন বিষিয়ে ওঠে।

মানুষ কী করে মানুষ হলো, কী করে গড়ে উঠল সমাজ ও সভ্যতা এই ছোট্ট বইখানিতে গল্পের ভঙ্গিতে, চলতি কথায় সুন্দরভাবে বলেছেন দেবীবাবু।

এই গল্পের শুরু করেছেন তিনি পৃথিবীর জন্ম থেকে। এল জীবজগৎ, মানুষ, সমাজ, হাতিয়ার ও ভাষা। জন্ম হল সভ্যতার। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল একদল মানুষ যারা হল হাতিয়ারের মালিক। তারই বলে এরা সমাজের অন্য লোকের প্রতি প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে, ছোট-বড় রাজ্য ভাঙাগড়ার সঙ্গে এই শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব চলল যুগ যুগ ধরে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। নতুন শ্রেণী-শাসক। শোষিতশ্রেণীরও রূপান্তর হয়। ক্রীতদাস হয় ভূমিদাস; ভূমিদাস হয় মজুর ও চাষী। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সভ্যতার ধারা বেয়ে চলে—মিশর, ব্যাবিলন ও সিন্ধু থেকে গ্রীক-রোমে। নতুন জাতির দুর্বার অভিযানের মুখে 'রোম-দম্ভ' চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধ্বসে পড়ে। তারপর আসে 'পাথরের দুর্গ আর বীর-পুরুষদের বাহুবল'-এর যুগ। মহারাজা, রাজা, জমিদার (আর্ল, কাউন্ট, ব্যারন), পান্ডা, পুরোহিত মিলে ভূমিদাসদের শোষণ করতে লাগল।

"বীরপুরুষের দল, যীশুখৃষ্টের নামে শপথ করে.........চরম অত্যাচারের ধ্বজা উড়িয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দে সমস্ত দেশটা ওরা কাঁপিয়ে বেড়ায়।" মোড় ঘুরল। সভ্যতা এগিয়ে এল গ্রাম ছেড়ে শহরে। চাষবাস ছেড়ে কুটীরশিল্পে বেশি ঝোঁক পড়ল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল। ধর্মযুদ্ধের হিড়িকে ভিড়ে গিয়ে পুবের দেশ থেকে শৌখিন জিনিস আমদানি হতে লাগল। সওদাগরেরা সাগর পাড়ি দেবার পথ খুঁজল। আমেরিকা, ভারতবর্ষ আবিষ্কার হয়ে গেল। 'বোম্বেটের দল' বেরিয়ে পড়ল ধনদৌলতের সন্ধানে। নতুন দেশ জয় করল। তাল তাল সোনা কেড়ে নিয়ে এল। দেশের পুঁজি বাড়ল। বড় বড় কারখানা গড়ে উঠল। ভূমিদাসরা গ্রাম থেকে শহরে এল—হল শ্রমিক। বোম্বেটেরা হল ব্যবসাদার, বণিক, মালিক। তারা চাইল জমিদারদের তাড়াতে—সহযোগী পুরোহিতদেরও ও পুরোহিতদের ধর্মের ব্যাখ্যা তারা উড়িয়ে দিল। পালা এল মেজাজ বদলের—যার বিদেশী নাম হল রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন। বিজ্ঞান এগিয়ে গেল। জাতীয়তাবোধ জেগে উঠল। জন্ম নিল ধনিক সভ্যতা।

"ধনতন্ত্রের দুটো দিক: একদিকে যেমন আশ্চর্য সম্পদ আর একদিকে তেমনি নির্মম হাহাকার"। কিন্তু বেশি জিনিস তৈরি করার বিপদ ঘটল। তারা সমাধান খুঁজল অন্যের দেশ দখল করে আর উৎপাদন নষ্ট করে। জমিদারেরা এই সমস্ত বিদেশী শাসকদের ডেকে নিয়ে এল ধনিকদের জব্দ করতে। তারপর উঠল আকাশে

শকুন। মুনাফার খাতিরে পৃথিবীর বুকে শুরু হল শকুনের উৎসব। কিন্তু আর একটি পৃথিবী—সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী জন্ম নেয়। শুরু হয় মানুষের গল্পে একেবারে নতুন পরিচ্ছেদ। অভাবের বোঝায় যে-সব মানুষের পিঠ একেবারে বেঁকে গিয়েছিল তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতিয়ার হাতে নিয়ে এল পৃথিবীতে নূতন পৃথিবী গড়বে বলে। তারই নাম হল সমাজতন্ত্র।"

(১) লেখক এই বিরাট কাহিনীটি এমন সহজভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন যে, কাহিনীটি বুঝতে কারো এতটুকু অসুবিধে হয় না। কিন্তু জিনিসগুলো বোঝা সহজ হলেও মনের মধ্যে ধরে রাখবার জন্য একটি বিশেষ ঘটনার ওপর যেভাবে আলোকপাত করা উচিত ছিল সেভাবে তিনি করেননি।

(২) তা ছাড়া বিভিন্ন সমাজের রূপান্তর যেমন ত্বরিত গতিতে লেখক দেখিয়ে গেছেন একটা বিশেষ সময়ের সঙ্গে গেঁথে না দেওয়ায় মনে রাখবার পক্ষে একটু কষ্টকর হবে বৈ কি। অন্তত পাশে পাশে সময় উল্লেখ করলে ভাল হত।

(৩) কিশোর-মনে কোন রেখাপাত করবার সহজ উপায় হচ্ছে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপের সঙ্গে ইতিহাসের প্রবাহকে সংযুক্ত করে দেওয়া। অথচ এই বইয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অত্যন্ত সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। মার্কসবাদীদের কাছে ব্যক্তিত্বের কি কোন ভূমিকা নেই? সভ্যতার উত্থান-পতনের মধ্যে ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য না হলেও গৌণ-ও নয়।* সরল জিজ্ঞাসু মন বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্তনের ধারা খোঁজে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার মধ্যে। যদিও কোন বিশেষ অবস্থাতে এই বিশেষ ব্যক্তিটি কি বিশেষ অবস্থাকে সংযোজিত করতে পেরেছিল সেটাও পরিষ্কার বোঝান দরকার। এইভাবে ঘটনাগুলোকে তুলে ধরলে ছবিগুলো আরও বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী হত বলে মনে হয়।

(৪) মানব-সমাজের যে-কাহিনীর বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগের শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও যে-রূপান্তর হয় সেটা বুঝিয়ে না দিলে বিভিন্ন যুগের মানুষ ও সমাজের সঠিক ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। গ্রীকো-রোমান যুগকে শুধু ক্রীতদাস শোষণের যুগ বা মধ্যযুগকে শোষণের যুগ বলে চিত্রিত করলেই কিন্তু সব বলা হয় না।

"In the historical conditions of the ancient world, and particularly of Greece, the advance of a society based on class antagonisms could only be accomplished in the form of slavery." "When, therefore, Herr Duhring turns up his nose at Hellenism

* Men make their history themselves—only in a given surrounding which condition it,—Marx. Selected Works. Vol. II,

because it was founded on slavery, he might with equal justice reproach the Greeks with having no steam engines and electric telegraph."—Engels. Anti-Duhring.

"It (Christian Religion) made a great commotion in Roman Empire. It undermined religion and all the foundations of the state; it flatly denied that Caesar's will was the supreme law, it was without a fatherland, was international......"—Engels

মধ্যযুগ বা সামন্ততন্ত্রের যুগ সম্পর্কে এই জাতীয় বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তাই হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন মার্কসবাদী ইতিহাসবিশারদ মারিয়ন গিবল্স্ তাঁর 'ফিউডাল অর্ডার'-এর ভূমিকায়। এ-যুগকে তিনি অন্ধকারের যুগ বলে স্বীকার করেন না। এ-যুগের মধ্যেও প্রগতির স্রোতোধারা তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

"The re-inforcement of human by mechanical energy even in simple forms, enabled the productivity of labour to increase." "To ignore, satirize or whitewash the activities of the medieval church or to forget that its system was in fact built up by successive generations of men, living in *particular historical* circumstances would be a major distortion of history."

তারপরের যুগে—যে-যুগে বোম্বেটে ও জলদস্যুরা দিগ্বিজয় করল—শিল্প গড়ল—সেই ধনতন্ত্রের যুগের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়েও 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন :

"The bourgeoisie has played a most revolutionary role in history"—"put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations"—"torn asunder the motley feudal ties that bound man to natural superiors......"

মানব-সমাজের রূপান্তরের যথার্থ চিত্র আঁকতে হলে শুধু শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বই কিন্তু শেষ কথা নয়। নূতন যন্ত্র ও হাতিয়ারের আবিষ্কার ও নূতন ভাবধারার জন্মলাভ শোষক ও শোষিতের প্রতি স্তরে স্তরে যে-রূপান্তর আনে সেই রূপান্তরের ফলে আবও বৃহত্তর রূপান্তর সম্ভব হয়। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বপ্রগতির ধারা—ইতিহাসেরও জীবনধারা। এই দ্বন্দ্বপ্রগতির ফলেই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের আচরণ করে। গণবিপ্লবের নেতা ক্রমওয়েল ১৬৫৩ সালের পরে প্রতিবিপ্লবের নেতা। মানুষের গল্পে যন্ত্র ও হাতিয়ার বারে বারে মানুষের জীবন ও সমাজকে করেছে রূপান্তরিত। মানুষের ভাবধারাও এই আবিষ্কারকে সাহায্য করেছে ও শক্তি গ্রহণ করেছে। তাই আবিষ্কারক চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের অন্তত উল্লেখের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিশোর-মনে সেগুলি বাস্তব সত্য হিসেবে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়।

(৫) আরও বাদ পড়েছে শোষিতশ্রেণীর প্রতিরোধের অমর কাহিনীগুলি ঃ বিস্তারিত না হলেও শুধু উল্লেখ করলেও কিশোর-মনে ঔৎসুক্য জাগাত—আর জাগাত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা।

পিরামিডের সভ্যতার গতিপথে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ অনেক রাজবংশকে করেছে বিতাড়িত, এনেছে নূতন শাসক। অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে গ্রীকো-রোমান যুগে। স্পার্টার হেলটদের আর লারিয়ামের রুপার খনির ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ স্পার্টা ও এথেন্সের মসনদ ধ্বসিয়ে দিল। রোমের ইতিহাসে প্লেবিয়ানদের সংগ্রাম উল্লেখ-যোগ্য। স্পার্টাকাস ও সালভিয়াসের নেতৃত্বে ক্রীতদাস-বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যে শাসকের হৃদয় কাঁপিয়ে তুলেছিল। তার পরের যুগের অত্যাচারিত মানুষ ও ক্রীত-দাসদের দুর্জয় প্রতিরোধ ভাষা পেল খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম রোমান শাসকশ্রেণীর ধর্ম হয়ে পড়ল। এর বৈপ্লবিক ভূমিকা গেল নষ্ট হয়ে। নূতন জাতির আক্রমণের মুখে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। পশ্চিম এশিয়ার ইসলামের বাণীর মধ্যে ক্রীতদাসদের দল জীবনের প্রতিশ্রুতি খুঁজে পেল। ইসলামের পতাকা আর তরবারি তাই হয়ে উঠল দুর্বার।

মধ্যযুগের ক্রীতদাস হয়ে গেল ভূমিদাস। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি ওয়াট টেইলরের নেতৃত্বে ইংলন্ডে চাষীরা বিদ্রোহ করল। গণতন্ত্রের পূজারীরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান-চাষীর বিদ্রোহ—রোমের রিনজি-বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ান সম্রাটের বিরুদ্ধে—ডাচ জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম—ইংলিশ বিপ্লব—আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ—ফরাসী বিপ্লব থেকে রুশ বিপ্লব ইওরোপের ইতিহাসকে মহাকাব্যের উপাদানে ভূষিত করেছে। মানুষের ইতিহাস এদের কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা থাকবে। আমাদের দেশেও শোষিতশ্রেণীর প্রতিরোধের কাহিনী কম নয়। সে-যুগে গোপালের নেতৃত্বে বাংলায়, পরবর্তীকালে কৈবর্ত-বিদ্রোহ, শতনামী, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, কোল, সিপাহীদের প্রতিরোধের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে।

মানুষ কি করে বড় হল—কি করে গড়ে উঠল সভ্যতা—সে গল্পের মতো বিচিত্র গল্প বুঝি আর কখনও হয় না।

পাথরের টুকরো, পাথরের ছুরি, কুড়োল—। তারপর এল ব্রোঞ্জ ও কপারের কুড়োল—বর্শা, অসি। ব্রোঞ্জ থেকে এল লৌহের যুগ। ধারাল অস্ত্র শস্তা হল। অনেকেই সে-সুযোগ গ্রহণ করল। কুড়োলের সাহায্যে বনজঙ্গল পরিষ্কার হল, গ্রাম গড়ে উঠল। তুষারপাতের যুগে সৃষ্টি হল নৌকা আর মৎস্যশিকারের জাল। ফসল উৎপাদন প্রণালী মানুষ আবিষ্কার করল প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা। নদীর ধারে-ধারে সভ্যতা ভূমিষ্ঠ হল। আদি সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যেতে আরম্ভ করল। জন্ম নিল

আধুনিক ঐতিহাসিক সমাজ। নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, গঙ্গা, ইয়াংসি, হোয়াংহোর তীরে তীরে। নদীস্রোত আর আকাশ দেখতে দেখতে আরম্ভ হল আকাশবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা। সম্পত্তির বা জমি ও ফসলের হিসাব হতে শুরু হল অঙ্কশাস্ত্র। এমনি করে একটির পর একটি আবিষ্কার সভ্যতার ধারাকে আরও বিস্ময় ও বিচিত্রতার মধ্যে সম্প্রসারিত করল। সমাজ-জীবন হল আরও জটিল, কিন্তু প্রাণচঞ্চল। মানবসভ্যতা এমনি করে আবিষ্কার, ভাবধারা ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার মধ্যেই একে অন্যের রূপান্তর আনে। আমরা আশা করব যে, দেবীবাবু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে এই কাহিনীকে রূপায়িত করার দিকে আরও বেশি নজর দিন। তাঁর মতো দক্ষ লেখকের হাতে এই কঠিন বিষয়বস্তু আরও চমৎকারভাবে চিত্রিত হতে পারত যদি তিনি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও একটু তথ্যানুসন্ধানের দিকে নজর দিতেন। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়াতেই তিনি পিরামিডের সভ্যতার অবদান—জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র, কারুশিল্প, কৃষিবিজ্ঞান, চক্রযানের প্রচলন প্রভৃতি কিশোরের সামনে বড় করে তুলে ধরেননি। তেমনি বাদ পড়ে গেছে ক্লাসিকাল বা গ্রীকো-রোমান যুগে এথেন্সের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতারক্ষার গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম—পেরিক্লিসের যুগের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক জাগরণ যা সকল যুগের মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিনন্দিত।

তেমনি বাদ পড়েছে এথেন্সের বিরাট সভ্যতার পতন ও আলেকজেন্দ্রিয় অথবা হেলেনীয় যুগের উদ্ভবের ঐতিহাসিক গুরুত্বের উল্লেখ। এর প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসে আলেকজান্দারের খ্যাতি শুধ বিশ্ববিজেতা বলে নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি কীর্তিমান তিনি বিশ্ব-সংস্কৃতির উদ্গাতা হিসেবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরস্পরকে জানবার অবকাশ পেল। নাগরিক রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ প্রান্ত লুপ্ত হল, গড়ে উঠল বিরাট সাম্রাজ্য। নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তি রচিত হল, তারই উপর গড়ে উঠল আলেকজান্দ্রিয়ার সংস্কৃতি। রোমের সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি এরই সম্প্রসারণ মাত্র।

রোমক সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উঠল খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের মধ্যে। ক্রীতদাসদের আর্তনাদ এবার প্রতিরোধের ভাষা পেল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সন্ধি হল শাসকশ্রেণীর। রূপান্তরিত হল খ্রীষ্টধর্ম। নষ্ট হল তার বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি। আঘাত এল নতুন জাতির—আঘাত এল ইস্‌লামের। রোমক সাম্রাজ্যের বনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। ধ্বসে পড়ল পেগান সংস্কৃতি। তারপর এক অরাজকতার অন্ধকারে নতুন অবস্থার মধ্যে সামন্তযুগের সৃষ্টি হল। তার সংস্কৃতি একেবারে ধর্মাশ্রয়ী গীর্জাশ্রয়ী। দর্শন, শিল্প, চারুকলা তাই এক নৈসর্গিক অলৌকিক, আধ্যাত্মিক কসরতের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হল। এরই নাম হল স্কলাসটিসিজম। এরই মধ্যে থেকে আসে এক নূতন স্রোত। পবিত্র সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্বের মধ্য

দিয়ে, ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, নব নব শক্তি জন্ম নিল। রিপাব্লিকতন্ত্র, জাতীয়তা আর ব্যবসায়ী শ্রেণী, ক্রীতদাসপ্রথার অবসান হল। আবিষ্কার হল বারুদ—ছাপাযন্ত্রের, চাষ-আবাদের নতুন কায়দার, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের, ফলিত রসায়ন প্রভৃতির। পুরনো ধ্যানধারণা গেল বদলে। ইসলামের আক্রমণে ভেনিস থেকে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র চলে এল ইতালীতে। পূব ও পশ্চিমের যোগাযোগ ছিন্ন হল। ভূমধ্যসাগর সেকেলে হয়ে পড়ল। নতুন বাণিজ্য-রাস্তা আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কার হল দক্ষিণ-আমেরিকার সোনার খনি। আটলান্টিক পারের দেশগুলি হল সমৃদ্ধিশালী। সভ্যতার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল পশ্চিমে। পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে এল নব-জাগৃতি। আর ধর্মবিদ্রোহ। শহীদ হল জার্মানীর চাষীরা আর ইতালীর নাগরিকেরা আর শহীদ হল সত্যের পূজারী বিজ্ঞানের আবিষ্কারকেরা। ইওরোপের আকাশে নতুন সংস্কৃতির উদয় হল —এরই নাম বুর্জোয়া সংস্কৃতি। রোম, ফ্লোরেন্স আর নেপল্‌স্‌ হল এর সূতিকাগার। এর পরে যে-যুগ এল, সে হল সামন্তবিরোধী যুগ। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে সে-যুগের জয়যাত্রা ঘোষিত হল।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি কতকগুলি যুগান্তকারী ঘটনা বেছে নিয়ে—উত্থান-পতনের কারণগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। যেমন, কেন রোমের পতন হল? ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি করে এল? কেন সামন্তসমাজ ভেঙে পড়ল? কেন আবিষ্কার আরম্ভ হল?—প্রভৃতি।

আশা রইল আগামী সংস্করণে দেবীবাবু এদিক দিয়ে কিছু কিছু সংস্কার-সাধন করবেন যাতে করে বস্তুনিষ্ঠাহীনতার অভিযোগ কেউ না তুলতে পারে। এই-সব ত্রুটি সত্ত্বেও এই বই দুটির কিশোর-সাহিত্যের সম্পদ হবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। এবং কিশোরদের এই বই উপহার দিয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শান্তিময় রায়

একটি রং করা মুখ। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক মার্ক, ৩২।১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট। দুই টাকা।

কনে দেখা আলো। মনোতোষ সরকার। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলকাতা। দুই টাকা।

ছোট গল্পের দুটি বই। দুইজন লেখকই তুলনায় নবাগত। লেখার দক্ষতা দু'-জনেরই উল্লেখযোগ্য। 'একটি রং করা মুখ'—এর গল্পগুলির ধরন রোমান্টিক। চরিত্রগুলি প্রায়শই মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী। তাদের সামাজিক পটভূমিকা ও তাৎপর্য নিয়ে লেখক বিচলিত হননি; তাঁর বিষয়বস্তু প্রধানত তাদের ব্যক্তিনির্ভর হৃদয়াবেগ ও প্রেম নিয়ে রচিত।

তবু লক্ষণীয় যে, কাহিনীগুলির মধ্যে লেখকের সহানুভূতি আভিজাত্যপ্রয়াসী রংকরা মুখগুলির দিকে নয়—বরং মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই ঈষৎ নম্র দরিদ্রতর একটি মেয়ে, অথবা স্বাব্যদরদী বিত্ত-উপার্জনহীন লেখক কিংবা শিল্প-গরবী নিতান্ত সাধারণ একটি রাজমিস্ত্রীর দিকে। প্রত্যেকটি গল্পই একটি মৃদু রোমান্টিক বেদনাতে শেষ হয়েছে। সে-বেদনায় মানুষের প্রতি লেখকের দরদ নিঃসন্দেহে ফুটে ওঠে, কিন্তু অবশ্যই গভীরতর সামাজিক প্রশ্নের দিকে পাঠককে নাড়া দিয়ে যায় না।

'কনে দেখা আলো'-তে মনোতোষ সরকারের গল্পগুলি ঠিক এর বিপরীত কেন্দ্রের গল্প। তাঁর চরিত্রগুলিও মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কিন্তু তাদের অঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে কলকাতার এই ধরনের মানুষের বাস্তব সামাজিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। এই অঙ্কনে অবশ্য ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে বিস্ময়বোধের চাইতে নিম্ন-মধ্য পরিবারের আর্থিক অনটনের ঝাঁঝালো ছবি এবং তার আবর্তে মানুষগুলির এমন কি পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও যে হীনতার, বিকৃতির সৃষ্টি হচ্ছে তার তীব্রতাই বিশেষ করে ফুটেছে।

গল্পের বই দুটির প্রধান সুর এইভাবে যে দুই বিপরীত ধারা থেকে প্রভাবিত, তার একটি হল 'কল্লোল' লেখকদের একাংশের রোমান্টিক ধারা, অন্যটি তারই প্রতি-ক্রিয়ায় সৃষ্ট পরবর্তী যুগের স্বাভাবিকবাদের ধারা। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের দাবি এই দুই প্রভাবের কোনটিতেই মিটতে পারে না। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এ-দাবি হল প্রকৃত বাস্তবতার দাবি। বাস্তবতার সঙ্গে সামাজিক তাৎপর্যবিচ্যুত চরিত্রের বিরোধ আছে, কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের গভীরতা, মহত্ত্ব ও বিস্ময়ের সঙ্গে তার বিরোধ নাই। অন্যদিকে বিপ্লবী বিকাশহীন হুবহু ছবি, বিকৃতি ও তিক্ততাপ্রবণতার সঙ্গে তার বিরোধ আছে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, যথার্থ চরিত্র ও বাস্তব আকেন্টনী অঙ্কনের সঙ্গে তার আদৌ বিরোধ নাই। বাংলা সাহিত্যে এই বাস্তবতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করে থাকব। ইতিমধ্যে শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমাচলম' গল্পে এবং বিশেষ করে মনোতোষ সরকারের 'বোবা কান্না', 'প্রতিরোধ', 'দাগ' 'তোমার আমার সকলের জন্য' গল্পগুলিতে যে-প্রতিশ্রুতি আছে তাকে অভিনন্দন জানাই। স্বাভাবিকবাদের তুচ্ছতায় মনোতোষ সরকার প্রভাবিত হলেও এ-গল্পগুলি সচেতন ব্যতিক্রম। সে-হিসাবে সবচেয়ে সার্থক হল 'বোবা কান্না' ও 'প্রতিরোধ'। এ-গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন চরিত্র-গুলির তুচ্ছতা ও পারস্পরিক সংঘাতই শুধু ফোটেনি, লেখক একটি নতুন আস্থাও ঘোষণা করেছেন সংগ্রামের প্রতি, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যে-ছেলেটি অনশনের ভয় না করেই অফিসে সমবেত সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে অথবা ক্রমশ কারখানার মজুরে পরিণত হয়ে বেঁচে উঠছে ধর্মঘট সংগ্রামের মর্যাদায়, তাদের প্রতি। আশা করি, উভয় লেখকেরই পরবর্তী প্রচেষ্টা অধিকতর বাস্তব ও সফল হবে।

ননী ভৌমিক

GUARANTEE OF PEACE—Vadim Sobko.
Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951.
Price, Rs 1-11-0.

[প্রাপ্তিস্থান: কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা ১৩]

"গ্যারান্টী অব পীস্"-এর ঘটনাস্থান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী পূর্ব জার্মানী। জার্মানী জয় করবার আগেই পৃথিবীর সবার কাছে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, নাৎসী প্রভাব সমূলে উচ্ছেদ করে সত্যকার গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে জার্মানীকে গড়ে না তোলার ফল হবে বিষময়। জার্মানীর সোভিয়েট-অধিকৃত অঞ্চলে এই নতুন জার্মানী গড়ে তোলার কাজ কীভাবে করা হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে পুনর্গঠনের কাজের মধ্য দিয়ে, নাৎসীবাদের অনুচরদের সমূলে উচ্ছেদ করে জার্মান জনসাধারণ কীভাবে শান্তিকামী গণতান্ত্রিক জার্মানী গড়ে তুলতে শুরু করল, "গ্যারান্টী অব পীস্" তারই সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি।

এই বইয়ে ভিড় করেছে পূর্ব জার্মানীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তাদের কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক, কেউ ঔপন্যাসিক—যেমন বোহ্লার, নাৎসী আমলে দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছিল নাৎসীবিরোধী বুদ্ধিজীবী বলে, পরে ফিরে এসেছেন, কেউ অভিনেত্রী, যেমন এডিথ হার্টমান, নাৎসীদের কার্যকলাপ দেখে যিনি স্বদেশেই নির্বাসন বরণ করে নিলেন—রঙ্গমঞ্চ থেকে বহু দূরে, আর্টের বিকৃতির বিরুদ্ধতা করে। আর কেউ-বা পুরনো জার্মানীর বার আর রেস্তোরাঁর মালিকের ধারা বহন করে নিয়ে চলেছে ফ্রাউ লিণ্ডের মতো, বার-এর আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীলদের গোপন আড্ডা চালিয়ে। এবং তারই সূত্র ধরে স্যাণ্ডারদের মতো নাৎসী ও নাৎসী-সমর্থকেরা পুরনো জার্মানী ফিরিয়ে আনবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছে। আর এরা ছাড়া রয়েছেন সোভিয়েটের ক্যাপটেন সকলফ্, কর্ণেল চাইকা, সকলফের স্ত্রী লিউবা প্রভৃতি, যাঁরা জার্মানীর পুনর্গঠনের কাজে সমস্ত শক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই নতুন জার্মানী গড়ে তুলতে যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা প্রায় সকলেই নাৎসীবিরোধী বামপন্থী। এঁদের মধ্যে অনেককেই নাৎসী কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করতে হয়েছিল, যেমন ম্যাক্স ডালগো। অনেককে দীর্ঘ নাৎসী-শাসনকাল কাটাতে হয়েছে বন্দীশিবিরে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে যেমন লেক্স মাইকেলিস। আবার অনেকে এরিখ লেশনারের মতো কৃষক, যারা নিজেদের দুর্বিষহ জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রের স্বরূপ চিনেছে এবং বামপন্থী নেতৃত্বে শোষকদের শাসন উৎখাত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরা বহু পুরুষ ধরে জমিদারের জমি চাষ করে কোন রকমে জীবন কাটিয়েছে; বার বার স্বপ্ন দেখেছে নিজের একখণ্ড জমির জন্যে—কিন্তু সে-আশা কখনো বাস্তবে পরিণত লাভ করেনি এর আগে। সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির নেতৃত্বে যখন জমিদারের জমি চাষীদের

মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আরম্ভ হল, তখন এরিখ এল এগিয়ে। নিজের গ্রামের জমি বিলি-ব্যবস্থার কাজ ও সেই সঙ্গে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে বেরিয়ে এল সচেতন কর্মীরূপে। পুরনো ঘুনধরা জমিদারি ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়ে যৌথকৃষিব্যবস্থা পত্তনের ফলে কৃষক-জীবনে, কর্মে ও চিন্তায় যে-পরিবর্তন শুরু হল এবং সমস্ত কৃষকদের মধ্যে যে নতুন জীবনের সূচনা হল, নতুন চেতনা জন্মাল, এরিখ তারই মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু এ-পরিবর্তন শুধু কৃষকদের মধ্যেই এল না। এল সমস্ত সমাজের ভিতরেঃ কয়লাখনির আর কারখানার মজুরদের জীবনে। বড় বড় শিল্পের জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হল মালিকানার রূপ। মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর পরিবর্তে মালিক হল শ্রমিকসাধারণ। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হল তাদের সামাজিক চেতনা। নতুন উৎসাহে তারা শুরু করল দেশের উন্নতির কাজ। জার্মানীতে এর আগে যা ঘটেনি তাই ঘটতে শুরু করল। বার্টোল্ড গ্রিগুগেলের মতো সাধারণ শ্রমিকেরা পেল কারখানা পরিচালনার ভার। অনেকেরই মনে ছিল সন্দেহ। এ অসম্ভব। একজন সাধারণ শ্রমিক কখনো এমন কাজ করতে কি সক্ষম হবে? লেশনারের মতো গ্রিগুগেলও প্রমাণ করল যে, তারা কারখানা পরিচালনা করতেই শুধু সক্ষম নয়, তারা প্রতিবিপ্লবী ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে নিজেদের নতুন অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষা করতেও সম্পূর্ণ সক্ষম।

কিন্তু এদের পথ ছিল না কুসুমাস্তীর্ণ। পূর্ব জার্মানীর শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপায়ন পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীলদের করে তুলল চঞ্চল। স্যান্ডার, স্টেলম্যাশার প্রমুখ নাৎসী আর তাদের অনুচরদের দিয়ে এরা চেষ্টা করল এই নতুন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেবার। কিন্তু শ্রমিকেরা, কৃষকরা ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। নিজেরা কারখানার, জমির মালিক হবার পর এদের পণ, জান দেব তবু জমি দেব না, কারখানা দেব না। শ্রমিকরা, চাষীরা আজকে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সে-জীবন থেকে এদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা আজ অসম্ভব। তাই প্রতিক্রিয়াশীলদের, নাৎসীদের সম্বন্ধে এরা দিন দিন সতর্ক হয়ে উঠেছে, তাদের পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আর এর মধ্যে নব-জাগ্রত জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যোগ দিচ্ছে সমস্ত পূর্ব জার্মানীর জনসাধারণ।

শিল্পী-সাহিত্যিক কেউই আর এই বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে পারছেন না। সোভিয়েট-অধিকৃত অঞ্চলে যে-নতুন জীবনের সূচনা দেখা দিতে আরম্ভ করল, তা সে-দেশের সত্যকার শিল্পী-সাহিত্যিককে ধীরে ধীরে নিয়ে এল নতুন জার্মানী, নাৎসী-প্রভাব-মুক্ত, ঐক্যবদ্ধ, শান্তিকামী জার্মানী গড়বার কাজে। এভাবেই এগিয়ে এলেন অভিনেত্রী এডিথ ও ঔপন্যাসিক বোহ্‌লার। এঁরা

দুজনেই নাৎসীবিরোধী। এডিথ বরণ করে নিয়েছিলেন খ্যাতির শীর্ষচূড়া থেকে স্বদেশে অজ্ঞাতবাস রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে। আর বোহ্‌লারের দেশত্যাগ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। দুজনেই কিন্তু আগাগোড়া নাৎসী-বিরোধী ছিলেন। নাৎসী-শাসন অবসানের পরে এঁরা কেউই কিন্তু এই নতুন প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে পারলেন না তখনই। ডালগো, মাইকেলিস, সকলফ্‌ প্রভৃতির প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এঁরা নতুন জার্মানী গড়তে এগুতে পারলেন না নিজেদের বুর্জোয়া সংস্কার বশে। একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে অনেকটা দোদুল্যমান অবস্থায় রইলেন এডিথ। আর বোহ্‌লার করতে থাকলেন পর্যবেক্ষণ। নানান লোকের মতামত সংগ্রহ করে, নিজেদের অভিজ্ঞতার বিচার করতে চাইলেন। ক্রমশই তিনি আকৃষ্ট হলেন নতুন সমাজব্যবস্থার দিকে, কিন্তু সংশয়াকুল চিত্তে। কিন্তু জীবনকে, মানুষকে তাঁরা ভালবাসেন। তাই ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে, বুর্জোয়া সংস্কারকে ছিঁড়ে ফেলে ও পশ্চিমী সভ্যতার স্বরূপ নিজেদের রূঢ় কষ্টিপাথরে চিনে নিয়ে এঁরা এগিয়ে এলেন নতুন জার্মানী গড়তে। এঁদের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, যাঁরা সত্যকার শিল্পী-সাহিত্যিক, মানুষকে, জীবনকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা কখনোই জাতির জীবনের এই মহাযজ্ঞের শুভক্ষণে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নতুন দেশ নতুন জীবন, নতুন মানুষ, স্বাধীন সুখী শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়বার মহৎ কাজে তাঁরা যোগ দেবেনই, সে আজ হোক বা কাল হোক।

তাই পূর্ব জার্মানীর এই রূপান্তর সত্যিই গ্যারান্টী অব পীস্‌। তার গ্যারান্টি লেশনার, গ্রিগুগেল, হান্‌স মাইকেলিস, ডালগো, এডিথ, বোহ্‌লার প্রভৃতি।

সত্যজিৎ দাশ

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

PROBLEMS OF ECONOMICS. March, 1952.
A monthly journal issued by the Academy of Sciences of U.S.S.R., Institute of Economics. Price, As. 8.
[প্রাপ্তিস্থানঃ কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা ১৩]

সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের উক্ত পত্রিকাটি সাধারণত রুশ ভাষাতেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। গত এপ্রিল মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে পত্রিকাটির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করে সম্পাদকমণ্ডলী নিঃসন্দেহে এক ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

অর্থনীতিক তত্ত্বালোচনায় পত্রিকাটির মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট ফর দি স্টাডি অফ দি সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক

ইনসটিটিউশনস্ ইন দি ইউ. এস. এস. আর.' কর্তৃক সম্পাদিত প্রখ্যাত 'সোভিয়েট স্টাডিজ' পত্রে অর্থনীতিবিষয়ক যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়, তার ভিত্তি অনেক স্থলেই 'প্রবলেমস অফ ইকনমিকস'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ। 'সোভিয়েট স্টাডিজ' যাঁরা পড়েন 'প্রবলেমস অফ ইকনমিকস'-এর পরিচয় তাঁদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। স্ট্রুমিলিন, অস্ট্রোভিটিয়ানফ, ম্যাকলেনিকফ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্দের পরিচালনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সম্পর্কে তাই অন্যান্য দেশে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

মস্কো অর্থনৈতিক সম্মেলনের আবেদন-ক্ষেত্র অবশ্যই তত্ত্বানুরাগী মহলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। বিরুদ্ধ পক্ষের অনিচ্ছা, অসদিচ্ছা, অপপ্রচার ও বাধা সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মস্কো সম্মেলনের ডাক দেশ ও দলের সীমা অতিক্রম করে সকল দেশের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ্, বিজ্ঞানী, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের কর্মী সকল ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে। এর কারণ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি ব্যবহারিক দিক থেকে ছিল অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ সমাবেশের প্রতি সর্বব্যাপী আগ্রহ যে কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল সম্মেলন শুরু হওয়ার পর। বিশেষ করে, ব্রিটেন ও পশ্চিম ইও-রোপীয় রাষ্ট্রগুলি থেকে অবিলম্বে চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির জন্য কথাবার্তা চালানো হতে থাকল। ব্রিটেন থেকে আরও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-দের ডেকে পাঠান হল তার পরে।

কিন্তু মস্কো সম্মেলনের গুরুত্ব আবার কেবলমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের তাত্ত্বিক তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী। ১৯২৯ সালের মন্দার পর ভেঙে-পড়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সজীব করে তোলার আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কীন্‌স্-নীতি ও নিউ ডীল প্রোগ্রাম। আজ কিন্তু সে-নীতির দিন শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তারপরে অর্ধ দশক ধরে উক্ত নীতি ও তার নানা হেরফেরকে আশ্রয় করেও যুদ্ধোত্তর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি কোন সংকটের হাত থেকে মুক্তি তো পায়ইনি, বরং এই নীতিই সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে। নতুন সমাধানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলেই মস্কো সম্মেলনের এমন বৈদ্যুতিক আকর্ষণ আমরা লক্ষ্য করছি। 'সমান-অধিকারে অবাধ বাণিজ্য ও অর্থ-নৈতিক সহযোগিতা'র যে-ঘোষণা সম্মেলন থেকে উঠেছে তা শুধু সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে-অসমতা তাকে দূর করার জন্য নয়, স্থায়িভাবে বিভিন্ন জাতীয় অর্থনীতি যে-চড়ায় এসে ঠেকে গেছে তার থেকে উদ্ধার করে তাকে নতুন পথের ইঙ্গিতও এ-ঘোষণা দেবে। এই সমাধানের যে তাত্ত্বিক মৌলরূপ তাকে উপলব্ধি করেই আগামী দিনের প্রগতিশীল ব্যবহারিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে বাধ্য, এবং সে রূপকে বুঝতে এই পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি প্রভূত সাহায্য করবে মনে করি।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি ছাড়া মোট তিনটি তত্ত্বমূলক ও চারটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে রয়েছে। এর মধ্যে স্মিরনফের "নর্মালাইজেশন অফ ওঅর্ল্ড ট্রেড এণ্ড দি মনিটারি প্রবলেম" এবং এভরিসকফের "ওয়েজ এণ্ড মীনস অফ কনসলিডেটিং ইণ্টারন্যাশনাল ফাইনানসিয়াল রিলেশনস" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মিরনফ তাঁর বিশদ প্রবন্ধে পশ্চিম ইওরোপের মুদ্রা-সমস্যা ও মুদ্রানীতির বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করেছেন অতি সার্থকভাবে। কীন্সীয়-নীতির চোরাবালি শুধু ঔপ-নিবেশিক অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তথাকথিত স্বাধীন পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোকেও কেন অন্ধ নিয়তির পথে ঠেলে দিয়েছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন স্মিরনফ তাঁর 'ব্যালান্স অফ পেমেণ্ট' ও মুদ্রা-বিনিময়-হার-সম্পর্কিত আলোচনায়। আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যে অন্ত-র্বিরোধের ফলে পশ্চিমী দেশগুলি আত্মরক্ষা ও পুনরুজ্জীবনের নামে যে অবরোধী অর্থনীতির (রেসট্রিকটিভ ইকনমি) ফাঁস পরস্পরের গলায় পরাবার চেষ্টা করছে, সে-ফাঁস আজ কার্যত তাদের নিজের নিজের জাতীয় অর্থনীতি এবং গোটা অর্থ-নৈতিক কাঠামোর গলাতেই অনেকখানি বসে গিয়েছে। তা থেকে বাঁচবার নতুন নিশানা অর্থনৈতিক অবরোধ ভেঙে ফেলায়, সমানাধিকারের ভিত্তিতে বহির্বাণিজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায়।

এভরিসকফ 'ডলার ফেমিন' ও তজ্জনিত মুদ্রামূল্য-বিপর্যয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের মতো অনুন্নত দেশের অর্থনীতির উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সমস্যাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা কিভাবে দেখেছেন ও তার সমাধান কল্পনা করেছেন, সে সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ডলার-সমস্যাকে নিতান্ত সাময়িক মনে করেন, আবার কেউ কেউ ভাবেন দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি চিরস্থায়ী। কিন্তু সমাধানের উপায় সম্পর্কে সকলেরই মূল দৃষ্টিভঙ্গী একই —অবরোধী অর্থনীতি। এ'দের হতাশ মনোভাবের সমালোচনা করে এভরিসকফ বলেছেন,

> "All these different points of view have one thing in common they underrate the importance of an all-round development of international economic co-operation as a means of coping with dollar deficits in West European and many other countries."

অনুন্নত দেশগুলির শিল্পায়নের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন আভানাসিয়েফ এবং কিছুটা কোরোলেন্‌কো। বর্তমান পৃথিবীর ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পরি-প্রেক্ষিতে এ-প্রশ্ন মোটেই শুধুমাত্র হিতৈষণাবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, আন্তর্জাতিক

অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের পক্ষে অতি-বাস্তব ও সময়োচিত। শিল্পোন্নত দেশ-গুলির সহযোগিতার ভিত্তিতেই অনুন্নত কৃষিপ্রধান অর্থনীতির উন্নতি ঘটাতে হবে; আর সে-সহযোগিতা সহযোগিতার আচ্ছাদনে মূলধন ও শোষণ রপ্তানি করে নয়, সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক, সামরিক অথবা অর্থনৈতিক শর্ত-নিরপেক্ষ অর্থ (ক্রেডিট) ও টেকনিক্যাল সাহায্য ধার দেবার ব্যবস্থা করে। অবশ্য এ-নীতির সফলতা ঐতি-হাসিক নজিরেই প্রমাণ করতে হয়, এবং লেখকদ্বয় পূর্ব ইওরোপের জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্র-সমূহ ও চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের বিভিন্ন চুক্তির আলোচনা করে দেখিয়েছেন সহযোগিতা-নীতির প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত গভীর। তুলনামূলকভাবে অনুন্নত দেশসম্পর্কে আমেরিকার 'সহযোগিতার' নীতি উল্লেখ-যোগ্য। সহযোগিতার নামাবলীতে আমেরিকার মূলধন রপ্তানির সাম্রাজ্যবাদী নীতি যে ঢাকা পড়ছে না বরং সে-নীতির চরম শূন্যতা সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটকে দ্রুততর করে তুলছে এ-কথা আজ কে অস্বীকার করবে?

পত্রিকাটিতে উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও চীনের বহির্বাণিজ্য-সম্ভাবনা, চীন-অবরোধের ফলে ব্রিটেনের ক্ষতি এবং আন্তঃ-জার্মানী সমস্যা সম্পর্কে তিনটি তথ্য-মূলক প্রবন্ধও যথেষ্ট মূল্যবান।

সিতাংশু ভট্টাচার্য

সংস্কৃতি সংবাদ

রেবতী বর্মণ: সংস্কৃতি কর্মীর জীবনস্মৃতি

আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র পাহাড় অরুন্ধতীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিগত ৬ই মে নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার একটি প্রতিভাবান্ মানুষের আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল। সেদিন বাংলার কৃতী সন্তান শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম পরম ও প্রকৃত বন্ধু একনিষ্ঠ দেশসেবক কমরেড রেবতী বর্মণের অমূল্য জীবনের অকালে অবসান হল। মানুষ ও তার সমাজের ঘোর শত্রু দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধির জীবাণু অজ্ঞাতে তাঁর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে নীড় বেঁধেছিল এবং দীর্ঘ তেরো বৎসর সে তাঁর জীবনীশক্তি কুরে কুরে খেয়ে প্রাণসংহার করেছে। এই সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ মানুষের মৃত্যুর পথই সর্বদা প্রশস্ত করে রেখেছে, কিন্তু তার বাঁচার ব্যবস্থার কিছুই করেনি। রেবতী বর্মণের অকালমৃত্যুতে সে-অবস্থাটা আজ আরও বেশি অনুভূত হয়েছে।

রেবতী বর্মণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে, ময়মনসিংহ জেলার ক্ষুদ্র শিমুলকান্দি গ্রামে। এই পরিবার ব্রিটিশ আমলে রাজরোষে অশেষ লাঞ্ছনায় ভুগেছে। তাই রেবতী বর্মণের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়েছিল এবং শৈশবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জন্ম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে হলেও তাঁর জন্মস্থানের পরিবেশ ছিল কৃষক-প্রধান। তাই পরবর্তী জীবনে তাঁর উপরে শোষিত কৃষকশ্রেণীর দৈন্যভরা জীবনের প্রভাবই পড়েছিল অত্যন্ত বেশি এবং তাদেরই কল্যাণে, স্বার্থে ও আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তিনি। মুক্তির অদম্য নেশায় মত্ত হয়ে তিনি কৈশোরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের বন্যাস্রোতে। কিন্তু এই আন্দোলনের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কৈশোরের মত্ততা স্থৈর্যধারণ করলে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শিক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন কৃতী সন্তানরূপেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেন এবং এম. এ. পর্যন্ত পরবর্তী সব কয়টি ধাপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত যশ ও খ্যাতি তাঁকে নিশ্চিত আরামের পথে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য লক্ষ্যবস্তু। শিক্ষাজীবনেও তিনি এই আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াননি। ১৯২৭-২৮

সালে তাই আমরা তাঁকে বাঙলার নবজাগ্রত যুব-ও-ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও কর্মীরূপে অবতীর্ণ হতে দেখি। তিনি এক সময় বাঙলার সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনীতির প্রতি প্রবল অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব থেকেই সাহিত্য-সেবার প্রতিও একান্ত ঝোঁক ছিল। সাহিত্য ও পত্রিকাদির প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির এক অদম্য উৎসাহ তাঁর মধ্যে বরাবর ছিল। এই প্রেরণা নিয়েই তিনি ১৯২৮ সালে তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বলব্ধ স্বর্ণপদকটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানার এক ক্ষুদ্রপরিসর কোঠা থেকে মাসিক পত্রিকা 'বেণু' প্রকাশ করেছিলেন। এই যুগ ছিল ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন জোয়ারের যুগ। রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য ও শ্রমিক-কৃষকের সরকার সাড়া এনেছিল। রেবতী বর্মণ তখনো সন্ত্রাসবাদী আদর্শ পরিত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক রুশ-বিপ্লবের সাফল্যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর প্রথম পুস্তিকা 'তরুণ রুশ' প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৩০ সাল বাঙলার বুকে নেমে আসে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বল্গাহীন দমননীতি। এই বছরেই আগস্ট মাসে কুখ্যাত 'বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন'-এর বলে অন্যান্যদের সঙ্গে রেবতী বর্মণও ধৃত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে এবং সুদূর রাজপুতনাব মরুপ্রান্তরে অবস্থিত দেউলী বন্দীশিবিরে দীর্ঘ আট বছর কারাজীবন যাপন করেন। এই দীর্ঘ বন্দীজীবনেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং এই সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন এবং সন্ত্রাসবাদের ভ্রান্ত নীতি সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে তাঁর একান্ত অনুরাগ ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন সকলকেই মুগ্ধ করে এবং বন্দীশিবিরেই অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তিনিও কমিউনিস্ট সংহতি সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভের পরমুহূর্ত থেকেই রেবতী বর্মণ শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতাদ্বারা পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। এই অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে তাঁর অবদান অমূল্য সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বাঙলার কৃষকশ্রেণীর বুকে জমিদারী-প্রথার যে জগদ্দল বোঝা চাপিয়ে রেখেছে তার উচ্ছেদকল্পে ১৯৩৯ সালে ফ্লাউড কমিশনের নিকট বঙ্গীয় কৃষক-সভার তরফ থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল তিনি তার মূল খসড়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারও পূর্বে এবং বন্দীজীবন থেকে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষামূলক কয়েকখানা সহজবোধ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'ক্যাপিট্যাল'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করে

ভারতীয় ভাষায় 'ক্যাপিট্যাল'-এর সর্বপ্রথম অনুবাদকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তা ছাড়া এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র' এই বিখ্যাত পুস্তক অনুবাদ করে তিনি চিন্তাশীল বাঙালী পাঠকদের মনে মানবসমাজের বিকাশের সম্বন্ধে নতুন ধারায় চিন্তার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'মার্কস প্রবেশিকা', 'মার্কসীয় অর্থনীতি', 'সমাজের বিকাশ', 'হেগেল ও মার্কস', 'সোভিয়েট ইউ-নিয়ন', 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি' প্রভৃতি মৌলিক পুস্তিকাগুলি শ্রমিক আন্দো-লনের কর্মী ও সংগঠকদের শিক্ষার পক্ষে অমূল্য অবদান। কৃষকশ্রেণীর দৈন্যভরা জীবন তাঁর মনে খুব আঘাত দিত। তাই অবসর পেলেই তিনি বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে কৃষকজীবনের তথ্যানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকতেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বাঙলার 'কৃষক ও কৃষিসমস্যা' নামে একখানা পুস্তিকার খসড়া লিখেছিলেন। তার অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর শেষ রচনা 'মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ' নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন অবদানরূপেই স্থান পাবে।

ধরণী গোস্বামী

নিরপেক্ষ সংস্কৃতি-রক্ষক!

সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনের বুকস্টলগুলোয় "উদ্দেশ্যমূলক" বা প্রচারধর্মী এই অজুহাতে সোভিয়েটের বই ও পত্রপত্রিকার বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শোনা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এদেশ নিরপেক্ষ, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই নাকি এর মিত্ররাষ্ট্র। অথচ দিনের পর দিন যত্রতত্র প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সরকার পক্ষের লোকজন ও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য একই নিশ্বাসে মার্কিন স্তোত্রপাঠ আর মিত্ররাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কুৎসা গেয়ে চলেন। মার্কিন "পর্যটক" ও "বিশেষজ্ঞ"দের জন্যে অবারিতদ্বার এদেশে এমন কি শান্তি-সম্মেলন উপলক্ষ্যেও সোভিয়েট ও চীনের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা প্রবেশাধিকার না পেয়ে বারবার ফিরে যান। আর আজ রেলপথের লক্ষ লক্ষ যাত্রীর চোখের সামনে থেকে "উদ্দেশ্যমূলক" এই অজুহাতে সোভিয়েট বই ও পত্রপত্রিকা বেমালুম সরিয়ে নিয়ে মার্কিনী 'রীডার ডাইজেস্ট' আর 'কোলিআরস'কে অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এদেশে নিষ্কণ্টক বাজার খুলে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এরই নাম "নিরপেক্ষতা"।

শুনতে পাই এ-গভর্ণমেণ্ট নাকি গণতন্ত্রের বড় বেশি ভক্ত, সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষায় কিছু বেশি অগ্রণী এঁরা। বুঝি তাই কথায়-কথায় এঁদের মুখে সোভিয়েট-"একনায়কত্ব"-এর কেচ্ছা, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিনী "সংস্কৃতির

স্বাধীনতা রক্ষা" অভিযানের তাই এত বড় পৃষ্ঠপোষক এঁরা। আজ অবিশ্যি বিনা দ্বিধায় সোভিয়েটে ছাপা বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদ বা মার্কসবাদের মূল গ্রন্থ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিনের রচনা, বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গ লিও টলস্টয়, তুর্গেনেভ, গোর্কি, শোলোকভ, এরেনবুর্গ ও অন্যান্য লেখকদের সাহিত্যগ্রন্থ, সোভিয়েট দেশের শ্রমশিল্প, কৃষি, শিক্ষাব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, শিল্পসাহিত্য, সংগীত ও খেলাধূলার তথ্য-সম্বলিত প্রামাণ্য বই এবং "সোভিয়েট ইউনিয়ন"-এর মতো সোভিয়েটের জাতীয় পুনর্গঠনের সচিত্র দলিলপত্র, "সোভিয়েট লিটারেচার"-এর মতো মাসিক সাহিত্যপত্র ও "সোভিয়েট উওম্যান"-এর মতো আন্তর্জাতিক মহিলাসমাজের মুখপত্র প্রভৃতিকে এঁরা দেশবাসীর কাছে কৌশলে দুষ্প্রাপ্য করে তুলে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এমনিতেই সংকীর্ণ সুযোগকে আরও সংকীর্ণ করছেন। আর বলছেন, এরই নাম "সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষা"!

সবচেয়ে বড় কথা, এই গভর্ণমেণ্ট বলে থাকেন যে তাঁদের এই "নিরপেক্ষতা", এই "সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষা" এ-সবই শান্তির জন্যে! বিশ্বশান্তির তাঁরা নাকি এক প্রধান প্রবক্তা! আমরা জানি, আজকের দিনে স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান একটি বাধা হচ্ছে জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ভুল-বোঝাবুঝি; আন্তর্জাতিক সমরলিপ্সুদের হাতে আজ সবচেয়ে অব্যর্থ হাতিয়ার সাধারণ মানুষের পশ্চাদ্‌পদতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। আমরা আরও জানি যে, স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার, এই অবিশ্বাস ও অজ্ঞতা দূর করার সবথেকে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে অবারিত সাংস্কৃতিক লেনদেন, পরস্পরের মন-বোঝাবুঝির অবাধ সুযোগ। অথচ আমাদের "শান্তিকামী" ভারত গভর্ণমেণ্ট শুধু যে সোভিয়েট দেশ ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভের সামান্য সুযোগটুকু থেকে দেশ-বাসীকে এইভাবে বঞ্চিত করে অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকারকেই গাঢ়তর করতে সাহায্য করছেন তাই নয়, এরই পাশাপাশি সোভিয়েট দেশ সম্পর্কে জঘন্য কুৎসারটনা ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বপক্ষে খোলাখুলি প্রচারমূলক মার্কিনী বই ও পত্রপত্রিকার নিরঙ্কুশ প্রচারে হস্তক্ষেপ না করে কার্যত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের অংশীদার বনছেন। আর বলছেন, বুক ফুলিয়েই বলছেন, ওঁরা নাকি "শান্তিকামী" "তৃতীয়" পক্ষ!

কিন্তু শিয়রে যখন সমূহ সর্বনাশ, আগুন নিয়ে তখন এই খেলা আর চলতে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রনেতাদের দুমুখো নীতি, কথা আর কাজের মধ্যে সর্বনাশা অসামঞ্জস্য সম্পর্কে সত্যিকার শান্তিকামী ও সংস্কৃতিদরদী মানুষমাত্রেই আজ অবহিত হোন। সম্মিলিত প্রতিবাদ হয়ে ফেটে পড়ুক, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ হয়ে রুখে দাঁড়াক আজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
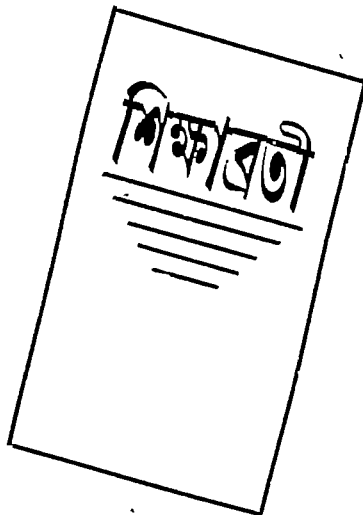
সূচীপত্র

একবিংশ বর্ষ :: দ্বিতীয় খণ্ড :: ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়,—১৩৫৯

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি স্মরণে	রবীন্দ্র মজুমদার	১
কবিতাগুচ্ছ	নৃপেন্দ্র সান্যাল অসিতকুমার ভট্টাচার্য বিতোষ আচার্য	৯
প্রগতি-সাহিত্যে নায়ক চরিত্রের ভূমিকা	সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	১৩
কাজ নেই (গল্প)	সমরেশ বসু	২০
পরিচয়-এর কুড়ি বছর	হিরণকুমার সান্যাল	৩৫
সিংভূমের অভ্রখনি	অসিত রায়	৪২
পুস্তক পরিচয়	গোপাল হালদার নিখিল চক্রবর্তী রবীন্দ্র মজুমদার	৫২
শান্তির স্বপক্ষে	হরিদাস নন্দী	৬৭

সম্পাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় : ৮৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি : নিজের আঁকা প্রতিকৃতি

উপরে ঃ মাদোনা বেনোয়া

নিচে ঃ মাদোনা লিতা

এই দুটি ছবির ব্লক তাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত
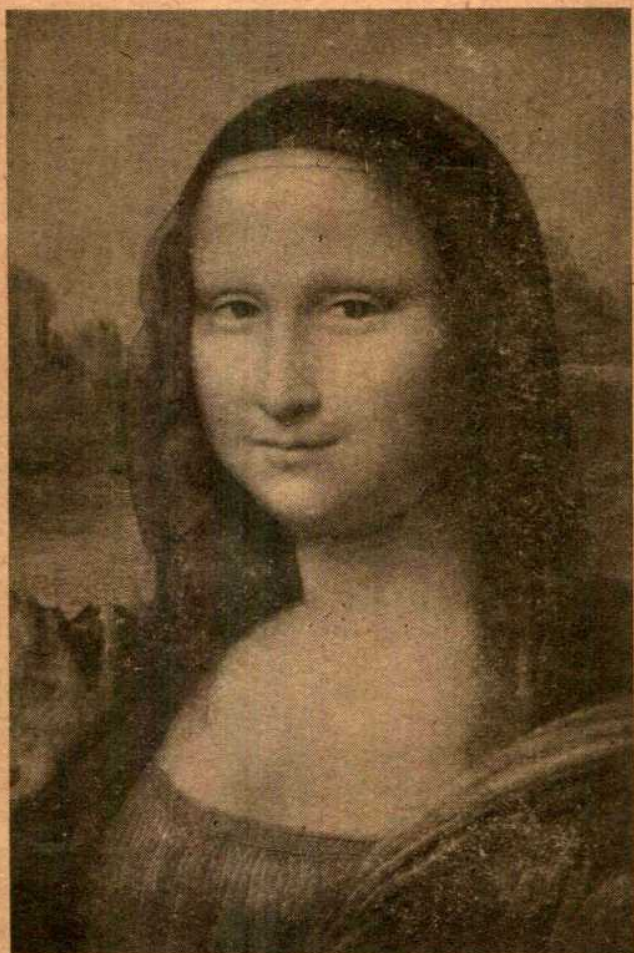
মোনা লিসা

'ম্যাডোনা অফ দি রকস' চিত্রের একাংশ

একাবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড
আষাঢ়, ১৩৫৯

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি স্মরণে

রবীন্দ্র মজুমদার

ইটালীর ফ্লোরেন্স শহর থেকে ষাট মাইল দূরে ভিঞ্চি নামক আঙুর-কুঞ্জে ঘেরা ছোট একটি গ্রাম আছে যার আঙুর-ফসলের খ্যাতি বহুযুগ ধরে আজও পর্যন্ত অম্লান। আরও একটি কারণে এই গ্রামটি স্মরণীয় : ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামের এক অখ্যাত চাষী-মায়ের কোলে একটি শিশুর জন্ম হয়—যিনি পরবর্তীকালে 'ভিঞ্চির লিওনার্দো' নামে পরিচিত হয়ে আজ পাঁচ-শো বছর ধরে পৃথিবীর মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময় হয়ে আছেন।

লিওনার্দোর পাঁচ-শত জন্মবার্ষিকীর বছর এই ১৯৫২। বিশ্ব-শান্তি-সংস্কৃতি-পরিষদ এই উপলক্ষ্যে সর্বদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানিয়েছেন এ-বছরে লিওনার্দোর প্রতিভাকে স্মরণ করার জন্যে, এ-যুগের মানুষের প্রায় প্রত্যেকটি জ্ঞানানুসন্ধানের ক্ষেত্রে আর—বিশেষ করে—বিশ্ব-শিল্পের ইতিহাসে তাঁর অবিস্মরণীয় দানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। লিওনার্দোর জন্মের সঠিক তারিখটি জানা যায় নি, তাঁর জন্মের বছরটিও আমাদের কাছে প্রায় এক-শো বছর আগে পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। লিওনার্দোর পিতা পিয়েরো আন্তোনিও ছিলেন ফ্লোরেন্সের নীলরক্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তৎকালীন ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। খুব ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলায় লিওনার্দোর আশ্চর্য রকম মনীষার স্ফুরণ দেখে আন্তোনিও তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সবদিক থেকে উপযুক্ত রকম ব্যবস্থা করে দেন। শিল্পকলায় তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হন সেই সময়কার ইটালীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভেরোচ্চিও। সাতষট্টি বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর শিল্পের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৃষ্টিশীল আর সতেজ জীবনযাত্রার পর ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে লিওনার্দো ফ্রান্সে মারা যান।

যে-সময়ে লিওনার্দোর আবির্ভাব আর প্রতিভার বিকাশ, সে সময়ে ইওরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মধ্যযুগীয় 'অন্ধকারের কাল' কেটে গিয়ে 'রেনেসাঁস'-এর নব-জাগরণের আলো ফুটছে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায়। ইটালী ছিল সেই ইওরোপীয় নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র, আর ফ্লোরেন্স্ ছিল সেই সময়ে ইটালীর শিল্প-পীঠস্থান। চতুর্দশ শতক থেকে ইওরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই 'রেনেসাঁস্'-এর আরম্ভ। শিল্পে সাহিত্যে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে সৃষ্টির প্রাচুর্যে আর বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষের মনের ক্ষেত্রবিস্তারে ইওরোপের সে এক গৌরবময় যুগ। পরবর্তী গথিক-যুগের নানান্ বিধিনির্দিষ্ট রীতিনীতির বাঁধন থেকে ইওরোপের শিল্পে সাহিত্যে—এবং ক্রমে ধর্মেও—তখন এক সর্বাঙ্গীণ মুক্তির হাওয়া বইছে। সাহিত্যে রাবলে (Rabelais), থের্ভান্তিস্ (Cervantes), বিজ্ঞানে কোপারনিকাস, পৃথিবীর নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে কলম্বাস, চার্চ-এর সংকীর্ণ অনুশাসনের বিরুদ্ধে পরবর্তী 'রিফর্মেশন্'-আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার, ক্যাল্ভিন, আর শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে জিওত্তো, বত্তিচেল্লি, লিওনার্দো, মিকেলেঞ্জেলো, তিশিয়ান্, রাফায়েল, প্রভৃতির সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আধুনিক ইওরোপীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সবচেয়ে বলিষ্ঠ আর আপন বিশিষ্টতার বনিয়াদ পায় মোটামুটি চোদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত বিরাট ব্যক্তিত্ব আর অনন্যসাধারণ মনীষার মধ্যেও যিনি অনায়াসে সকলের পুরোভাগে আসন নিতে পারেন, তিনি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। রেনেসাঁস্-এর সময়কার স্মরণীয় প্রত্যেকটি মনীষীরই মানসিক অনুশীলনের ক্ষেত্র ছিল বহু বিস্তৃত, কিন্তু এঁদেরও প্রত্যেকের বিস্ময় জাগাতো লিওনার্দোর সর্বব্যাপী প্রতিভা। আমরা আজ লিওনার্দোকে প্রধানত চিত্রকর বলেই জানি, যদিও ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নগর-পরিকল্পনা, সাহিত্য আর সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কিছু সার্থক সৃষ্টির নমুনা আমরা পেয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, তার সমসাময়িকরা কিন্তু লিওনার্দোকে প্রধানত ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক আর কারুশিল্পী বলেই জানতেন। পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বা অ্যানাটমি, আবহবিজ্ঞান বা মেটিয়রলজি, সমরবিজ্ঞান বা মিলিটারি সায়েন্স্, হাইড্র-লিক্স্, ইত্যাদিতে তাঁর বহু নতুন আবিষ্কার, অনুসন্ধান, আর পরীক্ষা-প্রয়োগের ব্যাপারে অভিনব সব যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা আজকের বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্ময় জাগায়। সবচেয়ে অভিভূত করে লিওনার্দোর আকাশে ওড়ার একটি যন্ত্র-পরিকল্পনা! চেহারায় আর মেকানিজ্ম্-এর দিক থেকে এটি বিশ শতকের গোড়ার দিককার উড়োজাহাজ-গুলির এত অনুরূপ এবং কার্যকরী থিয়োরীর দিক থেকে আধুনিক অ্যাভিয়েশন্-এর থিয়োরীর এত কাছাকাছি যে পাঁচ-শো বছর আগেকার এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক-কল্পনাপ্রবণ প্রতিভাধর মানুষটির কথা ভেবে বিস্ময়ে নির্বাক হতে হয়। গোটা রেনেসাঁস্-এর যুক্তিবাদী মনটাই যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল লিওনার্দোর মনীষায়:

প্রকৃতির আর জীবনের রহস্যের পেছনে কার্যকারণের মূল সত্যটিতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে বাস্তব আর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে। এবং শিল্পই হোক আর বিজ্ঞানই হোক, তাঁর প্রত্যেকটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে লিওনার্দো তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে এমন সব সাফল্য অর্জন করেছিলেন যার তত্ত্ব-তথ্যগুলি বহুযুগ-পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

রেনেসাঁস্-এর চিত্রে-ভাস্কর্যে একটা নতুন লক্ষণ বিশেষভাবে সুস্পষ্ট : পূর্ববর্তী শিল্পীদের মতো এই যুগের শিল্পীরা শুধুমাত্র প্রকৃতির পর্যবেক্ষক বা "অবজার্ভার অফ্ নেচার" নন, তাঁরা প্রকৃতির রীতিমতো অনুশীলনে বা "স্টাডি অফ্ নেচার"-এ উৎসুক। আজকের মানুষের বিশ্বজগত সম্বন্ধে যে বাস্তব, অবজেক্টিভ্ আর 'বস্তুনিষ্ঠ' বা ন্যাচারালিস্টিক ধারণা, সেটা মূলত রেনেসাঁস্-এরই দান। বস্তুবিশেষ বা 'ইন্ডিভিজুয়াল্ অব্জেক্ট'-এর প্রতি মনোযোগ, প্রাকৃতিক নিয়মকানুন-কার্যকারণের রহস্যানুসন্ধান, শিল্পে সাহিত্যে স্বাভাবিকতা আর বাস্তবতার প্রতি সততা, এবং সর্বোপরি মানুষের গৌরবঘোষণা—এই সবেরই প্রতিষ্ঠা সেই সময়ে। তখনকার শিল্পীরাই প্রথম পূর্ববর্তী গথিক আর্টের বিদেহী আর ধর্মমুখীন প্রতীকবাদ খণ্ডন করে ক্রমশই সচেতনভাবে বাস্তব চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার জগৎকে—'এম্পিরিক্যাল ওয়ার্ল্ড্'-কে চিত্রায়িত করতে লেগেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে চার্চ্-এর নাগপাশ-শাসন আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমসাতন্ত্র—'ইন্টেলেক্চুয়াল্ অথরিটেরিয়ানিজ্ম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে 'এক্লেসিয়াস্টিক্'-এর ওপর আধিদৈবিক নির্ভরতা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর্টও ক্রমশই জীবনের প্রত্যক্ষ রিয়ালিটির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকছে। সেই সঙ্গে অতীতকে নতুনভাবে বিচারের মধ্যে দিয়ে বর্তমানের সম্বন্ধপাতে একটা কার্যকরী ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করাটাও ছিল এই 'নবজাগৃতি'র মস্ত বড় কথা। মোট কথা, রেনেসাঁস্-এর লক্ষ্যটা ছিল মানবিকতা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই বাণীর ঘোষণা। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিবেগটা সঞ্চারিত হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা 'ইন্ডিভিজুয়ালিজ্ম্' থেকে। বলা বাহুল্য, মানুষ হিসেবে আত্মসম্মানবোধ থেকেই আসে ইন্ডিভিজুয়ালিজ্ম্।

'রেনেসাঁস্' সম্বন্ধে মোটের ওপর এই কথাগুলি বলে নিতে হল এইজন্যে যে এই পটভূমিকায় না দেখলে লিওনার্দোর শিল্পরচনাবলীর সুগভীর তাৎপর্য আর পরবর্তীকালের শিল্পের ওপর তাঁর সর্বব্যাপী প্রভাবের মূল কারণটা ঠিকমতো ধরা যাবে না।

মানুষের 'ব্যক্তিত্বের প্রতি, ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট চরিত্রটির প্রতি, লিওনার্দো যে নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর আঁকা প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে লিওনার্দো শ্রেষ্ঠ 'পোর্ট্রেট্'-শিল্পী বলে স্বীকৃত হন। তাঁর আঁকা মানুষের মুখগুলিতে যে আশ্চর্য কুশলী 'মডেলিং' আছে, ভাবের অভিব্যক্তি আর জীবন্ত গতিশীলতা আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে, তা লিওনার্দোর পূর্ববর্তী আর কোন শিল্পীর রচনায় পাই না।

'চিত্ররচনার আপাত উদ্দেশ্যটা কি?'—লিওনার্দোর লেখাগুলির মধ্যে দু'-জায়গায় আমরা এই প্রশ্নের দু'রকমের উত্তর পাই। একবার তিনি বলেছেন. "সমতল একটা পটের ওপর রঙ আর রেখার সাহায্যে 'তৃতীয় মাত্রা'কে (থার্ড্ ডাইমেন্শন্') হুবহু বোঝানোই ছবির উদ্দেশ্য।" আর এক জায়গায় বলছেন, "যেহেতু ছবির সাহায্যে মানুষের মনের কথাটিকে বোঝানো যায় না, সেইহেতু ছবিতে আঁকা ব্যক্তিটির মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ দেহভঙ্গীকে এঁকে। আমার কাছে এইটেই হচ্ছে ছবি আঁকার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য।...এবং মানুষের আত্মার মুকুর যে তার মুখ, সেই মুখের ভাবাভিব্যক্তিকে যদি সততার সঙ্গে হুবহু চিত্রায়িত করা যায় তবে যে-কোন মানুষেরই মুখ এঁকে তার আত্মার পরিচয়ও শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। অবশ্যই তার জন্যে চাই মানুষের প্রতি শিল্পীর গভীর অভিনিবেশ।..." *

ছবি আঁকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন সহজ আর সোজাসুজি উত্তর লিওনার্দোর আগেকার শিল্পীদের কেউ দেননি। এখানে ছবি-আঁকার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে মানুষকে। চিত্র-রচনার এই সংজ্ঞা দু'টির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ লিওনার্দোর নিজের আঁকা ছবিগুলি। লিওনার্দোর রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বজনপরিচিত ছবি তিনটিঃ 'মোনা লিসা', 'ম্যাডোনা অফ্ দি রক্স্' আর 'খৃস্টের শেষ ভোজ' ('দি লাস্ট্ সাপার')। এই তিনটির মধ্যে আবার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রথমটি।

লিওনার্দোর শিল্পীজীবনের মাঝামাঝি সময়ে আঁকা এই 'মোনা লিসা'র পোর্ট্রেট্ যা নিয়ে যুগ-যুগ ধরে শিল্প-রসিক মহলে উচ্ছ্বাসের সীমা নেই। এই 'জিওকোন্দার হাসি' নিয়ে এ পর্যন্ত যে কত প্রবন্ধ-কবিতা-সাহিত্য রচিত হয়েছে তার হিসেব নেই। এই 'মোনা লিসা' যাঁর পোর্ট্রেট, তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের অন্যতম অভিজাত ফ্রান্সেস্কো দেল্ জিওকোন্দো-র স্ত্রী লিসা জিওকোন্দা। বর্তমান ছবিটি আছে ফ্রান্সের লুভ্র্ চিত্রশালায়। এই প্রতিকৃতিটির মুখের সৌন্দর্য, নিবিড় রহস্যে ভরা মৃদু হাসি আর সব মিলিয়ে আশ্চর্য একটি নারী-ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সর্বদেশের

*The Notebooks of Leonardo Da Vinci, (Vols. I & II), Edited by Edward MaCurdy, (Jonathan Cape).

সর্বশ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করে এসেছে। কেউ কেউ আবার জিওকোন্দার ঠোঁট-টেপা হাসির প্রতি বিতৃষ্ণাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, এ হাসি যে এতকাল ধরে প্রত্যেকটি দর্শকের মনে কোন-না-কোন প্রতিক্রিয়া জাগাতে পেরেছে, সেইটেই শিল্পীর অনন্যসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ। পৃথিবীর আর কোন শিল্পীর আর-কোন পোর্ট্রেট্ বিশ্বসাহিত্যের এতখানি জায়গা জুড়ে বসতে পারেনি। ছবিটির রঙীন প্রতিমুদ্রণ দেখলেই বোঝা যায় শুধু রঙের প্রয়োগে চিত্রিত বিষয়ের চরিত্র ফোটানোয় লিওনার্দোর ক্ষমতা ছিল কী অতুলনীয়। ছবিটায় তথাকথিত পোর্ট্রেট্-সুলভ বাহুল্য কিছুমাত্র নেই, শুধু পটভূমিকায় আছে অলংকরণের ধরনে আঁকা পাহাড়ের বৃত্ত—মৃদু হল্‌দে-সবুজ আব্‌ছায়া আলোয় যেন কোন 'ফ্যান্টাসি'র দেশের ল্যান্ডস্কেপের আভাস্—জিওকোন্দার হাসির রহস্যের যেন ইঙ্গিত। এই 'মোনা লিসা'তে অত্যন্ত শক্তিমত্তার সঙ্গে লিনোনার্দো তাঁর কারুকুশলতা বা ক্র্যাফ্‌ট্‌ম্যানশিপ্-এর ক্ষমতা এবং চিত্রিত ব্যক্তির চরিত্র বোঝা আর বোঝানোর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'ম্যাডোনা অফ্ দি রক্‌স্' ছবিটি লিওনার্দোর একত্রিশ বছর বয়সে ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। পরিপ্রেক্ষিত আর 'তৃতীয় মাত্রা' বা 'থার্ড্ ডাইমেন্‌শন্' নিয়ে—অর্থাৎ চিত্রের বহিরঙ্গের দুটি অন্যতম প্রধান বিষয় সম্বন্ধে—রেনেসাঁস্-এর প্রথম দিককার শিল্পীরা যা করতে চাচ্ছিলেন, তারই যেন প্রথম এবং সার্থকতম চরিতার্থতা ঘটেছে এই ছবিটিতে। ছবিটায় 'ফিগার' আছে সবশুদ্ধ চারটি। ফিগারগুলি আর তাদের সমস্ত পরিবেশটি 'ন্যাচারিলিস্টিক' ধরনেই আঁকা, অথচ তবু সব মিলিয়ে যেন তার অতীত কিছু একটার অপরূপ আভাস আছে। প্রায়ান্ধকার পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ফিগারগুলির ওপরে কোথাও উজ্জ্বল কোথাও মৃদু আলো-ছায়ার নাটকীয় বিরোধ ঘটিয়ে সমতল পটে 'তৃতীয় মাত্রা'র এক আশ্চর্য মায়া বা 'ইলিউশন্' সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তৃতীয় মাত্রার ইলিউশন্ আনবার জন্যে লিওনার্দো এই ছবিটির ড্রয়িং-এ বেশির ভাগ জায়গাতেই রেখা-নির্ভরতার বদলে একটা অভিনব ঘনত্বের আমদানী করেছেন। অথচ, প্রত্যেকটি মুখের ড্রয়িং-এ আছে অপূর্ব সুষমায় ভরা রেখার চারুতা। বিশেষ করে. 'ম্যাডোনা'র মুখের অপরূপ স্নিগ্ধ কোমলতায়, নামানো চোখের চাউনিতে সলজ্জ মাতৃত্বের সুখের নিবিড়তায়, ঠোঁটের ভঙ্গীতে অস্পষ্ট স্মিতহাসির আভাসে গোটা ছবিটিতে এক অপূর্ব ভাব-লাবণ্য সঞ্চারিত হয়েছে।

লিওনার্দোর আঁকা অন্য দুটি ম্যাডোনার ছবিতেও—বিশেষ করে 'মাদোনা লিতা'য়—মাতৃত্বের মানবিক মাধুর্যটুকুর পরিচয় আছে। 'মাদোনা লিতা' ছবিটি সম্ভবত 'ম্যাডোনা অফ্ দি রক্‌স্'-এর পরেকার আঁকা, ১৪৯০-এর কাছাকাছি এর রচনা শেষ হয়। ছবিটি মিলান শহরের লিতা নামে একজন শিল্প-রসিকের সংগ্রহে

ছিল, তাঁরই নামে এটি 'মাদোনা লিতা' নামে পরিচিত, ১৮৬৫ থেকে এটি আছে লেনিনগ্রাদ চিত্রশালায়। দুঃখের বিষয়, লিওনার্দোর আঁকা মূল 'মাদোনা লিতা'র যে-রঙ ব্যবহৃত হয়েছিল তার খুব অল্প পরিচয়ই বর্তমান ছবিটিতে পাওয়া যায়—কারণ, পরবর্তী সতের-আঠারো শতকের শিল্পীদের অনেকেই ছবিটিকে "সংস্কার" করার নামে এর ওপরে একেকজন একেক জায়গায় এক পোঁচ করে রঙ চড়িয়ে দিয়ে গেছেন। ছবিটির রঙীন মুদ্রণ দেখলে মনে হয় যেন 'ম্যাডোনা'র বহির্বাসটির ('ক্লোক্') কোন কোন জায়গা আঁকা শেষ হবার আগেই শিল্পী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আসলে কিন্তু ওই জায়গাগুলোতেই ছিল 'মাদোনা লিতা'র মূল লিওনার্দো-ব্যবহৃত রঙ। ছবিটার কম্পোজিশন আর ম্যাডোনার মুখের সমাহিত সৌন্দর্যটুকু যে অক্ষুন্ন থেকে গেছে, সেইটাই আমাদের মস্তবড় লাভ। 'মাদোনা বেনোয়া' ছবিটিও বেনোয়া নামে একজন ফরাসী চিত্রসংগ্রাহকের কাছে ছিল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনগ্রাদ চিত্রশালার সংগৃহীত হয়। এই ছবিটি লিওনার্দোর শিল্পীজীবনের প্রায় প্রথম দিকের রচনা, সম্ভবত ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা। এই ছবিটির কম্পোজিশন সেই সময়ের পক্ষে এত অভিনব আর সমস্ত 'পোর্ট্রেচার' বা প্রতিকৃতি-চিত্রণটি এত বাস্তবধর্মী যে পরবর্তীকালের বহু প্রথম শ্রেণীর শিল্পী—এমন কি, রাফায়েল পর্যন্ত—এটির 'কপি' করেছিলেন। ছবিটি মূলত প্যানেল্-এ আঁকা, সেখান থেকে ক্যানভাস্-এ তুলে নেবার সময় ছবিটির কিছু কিছু ক্ষতি হয়, ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি ঢেকে দেবার জন্যেই ফ্রেম্‌টিকে ওপরের দিকে খিলানাকৃতি করতে হয়েছিল। এই ছবিটিরও কোন কোন জায়গায়—বিশেষ করে, ম্যাডোনার মুখে, গলায়, হাতে এবং শিশুর ডান-হাতে আর বাঁ-পায়ে—পরেকার কোন-একজন শিল্পী নতুন রকমের রঙ চাপিয়ে "সংস্কার" করে দিয়েছিলেন বলে বোঝা যায়। 'মাদোনা বেনোয়া'র মুখে আর দেহের ভঙ্গীতে শিশুকে নিয়ে খেলার ছলে সুন্দর একটি বালিকাসুলভ কৌতুকপ্রবণতায় ভরা সরল আর ঘরোয়া রকমের মাধুর্য আছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে লিওনার্দোর শ্রেষ্ঠতম আর সবচেয়ে মহৎ কীর্তি 'দি লাস্ট্ সাপার' বা 'খ্রীষ্টের শেষ ভোজ' রচনাটি। লিওনার্দোর শিল্পীজীবনের সবচেয়ে পরিণত সময়কার এই রচনাটি শেষ হয় ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পনের শতকের শেষ দশকে। লম্বায় আঠাশ ফুট আর চওড়ায় প্রায় পনের ফুট এই ছবিটি পরিকল্পনার বিরাটত্বে, চিত্র-সংগঠনের পূর্বকল্পিত সুনির্দিষ্টতায় এবং যে-তেরোজনকে চিত্রিত করা হয়েছে (খ্রীষ্ট আর তাঁর দ্বাদশ মন্ত্রশিষ্য বা 'অ্যাপস্‌ল্') তাঁদের প্রত্যেকের অত্যন্ত মানবিক ভাবাভিব্যক্তির আবেদনে এই 'লাস্ট সাপার' যেন পনের শতকের সমস্ত শিল্প-অনুশীলনের প্রত্যেকটি চরিতার্থতাকে অঙ্গীভূত করে রেখেছে। ছবি আঁকার তাৎপর্য কি—এই প্রশ্নের উত্তরে লিওনার্দো যে বলেছিলেন, দেহভঙ্গী আর ভাবাভিব্যক্তি

দিয়ে বোঝানো চাই ছবিতে আঁকা মানুষটির মনের চিন্তা আর তার ব্যক্তিত্ব—সেই সংস্কার সার্থকতম উদাহরণ এই রচনাটি।

জ্যামিতিক ছাঁদের এর কম্পোজিশনটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সবকিছুই যেন ছবিটির কেন্দ্রে খ্রীষ্টের মূর্তিটিকে নির্দিষ্ট করছে। চিত্রিত ঘরটির নির্বাহুল্য আর অতিসাধারণ রকমের স্থাপত্য ওই একই উদ্দেশ্যকে ঘনীভূত করেছে। লম্বা খাবার-টেবিলের এক সারিতে মাঝখানে খ্রীষ্ট আর তাঁর দু'পাশে ছজন করে বারোজন মন্ত্রশিষ্য। এই বারোজনকে তিনজন করে চারটে 'গ্রুপ'-এ এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁদের দেহের গতি-সংস্থান আর ভাবভঙ্গীর অনুসরণেই দর্শকের চোখ অনায়াসে একটা গ্রুপ থেকে অন্য একটা গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে আসে, অথচ প্রত্যেককে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে নিতেও কোন অসুবিধে না হয়—প্রত্যেককেই শিল্পী দেহের গতিভঙ্গীর দ্বারা যতখানি, চেহারার দিক থেকেও ততখানিই বিশিষ্ট করে তুলেছেন। এটা করবার জন্যেই লিওনার্দো 'গস্‌পেল্‌'-এ বর্ণিত এই ঘটনাটির সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েছেন তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে : পন্টিয়াস্ পিলেট্-এর সৈন্যদল খুব শীঘ্রই খ্রীষ্টকে বন্দী করবে, কাঁটার মুকুট পরে গোল্‌গোথা-র শ্মশান-প্রান্তরে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে মানবপুত্রকে,—পরম আত্মদানের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে মানুষের প্রতি তাঁর ক্ষমা আর মহা-প্রেমের বাণীর সার্থকতা—তাঁর জীবনের সেই চরম সত্যটি খ্রীষ্টের কাছে অজানা নয়—সেই অনিবার্য পরিণামের দিকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছে তাঁরই একজন মন্ত্রশিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রিয় শিষ্যদের সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে এইটেই যে তাঁর শেষ আহার্য গ্রহণ, তারই আভাস দেবার জন্যে তিনি বলে উঠেছেন— "One of you shall betray me !" —যে-মুহূর্তটিতে খ্রীষ্টের একথা বলা শেষ হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিকেই লিওনার্দো রূপায়িত করেছেন এই ছবিটিতে। খ্রীষ্টের কাছে এই ব্যাপারটা একটা অনিবার্য ঘটনামাত্র, দুঃখের, কিন্তু আকস্মিক নয়—তাই তাঁর মুখের ভাবে একটা বিষণ্ণ অথচ শান্ত আত্মসমাহিতি। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে খ্রীষ্টের এই উক্তি প্রচণ্ড উত্তেজনা আর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এঁদের প্রত্যেকের মুখভাবে আর দেহভঙ্গীতে লিওনার্দো প্রত্যেকের বিশিষ্ট চরিত্রটি ফুটিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে। খ্রীষ্টের ডান দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে একটু পেছনে মাথাটা হেলানো ভঙ্গীতে সেণ্ট জেম্‌স্—এ হেন নিদারুণ শয়তানি যে করবে সেই অজ্ঞাত বিশ্বাসঘাতকের প্রতি অভিসম্পাত উচ্চারণ করছেন। তাঁর পাশেই সেণ্ট ফিলিপ—সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বুকে হাত চেপে ধরে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততা ঘোষণায় ব্যস্ত : "I shall abide with Thee, Master." সেণ্ট টমাস—গস্‌পেল্‌-এ যাঁর উল্লেখ আছে "The doubting Thomas" বলে—তিনি যেন খ্রীষ্টের ওই কথাটি সঠিক কিনা যাচাই করার

জন্যে সদ্য সদ্য প্রমাণ চান। খ্রীষ্টের বাঁ দিকে সেণ্ট্ জন—খ্রীষ্টের প্রিয়তম আর সবচেয়ে অনুগত শিষ্য—এই সাংঘাতিক ট্র্যাজিডির আসন্ন সম্ভাবনায় অভিভূত, তিনি যেন এই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। সেণ্ট জন আর সেণ্ট জেম্স্ যে আসল সংকটের মুহূর্তে খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে যাবেন—সেইটাকে বোঝানোর জন্যেই লিওনার্দো তাঁদের দু'জনকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার ভঙ্গীতে এঁকেছেন। তাঁদের পাশেই সেণ্ট পিটার—গস্পেল্-এর বর্ণনায় যিনি 'কাজের লোক'—সামনের দিকে এগিয়ে আসার ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে সদ্য-প্রকাশিত এই খবরে তাঁর ক্রুদ্ধ মনোভাবটি, বিশ্বাসঘাতকটিকে তিনি হাতেনাতে ধরে ফেলে সরাসরি উপায়ে আসন্ন সর্বনাশকে প্রতিরোধ করতে চান। একমাত্র জুডাস জানে খ্রীষ্টের এই কথার মানে। তার দেহভঙ্গীতে লিওনার্দো ফুটিয়ে তুলেছেন একটা আড়ষ্ট সংকোচের ভাব, অপরাধবোধের গ্লানিতে সে নিজেকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে গিয়ে খাবার পাত্রটি উল্টে ফেলেছে কনুইয়ের আঘাতে, তার সংকুচিত মনোভাবের প্রকাশ তার হাতের আঙুলের মোচড়ে—যেন সে তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে পাওয়া টাকার থলিটিকে দুমড়ে মুচড়ে পিষে ফেলতে চায়। অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেকের মুখ লিওনার্দো আলোকসম্পাতে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন, একমাত্র জুডাসের পাশ-ফেরানো মুখটিকে রাখা হয়েছে আধো-অন্ধকারে।

নাটকীয় তীব্রতায়, সমস্ত চিত্রপরিকল্পনার সুসংবদ্ধতায় আর বাস্তবতাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রকাশ করার অসামান্য ক্ষমতায় একমাত্র এই রচনাটিই লিওনার্দোকে চিরস্মরণীয় করে রাখার যোগ্য। দেস্ত্-এর একটি ছোট ডমিনিকান চার্চ-এর দেয়ালের গায়ে একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট্ হিসেবে লিওনার্দো এক পোঁচ পীচ্-এর প্রলেপ দিয়ে নিয়ে তার ওপর তেল-রঙে ছবিটা এঁকেছিলেন। এই জন্যে এবং অল্প দিনের মধ্যে ঘরটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়ায় কালক্রমে ছবিটার উজ্জ্বলতা আজ অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকুতেই লিওনার্দোর প্রতিভার পরিচয়ে আমরা অভিভূত হই। স্রষ্টা আর শিল্পী মানুষের সবচেয়ে পরিপূর্ণতার পরিচয় পাই লিওনার্দোর রচনাবলীতে, নমস্কার জানাই তাঁর সর্বব্যাপী মনীষার উদ্দেশে।

তোমার জন্য

নৃপেন্দ্র সান্যাল

তোমায় আমি কি দেব বল কি দেব উপহার,
এসেছ এই চৈত্রশেষে হাওয়ার হাহাকার
এনেছ। নেই ফসল মাঠে গোলায় ভরা ধান।
তোমায় দেব আমার এই তৃষিত মরু-প্রাণ।

কঠিন পোড়া হৃদয় হতে কখন গেছে ঝরে
কৃষ্ণচূড়া। এখন বল কি দেব মুঠো ভরে?
পাখির মতো আকাশে চেয়ে চোখের তারা জেলে
গুণেছি দিন, সূর্য হয়ে দিলে না রোদ মেলে।

এখন নেই গানের ভাষা, এখন কথা শুধু
দগ্ধ বালু মরুর। প্রাণ ফসল-কাটা ধূ-ধূ
খেতের মতো; উজাড়-করা দিনের নীল ঢালা
তোমায় দেব আমার যত দুঃস্বপনের জ্বালা।

আমার কাছে যা কিছু ছিল বুনেছি, তার ভ্রূণ,
শ্যামল প্রাণ পেয়েছে, মাঠে হেমন্তে আগুন
ছড়াবে, ফাটা মাটির দাগে। জনতা জড়ো ভিড়
মিছিলে মিশে, মশালে জ্বলে জীবন অস্থির।

এখন তবে জ্বলুক আলো মেঘের পাখা ছিঁড়ে
কোটরাগত চোখের কোণে। শিথিল বাহু ঘিরে
আসুক নেমে স্রোতের জল। এখন তাই বুঝি
তোমার কালো কাজল চোখে আমার ছায়া খুঁজি।

কথা

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

১

যত কথা সব, সবই যে অর্থহীন
সবই যে শূন্য বিপর্যস্ত লাগে,—
ছাই হয়ে গেল প্রলাপমুখর দিন
বন্দী নগরী, কুয়াশার ছায়া-পাশে,
আজ সন্ধ্যার মাঠের হলুদ ঘাসে,
মৃত পতঙ্গ কিসের স্বপ্নলীন?

ঘিস্কাপে ঘসা কাঠের চাক্‌লা জেবলে
চলেছে আলাপ, কোথায় কি বল পেলে?
হ'ল নাকি কিছু আজব শহর চষে,
ধুয়ে ফুটপাত পুরনো হলুদ ঘসে,
কুয়াশার সাথে নাও রাস্তার ঘ্রাণ—
ভাল না লাগলে একটি কোণায় বসে,
একা ফেলে যাও খোলামকুচির দান।

তারপরে রাত, ঘন্ন হবে ঘন আরো,
টেনে নিয়ো চট শূন্য বুকের পর,
ঘুমে ভুল করে হয়তো তাকাতে পারো
কাছে মনে হবে, তারাজবলা প্রান্তর।
হয়তো আবার সপ্তর্ষি'র মতো—
মনে পড়ে যাবে ফেলে আসা সেই ঘর।

২

ক্লান্ত কলম শাদা কাগজের গায়
এ'কেবে'কে চলে যায়,
যে-কথা বলার সে-কথা পাই না খুঁজে—
শ্বাস রোধ করে রুদ্ধ কী বেদনায়।
রুদ্ধ কলম শাদা কাগজের গায়—
রক্তের দাগ এ'কে রেখে যেতে চায়,
জীবন-মৃত্যু উদ্ধত ইতিহাস—
থরথর করে উত্তাল চেতনায়।

কালের শিলায় কোন্ পথিকের তরে
রাখি জীবনের স্বর্ণ-স্বাক্ষর—
জানি নাকো, তবু, অক্ষরে অক্ষরে
রাত্রিরুদ্ধ এই পৃথিবীর স্বর
মুখরিত হয়, কী জানি, কেন যে, তার
হিসেব রাখি না, রাখতে চাই না আর,
শুধুই কলম, শাদা কাগজের গায়
রক্তের দাগ এঁকে রেখে যেতে চায়।

৩

কথা তবু কথা, কথা দিয়েই
জন্মের দেনা শোধ করি—
কথা তবু কথা, কথা দিয়েই
আত্ম চেতনা বোধ করি—
কথা তবু কথা, কথা দিয়েই
মৃত্যুর বাহু রোধ করি—
কথা তবু কথা, কথা দিয়েই
জন্মের দেনা শোধ করি।

উত্তরের জন্যে

বিতোষ আচার্য

কেউ বলে ঃ　এ পৃথিবী,
তুমি, আমি, সকলি অলীক।
কেউ বলে ঃ　মানুষ মনুর বংশ,
যখন যেদিকে হাওয়া পাল তুলে নিশ্চিন্ত আরামে
সংসার-সমুদ্রে থেকে তীর কাছে পাবে।
তবুও উত্তপ্ত দিন
আরক্তিম ক্ষুধায় যখন
নিথর আকাশ ঘিরে বেদনা কুড়ায়;
অন্ধতার চোরাপথে
বিমর্ষ, পরাস্ত মন
বাঁচার চেষ্টায় হয় যখন তন্ময়,
মনে হয় এ-পৃথিবী অলীক তো নয়!

সহস্র জীবনমন যখন একাগ্র দেখি,
যখন উৎকণ্ঠা দেখি শ্রমক্লান্ত চোখের তারায়,
তুমি কি স্বীকার করো এ-পৃথিবী শুধুই অলীক?
যখন বিরুদ্ধ বায়ু
ভয়াল মৃত্যুর দিকে অবিরত টানে;
যখন স্রোতের মুখে
আসমুদ্র উপকূল ঘনীভূত কুয়াশায় ছায়;
দেখেছি সম্ভব নয়—
জীবন দুঃসহ তবু
নোঙর ওঠানো হবে মৃত্যুমাঝে লীন।
প্রত্যেক দিনের শেষে
সমস্যায় পরাজিত নিরুপায় ভগ্নজানু মন
তবুও প্রত্যহ খোঁজে নিরালম্ব শান্তিময় নীড়।
অস্থির উন্মত্ত দিনে
আসন্ন রাত্রির আগে
তুমি কি স্বীকার করো গতানুগতিকভাবে
পাল তুলে ভেসে যাওয়া?
তুমি কি বিশ্বাস করো সমীচীন হবে?
তোমার আমার শ্রমে
যেখানে বিদীর্ণ মাঠে ফসলের গান;
তোমার আমার মনে
যে-অঙ্কুর মাথা তোলে সে তো নয় অলীক বা ভুল।
এ-কথা তুমিও জানো, জানি আমি,
আর যারা আমাদের মতো।
পুত্র, কন্যা, পরিবারে
খুশির ঝলকে কেন
অলীক, মিথ্যার ব্যূহ উদ্ভিন্ন হবে না?
একান্ত প্রাচীন প্রশ্ন, আদিম আগ্রহ।
তুমি কি ভেবেছো কিছু?
পত্রান্তরে জানিও আমাকে॥

প্রগতি-সাহিত্যে নায়ক-চরিত্রের ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সাহিত্যে নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গর্কি যা বলেছেন তাকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশের প্রগতি-সাহিত্যের একটা মস্ত দুর্বলতা দূর হবে। গর্কি জীবিত থাকতে তরুণ সোভিয়েট সাহিত্যিকদের প্রেরণা দিতেন যাতে তারা জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি করে। আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য তাঁর সেই শিক্ষাকে রূপায়িত করেছে।

'লিটারেচার এবং লাইফ' বইটিতে শিল্পতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে গর্কির লেখার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর মূল প্রবন্ধের নাম হল 'ব্যক্তিত্বের বিনাশ' (ডেসট্রাকশন অফ পারসন্যালিটি) মানবসমাজ তথা সংস্কৃতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সঙ্ঘজীবনের সঙ্গে নিবিড় এবং একাত্ম যোগের ফলেই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। বিরাট ব্যক্তিত্বের শক্তির উৎস হল সঙ্ঘজীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগ। যদিও প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে অতীত ইতিহাস নিয়ে তবু তার মধ্য দিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রগতি-সাহিত্যিকদের জন্য অমূল্য শিক্ষা ও পথের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে। গর্কির মূল শিক্ষাগুলি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে যাই। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে আসবে।

মানবতা তার শৈশবে আত্মরক্ষার তাগিদে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চালায়। তখন তার সম্বল খুব অল্প, জ্ঞানও অস্পষ্ট। তাই সে প্রকৃতিকে যে-দৃষ্টিতে দেখে তাতে ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা এক সঙ্গে মেশানো। তা থেকে ধর্মের সৃষ্টি হয়। গর্কি বলেন যে, সেই আদিম সহজ ধর্ম হল কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস, প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সমষ্টি দিয়ে গড়া। বিরোধী বহিঃশক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের মারফতে অর্জিত সে-জ্ঞান।

প্রকৃতির উপর প্রথম জয়লাভের ফলে মানুষের মনে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস জাগল, জাগল নিজের শক্তির জন্য গৌরববোধ এবং নতুন নতুন জয়ের আকাঙ্ক্ষা। তা থেকেই জন্ম নেয় মহাকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা। মানুষ নিজের সম্বন্ধে যে-জ্ঞান লাভ করেছে আর নিজের কাছে যা দাবি করে অর্থাৎ বাধার উপরে জয়লাভের কামনা, তার সমষ্টি বা ধনভাণ্ডার হল ঐ সব প্রাচীন মহাকাব্য। পরের অধ্যায়ে মহাকাব্য আর রূপকথা এক সঙ্গে মিশে গেল। জনগণ মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রে

নিজেদের যৌথচেতনার সমস্ত শক্তি আরোপ করে। সেই সমবেত শক্তির প্রতীক বলেই নায়করা হয় দেবতার সমকক্ষ বা প্রতিস্পর্ধী। ভাষা, মহাকাব্য এবং রূপকথা সবই হল জনগণের যৌথ সৃষ্টি, কোন একজন লোকের অনুপ্রেরণার ফল নয়। ব্যক্তি সেই সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে নয়, যৌথজীবনের অংশীদার রূপে।

ভাষার উৎপত্তি এবং গঠন যে সমবেত প্রচেষ্টার ফল সে কথা এখন ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ইতিহাস উভয়েই স্বীকার করে। মহাকাব্য এবং রূপকথার আকার (ফর্ম) এবং বিষয়বস্তুর (কনটেন্ট) মধ্যে যে অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়, যে অতুলনীয় সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে তা সম্ভব হয়েছে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ সমাজজীবনের অফুরন্ত সম্বলের সাহায্যে, সঙ্ঘজীবনের চিন্তায় ঐক্যের ফলে। সমগ্র জনগণ মিলিতভাবে সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছে বলেই হারকিউলিস, প্রমিথিউস, স্ভিগার্টের মতো সাধারণের অতুলনীয় প্রতীক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

আদিম যুগের সমাজে ব্যক্তি ছিল একান্তভাবে যৌথজীবনের অঙ্গ। পরস্পরের চিন্তাভাবনা, আনন্দবেদনা, অভিজ্ঞতা এবং প্রশ্নের সঙ্গে সকলে নিবিড়ভাবে পরিচিত। সকলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তৎক্ষণাৎ সমষ্টিগত জ্ঞানের ভাণ্ডারে মিশে যায় ও তাকে সমৃদ্ধ করে।

সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজে 'ব্যক্তিত্বে'র সৃষ্টিও হয়েছিল সমবেত চেষ্টায়। যখন প্রাকৃতিক তথা অন্য কোন শক্তির আক্রমণে সমাজের কোন সদস্যের মৃত্যু হত তখন সে-ক্ষতি ও তার দরুণ শোক অনুভব করত গোটা সমাজ। গর্কি বলেন যে, মৃতের অন্ত্যেষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রথম সামাজিক জীবন থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। বাধা ও বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহস পাওয়ার জন্য এবং অশুভ শক্তিকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে মৃতের ব্যক্তিত্বকে মহাশক্তিধর অমর সত্তায় পরিণত করা হল। সমাজের সমষ্টিগত দক্ষতা, জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণ তার প্রতি আরোপ করা হল। জীবিত ব্যক্তিরা তখনও সমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র নিজের আমিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই তারা নিজের চিন্তা, 'বীরত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে 'মৃতে'র সত্তায় আরোপ করে। এইভাবে যে-নায়কের সৃষ্টি হল সে সমাজের যৌথ কর্মশক্তির প্রতিমূর্তি ও সমাজের মানসিক শক্তির প্রতিবিম্ব।

নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যুকে জীবনে পরিণত করার কামনার তাগিদে। সে আর বিমূর্ত ভাবমাত্র নয়। সমাজ যাকে নিজের সমস্ত শক্তি, দরদ এবং সম্পদ দিয়ে সৃষ্টি করল, তার জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল নিজের মাঝখানে। এহেন মহানায়ক যে আদিম সমাজের কল্পনায় অল্পদিনের মধ্যে দেবত্ব বা দেবতার সমান মর্যাদা লাভ করবে তাতে আশ্চর্য কি। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে, বিভিন্ন বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ের কামনা, স্বপ্ন এবং সম্ভাবনায় বিশ্বাস মিলে প্রমিথিউসের

মতো অপূর্ব প্রতীক রচনা করেছে। আসলে তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে মানবতার আত্মশক্তি ও নিজের মহান্ ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস।

ইতিহাসের গতিতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে ব্যক্তি তথা ব্যক্তিত্বের নতুন বিকাশ দরকার হয়ে পড়ল। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ছাড়াও অন্য জাতি এবং উপজাতির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ চলার ফলে আদর্শ সমাজের মধ্যে শ্রম-বিভাগ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেই মুহূর্ত থেকে সঙ্ঘশক্তিকে ভাগ করে নেতা বা ঋষির ভূমিকা পূর্ণ করার জন্য জীবন্ত ব্যক্তিকে খাড়া করা হল। কিন্তু নেতা বা পুরোহিত যেই হোক না কেন, তখনও তারা সমাজের যৌথজীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়নি। যেভাবে মহাকাব্য বা রূপকথার নায়ককে সমষ্টিগত জ্ঞান ও শক্তির আধাররূপে চিত্রিত করা হয়েছিল, নেতা বা পুরোহিতকেও প্রথমে সেইভাবে যৌথশক্তি এবং জ্ঞানের দ্বারা মহীয়ান করা হয়। এই স্তর থেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রপাত। এবং পরবর্তী যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ট্রাজিক পরিণতির অঙ্কুরের উদ্‌গম।

গোড়াতেই অবশ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির 'আমিত্ব' নিজেকে যৌথজীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শেখেনি। সমাজ তাকে দেখেছে কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালনের মাধ্যম হিসাবে। ব্যক্তিও নিজেকে সেইভাবে দেখেছে, সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আধার এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার যন্ত্ররূপে। কিন্তু ক্রমে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগতে থাকে। সঞ্চিত সামাজিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে দক্ষতা এবং উদ্যোগ নেওয়ার প্রক্রিয়ার-মধ্য দিয়ে তার মনে নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি হয়। সমাজ-থেকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিশক্তিরূপে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে।

সমাজ এতদিন ব্যক্তির শক্তির বিকাশকে নিজের সমবেত শক্তির জীবন্ত প্রমাণ বলে ভেবেছে। নেতার সামনে রয়েছে মহাকাব্য আর রূপকথার নায়কদের দৃষ্টান্ত। সে চেয়েছে নায়কদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে। আর সমাজ দেখেছে নেতার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নতুন নায়ক-চরিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু অতীত নায়কদের গৌরবের ছায়া এবং নিজের ক্ষমতার স্বাদ ক্রমে নেতার মনে প্রভুত্বের মোহ সৃষ্টি করল। অর্থাৎ গোড়াতে সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যেযে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, সেই ক্ষমতাকে ব্যক্তির অধিকারে স্থায়ী করতে চাইল। তা সম্ভব হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে, সমাজের অধিকার এবং শক্তি খর্ব করে। তাই গর্কি বলেন যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এক দিক দিয়ে মানব সৃষ্টির ইতিহাসে রক্ষণশীল ভূমিকা অভিনয় করেছে। কেননা সমগ্র সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে খর্ব করে, তার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে তবেই সেই ব্যক্তি বা নেতা নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে সমাজের ঊর্ধ্বে।

ফলে শীঘ্রই সমাজ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল এবং প্রতিরোধ শুরু করল। দুই-একজন নেতার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে শুরু করে কিভাবে ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের রথ এগিয়ে চলেছে তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

গর্কি দেখিয়েছেন যে, যে-পরিমাণে 'ব্যক্তিত্ব' জনগণের যৌথজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল, সেই পরিমাণে ক্ষীণ হতে লাগল ব্যক্তিত্বের শক্তি, ক্ষমতা এবং গৌরবের পরিধি। অন্য দিকে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ নানা ভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। লোকগাথা, কাহিনী এমন কি কিছু পরিমাণে লোকসংস্কারের মধ্যেও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। তা হল সমষ্টিকে উপেক্ষা এবং অপমান করে বড় হতে চায় যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি, তার প্রতি বিদ্রূপের সুর। ঐ-সব গল্প, উপকথা ইত্যাদি ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দেয় যে সে যে-পথ নিয়েছে তাতে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যে-ব্যক্তি মহত্ত্বের কামনা করে তার পরিণতি হয় ফাউস্টের মতো নিষ্ঠুর ব্যর্থতায়।

ব্যক্তি যত জনগণের যৌথজীবন থেকে দূরে সরে গেছে ততই ক্ষয়ে গেছে তার অন্তরের সম্পদ, বৈচিত্র্য। তার জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ট্র্যাজিডির সুর। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে গর্কি একটি জিনিস খুব চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—তা হল ইতিহাস রচনায় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সম্পর্কে। সমাজ ও জাতির জীবনে নতুন অভ্যুত্থানগুলির যুগসন্ধিতে আবার মহান্ ব্যক্তিত্বের দেখা পাওয়া যায়। তার কারণ কী? সামাজিক তুফান বা অভ্যুত্থানের সময় মহান্ নেতার ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় অগণিত মানুষের মিলিত ইচ্ছা ও কর্মশক্তির আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। অসংখ্য মানুষ যেন সমবেতভাবে সেই ব্যক্তিত্বকে নিজেদের সৃষ্টিশক্তির রূপায়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সে-ব্যক্তি যত বেশি পরিমাণে সেই জাগ্রত জনসমুদ্রের সামূহিক ভাবনা, চেতনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামীসঙ্কল্প এবং অভিজ্ঞতাকে আপনার করে নিতে পারেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব হয় তত বিরাট, তত মহান্।

গর্কির কথার প্রমাণ পাই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত গণমুক্তি সংগ্রামে তো বটেই—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও তার উদাহরণ পাওয়া যায়। কারণ তখন সাময়িকভাবে বুর্জোয়া নেতারা জাতির সমগ্র জনগণের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু শ্রমিক-নেতৃত্বে চালিত মুক্তি-সংগ্রামেই এই ধরনের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুঙ। তার কারণ তাঁরা জনগণের মুখপাত্র হিসাবে নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্বকে সচেতনভাবে পূরণ করতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণীর নেতার পক্ষেই পরিপূর্ণ ও সুসঙ্গতভাবে গণমানসের সঙ্গে নিজেদের যোগস্থাপন এবং নিজেদের কাজে, ভাষায় গণমানসের সঠিক প্রতিফলন করা সম্ভব।

অগণিত মানুষের মিলিত ইচ্ছা ও চেতনার, এক কথায় প্রাণবন্যার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ব্যক্তি আবার মহাকাব্যের মহানায়কের মতো অপূর্ব সুন্দর এবং মহাশক্তিধর হয়ে ওঠে।

উপরের আলোচনা থেকে দুটি খুব পরিচিত প্রশ্নের আমোঘ উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্নগুলি করেন অ-মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের অনেকে আশঙ্কা করেন যে সমাজতন্ত্রবাদী সমাজে বুঝি ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ হবে রুদ্ধ। কিন্তু গর্কির বিশ্লেষণ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে সত্য এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্রবাদী সমাজেই ব্যক্তিত্বের যথার্থ পূর্ণ বিকাশ হবে, তার সামনে দেখা দেবে অন্তহীন সম্ভাবনা। কেন না ব্যক্তি সেখানে সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রাণশক্তির উৎসমূলের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছে। সমগ্র সমাজের বাঁধনহারা প্রাণবন্যার থেকে অফুরন্ত শক্তি সংগ্রহ করে ব্যক্তিত্ব এগিয়ে যাবে নব নব জয়ের পথে। বহুকে বঞ্চিত করে একজনের শ্রেষ্ঠত্বলাভ নয়, সেখানে সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী বিচিত্র পথে বিচিত্র দিকে শ্রেষ্ঠতা লাভ করবে। মৃত্যুঞ্জয়ী জনগণের সামগ্রিক শক্তিতে তারা বলীয়ান হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি কী? সোভিয়েট কথা-সাহিত্যের নায়কদের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব দেখে অনেক অ-মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন করেন। তাঁরা রুশের প্রাক্‌বিপ্লব উপন্যাসে ও গল্পে নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি দেখে যে-রস উপভোগ করেন সোভিয়েট উপন্যাসে তার অভাব দেখে তাঁদের রসভঙ্গ হয়। কেন না সোভিয়েট উপন্যাসের প্রধান নায়কেরা একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে কাজ করেন। যদি বিষয়টি তলিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে রসভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রাক্‌বিপ্লব রুশে বা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সাহিত্যে সাধারণত যে-সব নায়ক-নায়িকার দেখা পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, হয় সমাজের চাপে নিষ্পিষ্ট নতুবা এককভাবে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কিন্তু এই সব ব্যক্তির সামনে বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিত পরিস্কার নয়, কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পুরনো সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইতে জয় সম্ভব সে-সম্বন্ধে ধারণা নেই। পুরনো সমাজের ভাবধারা, সংস্কার প্রভৃতি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তাই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেও এই সব নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সংশয় ও সন্দেহের ভারে কুণ্ঠিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেও অতীতের প্রেত তাঁদের পিছনে টেনে রাখতে চায়। অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল হল সেখানে। অবশ্য যে-সব সাহিত্যিক সচেতনভাবে ভবিষ্যতের শক্তির পক্ষ নিয়েছেন, পরিপ্রেক্ষিত যাঁদের সামনে পরিস্কার তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠেছে।

সোভিয়েট সমাজে ব্যক্তি আবার সমাজজীবনের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পেয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধের অবসান হয়েছে এবং সামনে পরিপ্রেক্ষিত পরিস্কার। অতএব উপরোক্ত ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয় ও সন্দেহের দোলা সোভিয়েট নায়কের চরিত্রে আসবে কোথা থেকে? সেখানে দ্বন্দ্ব চলে সচেতন-ভাবে, সমবেত প্রচেষ্টায় জীর্ণ পুরাতনের অবশেষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য, শুধু সমাজের বাইরের জীবনেই নয়, মানুষের অন্তরজীবনের ক্ষেত্র থেকেও সেগুলিকে উপড়ে ফেলার জন্য। আদিম সাম্যবাদী সমাজের চাইতে বহুগুণ উন্নত স্তরে নতুনভাবে সত্যকার নায়ক-চরিত্র সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তারা সোভিয়েট জনগণের প্রতীক। গর্কি সোভিয়েট সাহিত্যে এই ধরনের নায়ক সৃষ্টির কর্তব্যের উপর খুব বেশি জোর দিতেন। কেন না সেই নায়কেরা হবে 'সোভিয়েট বাস্তবের' প্রতিচ্ছবি।

প্রাক্-বিপ্লব যুগেও সংগ্রামী জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত, তাদের নবজাগ্রত চেতনা এবং শক্তির প্রতীক হিসাবে নায়ক-চরিত্র সৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গর্কির নিজের লেখাতেই মেলে। 'মাদার'-এর প্রধান চরিত্র পাভেল তার অপূর্ব উদাহরণ। সব দেশের, বিশেষত আমাদের দেশের প্রগতি-সাহিত্যের পক্ষে গর্কির নির্দেশ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রগতি-সাহিত্যিক তো শুধু জনসাধারণের দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারেন না অথবা বিমূর্তভাবে জনগণের সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবী জয়ের কথা ঘোষণা করে অথবা গণসংগ্রামের কাহিনীর নিছক লিপিকার হওয়াতে তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না। বর্তমান ঐতিহাসিক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে নতুনের যে-শক্তির জন্ম হয়েছে, অতীতের শক্তির সঙ্গে সেই নতুনের যে-দ্বন্দ্ব চলেছে—সাহিত্যের মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে নতুন ধরনের মানুষের উদয় হচ্ছে, তাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। শুধু বর্তমান নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না—সেই নতুন ধরনের মানুষের চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলতে হবে তারই অনাগত দিনের অনিন্দ্য রূপ।

বলা বাহুল্য যে, বাংলা প্রগতি-সাহিত্যে যতদূর জানি আজও এই ধরনের নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে হয়তো মনে হবে যে আমাদের দেশে গণ-আন্দোলন সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীনের মতো স্তরে ওঠেনি বলেই নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই কৈফিয়ত যদি কেউ দেন, তা নিতান্ত অকেজো হবে। কেন না গর্কি সে-সময়ে 'মা' লিখেছিলেন বা ঐ-বইতে শ্রমিক আন্দোলনের যে-স্তরের ছবি এঁকেছেন তা হল একেবারে গোড়ার দিকের কথা। তবু পাভেলের মতো অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সাহিত্যিকেরা ছোট গল্পে গণ-আন্দোলনের ছোটখাটো ঘটনার মাধ্যমে জনগণের বীরত্বের ছবি ফুটিয়েছেন বা ফোটাতে

চেষ্টা করেছেন, নায়কের চরিত্র অঙ্কণের আভাস দিয়েছেন। আর অগ্রসর হতে পারেননি।

জনসাধারণের সন্তান, জনসাধারণের মধ্যে থেকে উঠে তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই সত্যকে সাহিত্যরূপ দেওয়ার খুব প্রয়োজন আছে। সত্যকারের গণ-নেতার চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত কোন একজন অগ্রণী কর্মীর মধ্যে তার পূর্ণ সমাবেশ খুঁজে না-ও পেতে পারি। কিন্তু সেজন্য সৃষ্টির কাজ থেমে থাকলে, ভবিষ্যতের অগ্রদূত হিসাবে প্রগতি-সাহিত্যের দায়িত্ব পূরণ করা হবে না। জনগণের সমবেত শক্তি, চেতনা ও আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে, অনেক অগ্রণী জননেতা বা কর্মীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলি আহরণ করে কিভাবে অপরূপ নায়ক-চরিত্র চিত্রণ সম্ভব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাওয়ার্ড ফাস্টের "ফ্রীডম রোড" নামে বইটি। নিগ্রো নেতা গিডিয়ন জ্যাকসনের যে অনাড়ম্বর অথচ মহান্ ছবি এঁকেছেন হাওয়ার্ড ফাস্ট তা সত্যি প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁদের অলৌকিক কাহিনী নয়—চরিত্রের সহজ সরল গরিমা, প্রশান্ত অথচ বিরাট শক্তিধর। বইয়ের ভূমিকায় ফাস্ট বলেছেন যে, গিডিয়ন জ্যাকসন কোন একজন লোকের চরিত্রের রূপায়ন নয়। নিগ্রো মুক্তি-আন্দোলনের বিস্মৃত ইতি-হাসের বিভিন্ন নেতার চরিত্র থেকে উপাদান নিয়ে কুশলী শিল্পী জ্যাকসনের ব্যক্তিত্বকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাতে বাস্তবতা বা ঐতিহাসিকতার অপলাপ হয়নি। কারণ জ্যাকসন হলেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের যুগে দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-পাগল নিগ্রো জনগণের সংগ্রাম, চেতনা এবং স্বপ্নের প্রতীক। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে ঐতিহাসিক সত্য তাকে অস্বীকার করবে কে?

নিগ্রো জনগণের সংগ্রামে ফাস্টের অবদান অতুলনীয়। জ্যাকসন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তাদের অতীতের গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন যা নতুন নতুন জ্যাকসনের জন্ম দেবে। আজ নিগ্রো জনতার মধ্য থেকেই পল রোবসনের উদ্ভব হয়েছে। রোবসন জ্যাকসনের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন, তাঁর কণ্ঠে সমগ্র নিগ্রো জনগণের হৃদয়ের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে, সুদূর অতীত, নিকট অতীত ও বর্তমানের গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টির অজস্র উপাদান মিলবে। সংগ্রামী জনগণের যে অখ্যাতনামা অগ্রণী সৈনিকেরা শহীদ হয়েছেন, বুকের রক্তে স্বাধীনতার যাত্রাপথ উর্বর করেছেন তাঁদের অবদান প্রতীক্ষা করে আছে সাহিত্যের পাতায় মৃত্যুহীন রূপ পাওয়ার জন্য।

৮.

কাজ নেই

সমরেশ বসু

মেঘলা ভাঙা রোদ আকাশে।

ছাড়া ছাড়া উড়ন্ত কালো মেঘ, ধারে ধারে তার ঝিকি-মিকি করে রোদ। মেঘবতী গলায় পরেছে ঝকমকে রূপোর হাঁসুলী। তার ছটা চোখে বেঁধে। রূপো আবার কখনো শ্যামল অঙ্গে সোনার ধারে ঝলমল করে।

রোদের পিছনে পাল্লা দিয়ে ছায়া দৌড়য় পূব থেকে পশ্চিমে। উত্তরদক্ষিণে লম্বালম্বি রেললাইনের উঁচু জমি, মাথায় তার সচল আকাশ। মেঘে নেই জল, রোদে আছে শুধু পোড়ানি। পূবের নাবিতে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানখেত যেন লক্ষ্মী-ছাড়ি। পোড়া পোড়া পাঁশুটে মরকুটে ধানের ছড়া, সরু সরু গুছি, লম্বায় হাত দেড়েকও নয়। পশ্চিমে শুকনো নয়ানজুলি হাঁ করে রয়েছে। আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত ঘেসো জমি আর জলা। ঘেসো জমিতে ঘাস নেই। তবু পশ্চিমা রাখালটা ওইখানেই সমস্ত গোরু চরাতে নিয়ে আসে। বাদবাকি সমস্ত জমিই কোন-না-কোন কোম্পানির করায়ত্ত। গোরুগুলো ঘাস পায় না, খালি মাঠ চষে বেড়ায়।

সামনেই যে-গ্রামটা দেখা যায় পশ্চিমে, গোরুগুলো সেখানকার গৃহস্থদের। লোকে বলে গ্রাম, কিন্তু গ্রাম নয় ওটা। আবার পুরোপুরি শহরও নয়। গ্রামটার আরও পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ধারে ভিড় করে আছে কলকারখানা। এটা একটা আধ-খ্যাঁচড়া জায়গা।

দুপুরটাকে দুপুর বলে বোঝবার জো নেই মেঘের জন্য। এমন সময় রেললাইনের উপরে পূবে ওই কিম্ভূতকিমাকার কালো মেঘটার আড়াল থেকে একটা চিতাবাঘের মতো মুখ উঁকি মারল। তার লোলুপ দৃষ্টি এপারের মাঠের গোরুগুলোর দিকে। একটু একটু করে সন্তর্পণে সে-মুখ পুরোটা বেরিয়ে এল যেন মেঘের আড়াল ছেড়ে।

বসন্তের কতগুলো বড় বড় ক্ষতের দাগ সেই মুখে। চোয়াল দুটো ছুঁচলো পাথরের মতো। নাকের মাঝখানটা বসা, সামনেটা তোলা। মাকুন্দ বলতে যা বোঝায় তেমনি তার মুখে গোঁফদাড়ির বদলে কয়েকগাছা পাতলা চুল। তার ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত হলদে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, চিতাবাঘটা বুঝি এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে এপারের গোরুগুলোর উপর। কিন্তু মানুষটা অর্থাৎ ওই আধ-খ্যাঁচড়া জায়গার দুলেপাড়ার ফটিকচাঁদ নিঃশব্দে হেসে উঠল দাঁত বের করে। হাসল পশ্চিমা রাখালটাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমোতে দেখে।

তারপর যেন জাদু করছে এমনি করে ফটিক একটা অদ্ভুত শব্দ বের করে তার গলা দিয়েঃ অ .অ...গ্গ...গ্গ...

অমনি কয়েকটা গোরু উৎসুক চোখে তাকায় তার দিকে।

সুযোগ বুঝে ফটিক পায়ের কাছ থেকে তুলে নেয় বিচুলির আঁটিটা। আঁটি সামনে বাড়িয়ে দোলায় আর মিহিমোটা গলায় অদ্ভুত শব্দ করে।

সারা তেপান্তর জনহীন। দূরের কারখানা থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে সোঁ সোঁ করে। টেলিগ্রাফের তারে কলর-বলর করছে কয়েকটা ল্যাজঝোলা পাখি।

লাইনের সামনের কয়েকটা গোরু আতুর চোখে ঘাড় তুলে তাকায় ওই সোনারঙ্ বিচুলির আঁটিটার দিকে। বার কয়েক ফোঁস ফোঁস করে নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন একমুহূর্ত গন্ধ শোঁকে খাবারের। পরমুহূর্তেই লেজ তুলে ছোটে বিচুলির আঁটি লক্ষ্য করে।

ফটিকের নজর রাখালের দিকে। সে টের পেলেই সব ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সে-রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না।

গোরুগুলো কাছে আসতেই বিচুলির আঁটি ফেলে দিয়ে কোমর থেকে পাটের দড়িটা খুলে ফটিক গোটা তিনেক গোরুকে লহমায় বেঁধে ফেলল। বিচুলিতে গোরু মুখ দেওয়ার আগেই সে আঁটিটা বগলদাবা করে বলল, "ভাঁড়া বাপু, আবার কোথাও টোপ ফেলতে হবে তো।" বলে গোরু তিনটেকে নিয়ে মুহূর্তে সে পুবের নাবিতে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এপারের মাঠ থেকে একটা বক্‌না ডেকে উঠল—হাম্বা! রাখাল ঘুমচোখেই বলে উঠল, হু—হু। তারপর মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে ঠোঁট উলটে থুক্ করে ফেলে দিল খৈনির ছিবড়ে। দেখল একবার এদিক-ওদিক। দেখে আবার নিশ্চিন্তে মুখ ঢাকল।

ফটিকচাঁদ ততক্ষণে নবগাঁয়ের সড়কে। সে কেবলি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর বেঁকে-বসা পোয়াতি গাইটার লেজ মলছে। বাকি দুটোর বিশেষ আপত্তি দেখা যাচ্ছে না। তাদের নজর ফটিকের বগলের দিকে। পেট বড় দায়। সে দুটোকে ফটিক বলছে, "র, র, একেবারে লক্ষ্মী কুন্ডুর ঘরে গে' খাবি।"

বাজার-ফেরতা এক তরকারী-চাষী ফিক্ করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কার সব্বোনাশ করলে গো?"

এ বিষয়ে ফটিকচাঁদ চেনা যোগী। তবু হেসে বলল, "হি হি, সব্বোনাশ আব কি লাইনে উঠেছ্যালো তাই ধরে নে' এলুম। আইনের ব্যাপার কি না, হুঁ হুঁ. "

হাসল তরকারী-চাষীও। রেললাইনে, রাজপথে, পরের বাড়ি বা বাগানে পোষা গোরু গেলেই বে-আইনী।

ফটিক গোরু তিনটেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে তুলল নবগাঁয়ের খোঁয়াড়ে। এখন লক্ষ্মী কুন্ডুর খোঁয়াড়। ইউনিয়ন বোর্ডের তিনটে খোঁয়াড়ের ডাক সে নিয়েছে।

খোঁয়াড়ের পাশের ছোট ঘরটাকে সবাই বলে আপিস। সেখান থেকে খালি-গা,

নাদুসনুদুস, গৌরবর্ণ লক্ষ্মী কুন্ডু চাবির গোছাটা নিয়ে বেরিয়ে এল। গলায় এ'টে-বসা তুলসীর মালাটা একবার ঘুরিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। চাবি দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজা খুলতে খুলতে বিষন্ন ঠোঁট দুটো উলটে বলল, "এতক্ষণে মাত্তর তিনটে?"

"নাঃ, তোমার জন্যে সবাই পথে-ঘাটে গোরু ছেড়ে রেখে দিয়েছে।" বলতে বলতে ফটিক গোরু তিনটেকে খোঁয়াড়ে পুরে বাঁধন খুলে দিল।

নবাগতা গোরু তিনটে বাদে আর একটা ছাগী ছিল। সে একবার হুঁ হুঁ হুঁ করে ডেকে উঠল সরু গলায়। বোধহয় তার একাকিত্বের অবসানে।

ফটিকের গরম কথাতেই লক্ষ্মী কুন্ডুর গাল ভরে ওঠে হাসিতে। তালা বন্ধ করতে করতে বলে, "তোর মতো কাজের লোকের যে কেন কাজ জোটে না, আমি তা-ই ভাবি।"

"তাহলে তোমার এ-কাজ কে করত, সেটাও ভাব", প্রায় কুন্ডুর মতোই হাসতে গিয়ে বিকৃত মুখে বলে ফটিক। "এখন প'সা ছ আনা ছাড় দিকি চট্ করে।"

গোরু-পিছু তার দু আনা পাওনা। কুন্ডু পাবে গোরুর মালিকের কাছ থেকে বারো আনা। আবার একদিন ছেড়ে দুদিন হলেই কুন্ডুর পাওনা ডবল হয়ে যাবে। আইনত অবশ্য একটা খরচ আছে কুন্ডুর, ওই পশুগুলোকে খাওয়ানো। কিন্তু কথায় বলে, সে-কথা জানে মা ভগা, আর জানে পশুগুলো। সেদিক থেকে বরং ফটিক, কুন্ডুর সঙ্গে হাতাহাতি করে হলেও খোঁয়াড়ের প্রাণীগুলোকে কিছু দেয়। বলে, "কুন্ডুবাবু পুণ্যি করে করে তো সগ্গের সিঁড়ি সব ভেঙ্গে ফেলে দিলে, নরকের দরজায় এট্টুসখানি ধুধু ফেলে তো যাও।"

কুন্ডু চিপটেন বোঝে, কিন্তু সেটা বুঝতে দেয় না। বলে, "তা যা বলেছিস। রাধাকৃষ্ণ বল।"

এখন ফটিকের কাছ থেকে পয়সার দাবি আসতেই কুন্ডুর ফোলা গালের হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "এ-ব্যাপসা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর পোষাচ্ছে না।"

"আমারও না", ফটিক বলে আরও গম্ভীর হয়ে। "দু আনা রেটে আর চলে না।"

অমনি কুন্ডু খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। বোধহয় অস্বস্তিতে। বলে, "কী যে বলিস। তা পয়সা এখুনি নিয়ে যাবি? আর একটা চক্কর দিবি নে?"

"টাইম নেই।"

কুন্ডু আর একটি কথাও না বলে গদীতে গিয়ে খতেন খুলে বসে। পিটপিটে চোখে হিসেব দেখতে দেখতে বলে, "সুদে সুদে কিন্তু তোর দেনাটা অনেক জমে যাচ্ছে ফট্‌কে।"

"তা সে-কথা এখন কেন?" ফটিকের চোয়াল-উঁচোনো মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

"বলে রাখলুম।" বলে কুন্ডু ছ আনা পয়সা বাক্স থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ফটিকের দিকে।

পয়সাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ফটিক প্রায় একদমে বলে ফেলল, "পরশুকের তিন আনা; তার আগে পাঁচটা গোরু, দুটো মোষ, চারটে ছাগল, জগাইয়ের এঁড়ে দুটো.. এগুলোর দরুন পাওনা রয়েছে আমার। তা ছাড়া..."

কুন্ডু হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠল। "তুই তো লেখাপড়া জানলে দিগ্‌গজ হতে পারতিস্ রে ব্যাটা।"

সে-কথার জবাব না দিয়ে ফটিক বলল, "তা ছাড়া খুচরো আছে বারো আনা।"

কুন্ডু চোখের মণি কোণে তুলে গাল ফুলিয়ে বলল, "বাঃ। সেদিনে যে তাড়িবালাকে দিলুম সাত আনা, ক দিন গাঁজা নিলি ক পুরিয়া...?"

ফটিক একেবারে জল হয়ে গিয়ে চোখ বুজে হেসে উঠল, "তাই ব—লো! মাইরি. ও-শালার নেশাই আমাকে শেষ করেছে।" পরমুহূর্তেই চোখ ছোট করে হাসি টিপে আবার বলল, "তবু যে তিন আনা বাকি থাকে মশাই।"

শুনে কুন্ডু খ্যালখ্যাল করে এমন হেসে উঠল যে মনে হল তার গলার শির ফুলে না আবার তুলসীমালা ছরকুটে যায়। "কেস্ট কেস্ট বল, বলিহারি তোর হিসেব। তোকে ঠকাবে যে সে এখনো জন্মায়নি।"

"বোঝ সেটা", বলতেই মনের মধ্যে কিসের ছটফটানিতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাকুলতা ফুটল তার হলদে চোখে. উঁচোনো চোয়ালের কোণে দেখা দিল বিচিত্র ব্যথার হাসি। বলল, "তিন আনা পয়সা দেও বাবু, আর দেরি করতে পারিনে। ঘরে আমার মেয়ে মরছে খিদেয়।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু আর একটা চক্কর দিস ফট্‌কে, নইলে মারা পড়ব।" বলে কুন্ডু চারটে আনি নিয়ে একটা করে ফটিকের হাতে তিনটে দিয়ে পরে বলল, "আর এক আনা দিলুম তোর মেয়ের জলপানি।"

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল। কুন্ডুর চোখে ভয়. মুখে হাসির একটা অদ্ভুত ভাব; আর ফটিকের হলদে চোখ জ্বলে উঠল ধ্বক্ ধ্বক্ করে। সে-ভাবও এক মুহূর্ত।

আনিটা কুন্ডুর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক বলল, "আমার মেয়ে তোমার দেয়া সোনাও পায়ে মাড়াবে না। অমন প'সা আবার যদি কোনদিন দ্যাও—"

বাকিটা কুন্ডু বুঝে নিল ফটিকের সর্বনেশে মুখটার দিকে তাকিয়ে। তবু হাঁফ ছেড়ে কুন্ডু হাসল আর আনিটা রেখে দিল একটা কৌটোতে। এমনি ফিরিয়ে দেওয়া সব পয়সাই কুন্ডু ওই কৌটোতে রেখে দেয়। উৎসর্গীকৃত বস্তু তো আর

বাক্সে রাখা যায় না। শুধু মনের মধ্যে একটা গোপন হাসির ধার চকচকিয়ে ওঠে তার।

ফটিক ততক্ষণে কুন্ডুর বিচুলির গাদা থেকে তিনটে আঁটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দিল খোঁয়াড়ের মধ্যে।

কুন্ডু হা-হা করে ছুটে এল। কে কার কথা শোনে। ফটিক ততক্ষণে আবার কুন্ডুর কাঁপাল কাঁঠাল গাছে উঠে মট করে ভেঙে ফেলল একটা পাতাভরা বড়সড় ডাল, তারপর ছুঁড়ে দিল ছাগীটার দিকে।

কুন্ডু তো খেপে মরে। খেঁকিয়ে উঠল, "শালা দিচ্ছিস, এর দাম দেবে কে?"

ফটিক হাসে হি হি করে, "ওরা আইনের মারপ্যাঁচে তোমার খোঁয়াড়ে আসে. তা বলে আইন তো আমাব পরেও আছে গো", বলে সে সোজা ঘরের পথ ধরে।

ফোলা গালে একটু থমকে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কুন্ডু, "আর একটা পাক কিন্তু দি—স।"

ফটিকের কোন জবাব শোনা গেল না। কুন্ডু তখন মনে হিসেব করছে, তিন আঁটি বিচুলি দু-আনা আর কাঁটালপাতা আট আনা একুনে চোদ্দ আনা। ঐ হয়েদরে এক টাকা। ঘরে গিয়ে খতেন খুলে ফটিকের ধারের পাতায় এক জায়গায় লিখে রাখল—দফায় এক টাকা।

ফটিক এসে পড়েছে প্রায় রেললাইনের উপরে। পশ্চিম দিকে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা, এদিকটা ইউনিয়ন বোর্ডের। ফটিকের কারবার সর্বত্রই।

লাইন পেরিয়ে সে দেখল পশ্চিমা রাখাল বহালতবিয়তে গান ধরেছে। মনে মনে হেসে ভাবল, ব্যাটা এখনো টের পায়নি। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল, ঝোপের পাশে একটা গাই একলা ঘাস খাচ্ছে। অমনি থেমে পড়ল সে। মুহূর্তে তার চোখে ফুটে উঠল মতলব হাসিলের চিহ্ন। কিন্তু চকিতে মনে পড়ে মেয়েটার কথা। আপন মনে মাথা ঝেঁকে আবার সে বাড়ির পথ ধরে। বলে, "যা বেটি, ছেড়ে দিলুম।"

এটা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই পথে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে আন্‌কা গোরু-ছাগল দেখলেই থেমে যাওয়া। অমনি তার চোখে-মুখে ফোটে ধূর্তের সতর্কতা। ফস্ করে কোমর থেকে দড়ি নিয়ে বেঁধেই-পথ ধরে খোঁয়াড়ের। এজন্য অনেকবার তাড়া খেতে হয়েছে তাকে লোকের। গালাগাল-খিস্তির তো কথাই নেই। ঘুম থেকে উঠে তার মুখ দেখলে লোকে প্রমাদ গনে। ছোটখাট বিপত্তি ঘটলে বলে, "এঃ, ফটকে শালার মুখ দেখেছি আজ।" তা ছাড়া লাঠি তো উঁচিয়েই আছে তার মাথার উপর। কেবল হাতেনাতে ধরা যাচ্ছে না বলেই ছাড় পেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফটিক পথের পরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়ায় মনের ভাবে। নিজের উপর ধিক্কার আসে তার, ঘেন্না হয়। মনে মনে বলে, এ শালার জীবন তো আর সইতে পারিনে। বলে আর হাতের মুঠোয় ঘেমে-ওঠা পয়সাগুলো কচলায়।

তার দিকে চোখ পড়তেই পশ্চিমা রাখাল ভাবে, গোরুচোট্টাটা দাঁড়াল কেন? সে অমনি সতর্ক হয়।

কিন্তু ফটিকের মনে জ্বলুনিটা এতই তীব্র যে, তাকে একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' করে দেয়। ছিল চটকলের মিস্তিরি, বাড়তি সংখ্যার গুণতিতে বেরিয়ে এল ছাঁটাই হয়ে। তা-ও আজ সাত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এ-সংসারে কাজ নেই কোথাও কাজের মানুষের জন্যে। উপরন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট। ফটিক মিস্তিরি কি না আজ গোরু-ভেড়া-ছাগল দেয় খোঁয়াড়ে।..

মনের জ্বালা থেকে নিস্কৃতির জনাই যেন সে হঠাৎ মোড় ফিরে ছুটতে আরম্ভ করে তাড়িখানার দিকে। অমনি কে যেন ডেকে ওঠে পিছন থেকে, 'বাবা গো'। চকিতে সে আবার ফেরে। মনই তাব মেয়ে হয়ে ডাক দিয়েছে। ইস্! ছুঁড়ি যে খিদেয় মরছে এতক্ষণে। মাঠের পথ ছেড়ে দিয়ে জলার কাদা মাড়িয়ে আবার ঘরের পথে ছোটে। কথায় বলে, যেন একটা লম্বা গেছো ভূতের মতো।

সতর্ক রাখাল গোঁফ মুচড়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে, ব্যাটার সাহসে কুলল না।

মাঠ পেরিয়ে পাড়ার ঢোকবার ঝোপঝাড়ে ছাওয়া বাঁকের মুখে পড়তেই ফটিকের কানে এল মিহি মিষ্টি গলার ডাক, "আমার বাবা না কি গো!"

থমকে দাঁড়াল ফটিক। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বুলা, মুখভরা নীরব হাসি নিয়ে।

বুলো অন্ধ। ভ্রূর তলায় মস্ত বড় বড় দুটো চোখের গর্ত। টানা চোখের পাতা, কিন্তু সেই পাতার তলে চোখ নেই, গভীর অন্ধকার। মাজা রং, বসন্তের দাগ তার ও-মুখে। বোঁচা নাক। রূপসী না হলেও অন্ধ বুলার এক অপূর্ব শ্রী ফুটে রয়েছে তার শাদা ঝকঝকে অনুক্ষণ হাসি ও কালো টানা ভ্রূতে। তা ছাড়া, পাড়ার কথায় বলি, কানি বুলাব শরীলে যে লেগেছে বয়সের ধার। লেগেছে প্রথম যৌবনের মায়া।

সে এমনভাবে ফটিকের সামনে এসে দাঁড়াল যে, কে বলবে এ মেয়ে অন্ধ।

হুতোশে ফটিক চোখ বড় করে বলে, "ঘর থেকে কী করে এলি এত পথ?"

বুলো হাসে, "পথ যে আমার চেনা গো বাবা!"

"কী করে তুই বুইলি যে, তোর বাপ আসছে?"

বুলো বলে স্বাভাবিক মিষ্টি গলায়, "কী করে আবার, যেমন করে সবাই বোঝে", বলে সে চোখেব পাতা খোলে। পাতার তলায় ঝাপ্সা অন্ধকাবে হাসির মতো কী

যে কাঁপে তির তির করে। বলে, "আমি ঠিক বুঝি। তুমি ছুটে এয়েছ, পায়ে তোমার কাদা।"

পায়ে কাদা?" অবাক ফটিক নিজের কাদাভরা পায়ের দিকে দেখে, বুলার চোখের অন্ধ কোলের দিকে তাকায়। বলে, "কী করে বুইলি?"

"পাঁকের বাস লাগছে যে নাকে?" বাপের হাত ধরে বলে, "চল, ঘরে যাই।"

ফটিকের ছ্যাঁচড়া জীবনের হট্টগোলের মধ্যে তাকে যেমন ঠিক চেনা যায় না, তেমনি তার এ-মেয়েটির কাছে এলে সেও ভুলে যায় বাইরের কথা।

বাগানের গাছগাছালির ছায়ায় যেতে যেতে বুলাকে একটু কাছে টেনে বলে, "হ্যাঁ রে, পেটের জ্বালায় বুঝিন ছুট্টে এয়েছিলি, বাপ আসে কি না দেখতে?"

ভ্রু টেনে বুলা বলে, "না। তোমার দেরি দেখে মনটা ঘরে রইলনি, তাই।"

এমনি কথা বুলার। নিজের খিদে বল, শখ বল, বল দুঃখ-জ্বালার কথা, তার 'হ্যাঁ' নেই।—কেবলি 'না'। কিন্তু ফটিক বুঝি কিছু বোঝে না? তার বুকটা মুচড়ে ওঠে, স্বর বন্ধ হয়ে আসে গলার। এমন করে মেয়েটা সব লুকোয়। যেন সব দেখতে পেয়েও ওর চোখ দুটো অন্ধ করে রাখার মতো। বুঝি ফটিকেরই দায়িত্ব নিয়েছে এ-কানা মেয়ে। কানা মেয়ের শুধু বাপের ভাবনা।

এ-সংসারে ফটিকের জন্য আবার ভাবনা! মা-বাপের কথা তো তার মনে পড়ে না। যেটুকু পড়ে, সে তার এক আবাগী পিসি, থাকত ফটিকের বাপের সংসারে। সে মরে যেতে ফটিক এনেছিল বুলার মাকে। বিয়ে দেবার তো কেউ ছিল না, তাই বুলার মাকে ফটিক কেড়ে এনেছিল এক মাতালের কাছ থেকে। বুলা তখন ছ মাসের অন্ধ শিশু। তারপর সেও মরল, রইল বুলা। তখন মনে হত, এটা গেলেই বাঁচি। কিন্তু বুলা তার মনটা আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, এখন পা বাড়াতেই ভাবনা লাগে, কেমন করে ওর প্রাণটুকু ধরে রাখি।

এই ধরে রাখতে গিয়ে ফটিকের যে ছটফটানি, সেই ভাবনাতেই আবার হাড়মাস কালি হচ্ছে বুলার। তার ভাবনা যে অনেক। এই যে চলেছে বাপের সঙ্গে, এর জন্য পাড়ার সবাই কতই না মুখ বাঁকাচ্ছে, ঠোঁট উলটোচ্ছে, মনে মনে টিপে টিপে তাদের গালাগাল দিচ্ছে। কেউই তাদের ভালবাসে না। সে শুধু ফটিকের ব্যবহারের জন্য নয়, তাদের বাপ-বেটির জীবনকে ওরা কুনজরে দেখে। বালাই-ছাড়া জীবনের সবই বুঝি এমনি হয়।

তবু পাড়ায় রোগে-শোকে লোক মরলে বুলা তার বাপকে জোর করে পাঠায়। সকলের বিপদে আছে ফটিক। তখন সবাই বুঝি ভুলেও একবার ভাবে, ড্যাকরাটার মায়াদয়া খানিক আছে। কিন্তু কোন আনন্দের উৎসবের মধ্যে তার ডাক পড়ে না। রাত-দুপুরে চোর এলে ফটিক যায় আগে, পরদিন সকালে ফিসফিস গুলতানি হয়, চোর যে ফটকে হারামজাদা, তা কারুর বুঝতে বাকি নেই।

তা শুনে ফটিক ক্ষেপে ওঠে, লাঠি নিয়ে ছুটে যেতে চায়, খিস্তি করে, গালাগাল দেয়। তাড়াতাড়ি বুলা বাপের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে রাখে। বলে, "বাবা, যেওনিকো। এ শুধু ওদের ঝগড়ার ফিকির। গেলে যে আরো বলবে।"

কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে না যে, এক গোরু চুরিই যে সব বাজি মাত করেছে। এই বাজিমাতের মধ্যে আর এক নিদারুণ জ্বালা আছে বুলার মনে, কুন্ডু-বাবুর জন্যে। শুধু জ্বালা নয়, অন্ধ মেয়ের সে এক দারুণ বেদনাভরা লজ্জা ও অপমান। যে-অপমান রাখবার ঠাঁই নেই, বুকটার মধ্যে শুধু অসহায় অভিশাপের ঝড় বয়ে যায়।

কোন-কোন সময়ে নিজের যৌবনকে সে অভিশাপ দিতে গিয়ে থেমে যায়। অদেখার আড়ালে যে এসেছে তার শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ তুলে, সে যে তার দুটি চোখের মতোই এসেছে তীব্র অনুভূতি নিয়ে। সে যেন না দেখাকে দেখার মতো, না ছোঁয়াকে ছোঁয়ার মতো। তবু কি নেই একটুখানি কাঁটার খচখচানি আছে। সে-কাঁটা তো বিশ্ব-সংসার ছেয়ে আছে মনে মনে বুকে বুকে। সে-কাঁটা এ-জীবনের বেড়াজাল, যে-বেড়াজাল সরাবার জন্য সে, তার বাপ ফটিক, ঐ দুলেপাড়ার সবাই দিনের পর দিন ধরে ভাবে, কাজ করে, বিবাদ করে, এক ফোঁটা আনন্দ পেলে ধরে রাখতে চায় চিরদিনের জন্য।

কুন্ডুকে তো সে ভয় পায় না, ঘেন্না করে। সে কানা হোক, হোক বোবা, তবু মন বল, শরীর বল, সবই তার নিজের। সেখানে বেঁকে যাবে না কুন্ডুর শয়তানি।

বুলাকে দাওয়ায় বসিয়ে ফটিক বলে, "এটুস বস, বাসুর দোকান থেকে দুটো চাল নিয়ে আসি", বলে ফটিক বেরিয়ে যায়।

বুলা ছাড়া ফটিকের সম্বল এ-ভিটেটুকু। বেঁকে-পড়া একখানি ঘর। তার গায়ে মাথায় নারকেল-খেজুরপাতার অনেক গোঁজামিল দেওয়া। দাওয়ার এক কোণে উনুন। এ-ভিটেও যে কবেই কুন্ডুর খতেনের অঙ্কে ডুবে গেছে, তা ফটিক জানে, তবু মুখে কিছু বলে না।

বুলা বসে বসে হাসে আর আপন মনে গুণগুণ করে। ওই তার স্বভাব।

বেলা যায় মেখে মেখে। হিনচে-কলমীর শাকটুকু নিয়ে ভাত বেড়ে বসে বাপ-বেটিতে একই পাতে। খেতে বসে একজন ভাবে, ছুঁড়িটার দিকে দুটো বেশি ঠেলে দি। আর একজন ভাবে, তার জোয়ান বাপের এই কটা ভাত তো একলারই লাগে. সে আর কি খাবে। রোজই তারা এমনি ভাবে আর খায়। কেউই-কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না।

খাওয়ার পরে ফটিক কোন কোন দিন বেরোয়। বেলার দিকে তাকিয়ে আজ আর বেরুল না। দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বুলা বাপের গায়ে মাথায় হাত

বুলিয়ে দেয়। আপন মনে বলে, পালের গোরু ফিরছে।...তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে, "ঘরের পেছন দে কে যায় গো। নোটন পিসি না কি?"

জবাব আসে, "হ্যাঁ লো কানি।"

কানি! বড় অদ্ভুতভাবে হাসে বুলা।...মনে পড়ে একদিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতে বুলা তাড়াতাড়ি একমুঠো চাল দিতে গিয়েছিল। ভিখিরীটাও ছিল অন্ধ। সে যখন টের পেল বুলা অন্ধ, তখন সে হাত গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বলেছিল, "ধু...র, কানির হাতে ভিক্ষে লোবনি।"

সেটা পাড়ার আজও একটি হাসির গল্প হয়ে আছে। বুলা লজ্জায়, অপমানে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোত্থেকে একটা গোরু এসে তার প্রসারিত হাত থেকে চালগুলো খেয়ে নিয়েছিল। তখন চোখে জল থাকলেও 'ওমা', 'ওমা' করে হেসে সারা হয়েছিল বুলা।

হঠাৎ একটা চিৎকারে বুলার ভাবনা ভেঙে গেল, তন্দ্রা ভেঙে গেল ফটিকের। কী ব্যাপার? কান পাতল ওরা।

চিৎকার করছে চরণ মিস্ত্রির প্রৌঢ়া স্ত্রী। নামহীন গালাগালি ও অভিশাপে ভরে উঠল দুলেপাড়ার আকাশ—"যে আমার পোয়াতি গাই পন্ডে দিয়েছে, সে আঁট-কুড়োর শরীল গলে গলে পড়বে, আর জন্মে সে গোরু হবে...।"

শুধু ফটিক নয়, মুহূর্তে বুলাও বুঝতে পারল এ-গালাগাল কাদের উদ্দেশ্যে। চরণের বউয়ের গালাগালে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার শত্রুর চেহারা। "আঁট-কুড়ো, মেয়েগো, কানি ছুঁড়ি নিয়ে সোহাগ করে। ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে পড়ে। ওকে পোড়াতে কাঠের দাম না জোটে, ও যেন মুখ দে রক্ত উঠে মরে। ভগমান যেন ওর দুচোখ কানা করে। কানি রাড় নিয়ে যেন ওকে ভিক্ষে—"

ফটিক হঠাৎ ফুঁসে লাফিয়ে ওঠে, "হারামজাদীকে আজ—"

"বাবা!" কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে বুলা, "বাবা গো!"

ফিরে দেখে ফটিক, বুলার অন্ধ চোখের গর্ত থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। "ছি ছি, বাবা, তুমি যেওনি কো।"

"ওরা আমায় গালাগাল দিক, তোকে কেন?"

"দিক, আমি যে তোমার মেয়ে।" বলে সে ফটিকের পায়ের কাছে এসে মাটিতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠল। "উপোসে মরব, তবু এমন কাজ তুমি আর কর না বাবা। ওদের শাপে তুমি যদি অন্ধ হও...তাহলে আমায় কে দেখবে?"...

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফটিকের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল গলার শিরগুলো। বসে পড়ে বুলার মাথায় হাত রাখল সে। বলল ফিসফিস করে, "আমি কী করব বল। একটা কাজের জন্য কার কাছে না গেছি, রোজ হাজিরা দিচ্ছি কলে-

কারখানায়। ঘুষ চায় এক-শো টাকা। একটা ঘরামির কাজও পাইনে। কাজ নেই এ-সংসারে, তবে কেমন করে বাঁচি বল্?"

জবাব নেই বুলার। সত্যি কেমন করে বাঁচা যায় এ-সংসারে! ফটিকরা কেমন করে বাঁচবে, এ-সংসারে সে-কথা বলে দেওয়ার কি কেউ নেই? লোকে পরামর্শ দিয়েছে বুলাকে নিয়ে ভিক্ষে করে খেতে। তার চেয়ে ফটিক ঠ্যাঙাড়েবৃত্তি করে খাবে, তবু ভিক্ষে করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে চরণের বউয়ের সঙ্গে সারা দুলেপাড়া গলা মিলিয়েছে। সে এক অদ্ভুত হট্টগোল।

বেলা যায়, সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ফটিকের ঘরে। কিন্তু ওরা বাপবেটিতে বুঝি বাঁচার ভাবনাতেই অন্ধকারে বসে থাকে মুখ গুঁজে। অস্থির চিন্তায় আড়ষ্ট, জীবনমরণের সংশয়ে যেন ভীত বিহ্বল দুটো পাতালগর্তের অভিশপ্ত জীব।

হঠাৎ ফটিক বলে ওঠে, "না খেয়ে মরলে তো কোন শালা দুটো কথা বলতেও আসে না,তবে কিসের খাতির ওদের?"

অন্ধকারের দিকে মুখ তুলল বুলা। বুঝি জল লেগেই তার চোখের গর্ত দুটো চকচক করে। বলে, "বাবা, কে কাকে দেখবে? অভাব যে বড় শত্তুর। ওদের যে-টুকু আছে, সে-টুকুই পুতুপুতু করে ধরে রাখতে পারে না। আমাদের মতো ওরাও কোনরকমে বেঁচে থাকতে চাপছে।"

গর্তে-ঢোকা হলদে চোখ দুটোতে ফটিকের ব্যথিত স্নেহ ঝরে পড়ে। বলে, "চোখ দুটো নেই, তবু এত কি করে বুঝিস তুই বুলি?"

"চোখ দুটো আমার নেই বলেই।" বলে সে হাসে তেমনি করে। যেন কতদূরে থেকে তার গলা ভেসে আসে, "বাবা, আমার চোখ দুটো নেই, তাই মনটা সব্বোক্ষণ যেন হাঁ করে থাকে দেখবার জন্যে। সব বোঝা আমার ঐখেনে। ভাবি, যাদের চোখ মন দুই-ই আছে, তাদের বুঝিন কোনটাই পুরো নয়; আমার যে একটাই সব", বলতে বলতে তার চক্ষুহীন গর্ত থেকে আবার জল পড়ে, "তবু ভাবি, চোখ দুটো থাকলে চটকল বা চালকলে কোন কাজকর্ম করতে পারতুম।"

ফটিক বোঝে, এ হল বুলার বাপের গঞ্জনা, অপমানের ব্যথা। সে চোয়াল উঁচিয়ে ছুঁচলো মুখে ঢোক গিলতে থাকে আর মনে মনে বলে, "তোকে যন্তন্না দিতে আর যাব না পোড়ু ধরতে, যাব না।" .

হঠাৎ পরিষ্কার গলায় বলে বুলা, "বাবা, চাঁদ উঠেছে বুঝিন?"

ফটিক চমকে উঠে দেখে, তাই তো, কখন তার দাওয়া পেরিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অন্ধকার কাঁচা মেঝেয়। আলোভরা উঠোনে যেন কালো রঙে লেপে আছে পিপুলের ছায়া। মনে হয় যেন দু চোখ মেলে নির্বাক জ্যোৎস্না ঘরে এসে তাদের বাপবেটির কথা শুনছে। ফটিক বলে, "কী করে বুইলি?"

বুলা বলে, "দ্যাখ না, সারাদিনের পর হাওয়া দিচ্ছে, কাগ্ ডেকে উঠছে. লক্ষ্মীপ্যাঁচা ডাকছে। তা ছাড়া কাল যে একাদশী গেছে। ..চল বাবা, বাইরে যাই।"

"চল্।" বুলাকে নিয়ে ফটিক বাইরে এসে বসে।

শরতের রাতে কালো আকাশ। তারা দেখা যায় না। আকাশে তিন পো চাঁদ। শরতের এই আলো-আঁধারির কুলেহিতে মনে হয় যেন কোন এক নির্বাক অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই মুহূর্তটিতে তারা ভুলে যায় তাদের দৈন্য ও উৎপীড়নের কথা। বুলা বক্ বক্ করে আপন মনে। ফটিকের মনে পড়ে যায় বুলার মাকে। তারপরে চকিতে মনে আসে চরণের বউয়ের গালাগাল, "ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে।" ..হঠাৎ সে বলে, "বুলা, তোর বে' বসতে মন চায় না?"

এক মুহূর্ত থমকে বুলা খিল খিল করে হেসে ওঠে। অন্ধ মেয়ের সে হাসিতে সারা দুলেপাড়ায় যেন বিচিত্র স্বপ্ন নেমে আসে। সামনে বাপ হলেও শরীরের কাপড় গুছোয় সে। দশজনের চোখের মধ্যে যে সে নিজেকে দেখেছে। পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে বিস্মিত মুগ্ধ মুখে চোখের পাতা মেলে ধরে আকাশের দিকে। যেন কান পেতে শুনছে কার পদধ্বনি। তারপর আস্তে যেন আপন মনেই বলে, "হ্যাঁ বাবা, মন চায়।" বলে ফেলেই মাটিতে মুখ লুকোয় দুরন্ত লজ্জায়। ফটিক হো-হো করে হেসে ওঠে হেঁড়ে গলায় আর তার চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

এমন সময় একটা ছায়া পড়ে উঠোনে। চোখের জল মুছে ফটিক বলে, "কে গো?"

"এই আমি।" যেন খানিকটা ভয়ে ভয়েই বলে কুণ্ডু একটু হেসে হেসে।

"কুণ্ডুবাবু?" ফটিক বলে, "কী মনে করে?"

"কী মনে করে? আর কিছু না" বলে কুণ্ডু এক পা এক পা করে এগোয়—"এই এলাম একটু তোকে দেখতে।" কুণ্ডুর গলায় কথা আটকে যায়। ফটিক মনে মনে দাঁত পেষে আর বুলা মনে মনে বলে, নচ্ছার এসেছে ওর মরণ দেখতে।

ফটিক বলে, "তা এসেই যখন পড়েছ তখন বস।"

কথার হুলটুকু খেয়েও কুণ্ডু বলে, "না, এসেছিলাম তোকে বলতে যে, আর একটা পাক্ তো দিলিনে।"

বুলা কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ফটিক বলল, "শ'খানিক টাকা দেবে কুণ্ডুবাবু, ঘুষ দিয়ে একটা চাকরি পাই তবে।"

এবার কুণ্ডু হাসে একটু পরিষ্কার গলায়, "তোর চাকরি হলে আমার কাজ করবে কে?"

বুলো এবার তীক্ষ্ম গলায় বলে ওঠে, "তোমার অমন কাজের মুখে ছাই। কাজ না ছ্যাচড়ামো? ভ্যালা ধম্মের খোঁয়াড় খুলেছে।"

কুন্ডুর রঙ যেন আর একটু চড়ে। বলে, "পয়সার কাছে আবার ছ্যাঁচড়ামো কি! মা লক্ষ্মী যেমন দেবে। এই দ্যাখ না, ফটকেকে তোর জন্যে কতদিন জলপানির পয়সা দি, আনে না। আনলে তো একটা বেলা..."

কথার মাঝেই ধীর গলায় ফটিক বলে ওঠে, "রামদাটা কোথায় রে বুলা?"

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হেসে জবাব দেয় বুলা, "ঘরে আছে। নিয়ে আসব?" হাসলে অদ্ভুত তীক্ষ্মতা ফোটে বুলার গলায়।

কুন্ডু তাড়াতাড়ি বলে, "আচ্ছা, তাহলে আসি ফটিকচাঁদ। কালকে যাস্।" বলেই সে চকিতে পিপুলের ঘন অন্ধকারে মিশে যায়।

অমনি তারা বাপবেটিতে এক সঙ্গে গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। তাদের ছন্নছাড়া জীবনের এ দরাজ হাসি শুনে সারা দুলেপাড়া যেন চমকে ওঠে। যেমন হঠাৎ হাসি, তেমনি হঠাৎই তা থেমে যায়। এ-হাসি যে তাদের অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকারকে উড়িয়ে নিতে পারবে না।

না, পারে না। অন্ধকার যেন আরো জমাট হয়ে আসে। কতবার ফটিক মনে মনে ভেবেছে গোরু ধরতে আর যাবে না। কিন্তু কোথায় ভেসে গেছে সেই প্রতিজ্ঞা। কারখানায় ঘুষ ছাড়া কাজ হবে না। ঘুষের টাকাও দেবে না কুন্ডু। সারা গাঁয়ের সমস্ত এঁদো পুকুরের কলমী-হিন্চে ভেঁড়েমুসে বিক্রি করেছে ফটিক। তা-ও আর নেই।

মাঠে মাঠে পথে পথে ঘোরে। আকাশে শরতের ঝিমমারা মাথাধরা রোদ। গায়ে কম্প দেয়। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-পড়া মাথাটা দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে পথে পথে ঘোরে। কেবলি যেন কানে আসে, 'বাবা গো!'...মরছে, মরছে কানা মেয়েটা খিদেয়। নাকি বুঝি নিজের পেটের জ্বালাই বারবার মনে করিয়ে দেয় মেয়েটার কথা। বারে বারে ছুটে যায় কুন্ডুর কাছে।

কুন্ডু বলে, "দেনা তো তোর অনেক চড়েছে, নিজে না খাস, সেটা শুধবি তো!"

জ্বরের ঘোরে লাল চোখে একটু তাকিয়ে থেকে আবার ছুটে যায় ফটিক।—না,আজকাল আর গোরুও নেই পথে। পশ্চিমা রাখালটা চাকরির ভয়ে সব সময় সজাগ। সজাগ সকলে। শুধু ধর্মের ষাঁড় ঘোরে পথে পথে। একটা জাদুশিঙেও যদি থাকত! যেন ফুঁকলেই সব গোরুভেড়া ছুটে আসত তার কাছে।...কিন্তু মেয়েটা? মেয়েটা কী খাবে? ভাবে আর নিজের পেটে হাত দিয়ে বসে থাকে।

কুন্ডু বলে, "দেনা তো তোর অনেক চড়েছে, নিজে না খাস, সেটা শুধবি তো!" তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলে, "আরে, লোকের গোয়ালেও কি গোরু নেই?"

অর্থাৎ গোয়াল থেকে চুরি করতে বলছে।

মেয়েটা উদ্বেগে মাঠের ধারে শুকনো মুখে বসে থাকে। কখন শুনবে মাঠের মাঝে সেই পায়ের শব্দ। মনে মনে বলে, বাবা গো, আমি খাবনি, তুমি ফিরে এসো।...তবু হু হু করে কেঁদে ওঠে পেটের ব্যথায়। .....

যদিও ফটিক ঘরে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

দিকে দিকে বাজে শারদোৎসবের বাজনা। পুজো এসে পড়েছে। চারিদিকে কেনাকাটার রব।

বিকালবেলা ফটিক নবগাঁ পেরিয়ে শ্যামপুরের পথে পড়ে। একটা গোরু হা-হা করে ছুটে আসে তার সামনে। ফোঁস ফোঁস করে। দিক ভুলেছে গোরুটা। থমকে দাঁড়ায় ফটিক। দেখে এদিক-ওদিক। তারপরে হঠাৎ কী মনে করে কষে এক ঘা লাগায় গোরুটার পিঠে। বলে, "পালা, পালা হারামজাদী, নইলে মরবি গিয়ে কুণ্ডুর খোঁয়াড়ে।" বলে সে নিজেই পালায়। পালায় যেন সেধে-আসা পয়সা ফেলে।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় একটা চালার কাছে। চালাটা গাঁয়ের প্রান্তে। খেজুর গুড় জ্বাল দেওয়ার উনুন ঘর—আর একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এক পাল গোরু। অদূরেই উঁচু পাড়-ঘেরা একটা নতুন-কাটানো ডোবার জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল। ফটিক উঁকি মেরে দেখল, একটা মনিব চান করছে, বোধহয় ফেরার পথে। চকিতে সে একবার এদিক-ওদিক দেখে অসীম সাহসে ভর করে খুঁটি থেকে খুলে ফেলে গোরুকটাকে। গাইবাছুর মিলিয়ে সাতটাকে এক দড়িতে বেঁধে লহমায় সে নেমে পড়ে পথে। একটা গাছ থেকে ছপটি ভেঙে, সপাং সপাং করে মারতে মারতে, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সে খোঁয়াড়ের পথ ধরে।

কুণ্ডুর খোঁয়াড়ে যখন এল, তখন ঘামে ধুলোয় তাকে আর চেনা যায় না। কিন্তু ফটিক জানে, এ-ঘাম মরে গেলেই কম্প দিয়ে জ্বর এসে পড়বে। তার আগেই সে পয়সা নিয়ে চলে যাবে। তিনদিন ধরে যে নির্জলা উপোস চলেছে।

কুণ্ডু মহা খুশি হয়ে চাবির গোছাটি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এসেই চোখ ছানাবড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে শালা, এ যে আমার গোরু সব গোয়ালশুদ্ধ ধরে এনেছিস। শালা, কোত্থেকে এনেছিস?"

প্রথমটা একটু ভড়কে গেল ফটিকও। কিন্তু চকিতে নিজেকে শক্ত করে ফটিক বলল, "গোয়াল-টোয়াল নয়, রাস্তা থেকে ধরে এনেছি। আইনের ব্যাপার। সে তোমারই হোক, আর যারই হোক। একটা টাকা ফেল, নয় তো বল আমাদের পঞ্চে দে' আসি"

অর্থাৎ মিউনিসিপালিটির আওতায়।

বুধো কুঞ্জু কেমন করে ছেড়ে দেয় নিজের গোরুগুলো অথচ ফটিককেও তার বিলক্ষণ চেনা আছে। তাড়াতাড়ি সে একটা টাকা এনে দিয়ে গোরুগুলোকে নিজের হাতে নেয়।

ফটিক বলে, "রাগ করনি কুণ্ডুবাবু, খেতে তো হবে।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটে চলল ঘরের পথে। না, ঘরের পথে নয়, বাজারের দিকে। মনে মনে বলে, আর, একটু থাক মা, এলুম বলে।

কুণ্ডুও তখনি চাকরের উপর সব ভার দিয়ে চাবির গোছা কোমরে বেঁধে থানার পথ ধরে।

সে যখন দারোগাবাবু আর সেপাইয়ের সঙ্গে বাজারের কাছাকাছি এসেছে, সেই সময়টিতেই ফটিক বেরোয় বাজার থেকে, কোঁচড়ে চাল নিয়ে।

কুণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, "দারোগাবাবু, ওই যে শালা গোরু-চোর।"

বলতে না বলতেই যমদূতের মতো সেপাই একটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটিকের উপর। এ আচমকা আক্রমণে কোঁচড়ের চালগুলো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

দারোগাবাবু বললেন, "যাক্, আর অন্দুর যেতে হল না।"

সেপাই বলল, "চল্ শালা।"

চালগুলোর সঙ্গে যেন ফটিকের প্রাণটাই ছড়িয়ে পড়েছে। দিশেহারা হয়ে সে বলল, "কোথায়?"

কুণ্ডু বলল দাঁতে দাঁত পিষে, "শালা, সরকারের খোঁয়াড়ে।"

হঠাৎ সে বেঁকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, আমার কানা মেয়ে যে একলা রয়েছে।"

কুণ্ডু ফোলা গালে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সেটা যাবে আমার ধম্মের খোঁয়াড়ে।"

এতক্ষণে যেন সব হৃদয়ঙ্গম করে সে ভাঙা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠে, "বু—লা রে...।"

ততক্ষণে তার মুখটা উল্টো মুখে থানার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর বুলা তার নিস্তেজ শরীরটা নিয়ে টুক্ টুক্ করে চলেছে মাঠের পথে। দিনেও যেমন, রাতেও তেমন চলেছে চেনা পথে, বাগানের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে মুখ করে বলে, "চাঁদ উঠেছে বুঝিন?"

সত্যি, চাঁদ উঠেছে আকাশে। বিষণ্ণ জ্যোৎস্না যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে অন্ধ মেয়েটার দিকে। গাছের ভেজা পাতার কাজলের চকচকানি। সেখান থেকে বুকভরা নিশ্বাসের মতো হঠাৎ হাওয়া বয়ে যায় বুলার মাথার উপর দিয়ে।

বুলা থমকে দাঁড়ায় খস্-খস্ আওয়াজে। নিজেই বলে, "দূর—দূর শেয়াল-গুলো।" সত্যি একপাল শেয়াল চলে গেল। কিন্তু বেঁকে-পড়া বুলা। পেটটা

পিঠে ঠেকে যেন দুমড়ে পড়তে চায় মুখ থুবড়ে।

কোথেকে ভাল-সম্বরার মিঠে ঝাঁজের গন্ধ আসে হালকা। গলা ভিজে ফুলে ফুলে ওঠে বুলার নাসারন্ধ্র। তাতে যেন নির্বাক জ্যোৎস্নারই গোঙানি উঠল হঠাৎ ঝিঁঝিঁর ডাকে।

মাঠের ধারে এসে বসে পড়ল বুলা। যেদিক থেকে তার বাবা আসবে, সেদিকে মুখ করে তুলে রাখল চোখের পাতা। চোখের সেই অন্ধ গর্তে যেখানে দলা পাকিয়ে আছে কতকগুলো শিরা-উপশিরা, সেখানটা কাঁপতে থাকে থরথর করে; আর ফিস্ ফিস্ করে বলে, "বাবা গো, খেপলে যে তোমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার বুলা খেতে চায়নে, তুমি ফিরে এস—"

কিন্তু পেটের মধ্যে কারা যেন ব্যথার ধাক্কা দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। শেষটায় অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন সে শুনল থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, তখন সে ভাবল, বাবা তো তার এত দেরি কোনদিন করে না! তবে কি বাবা মাঠের ওপারে তাড়িখানায় পড়ে আছে? তার অন্ধ চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। গলা ফাটিয়ে ডাক দিল, "আমার বাবা গো..."। লাইনের উঁচু জমিতে তা প্রতিধ্বনি করে ফিরে এল।

আর আশ্চর্য, যে চরণের বউ ওদের বাপবেটিকে এত গালাগালি করেছিল, সে নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে বুলার ডাক শুনে আপন মনে বক্ বক্ করে উঠল, "বাপ না, সে হারামজাদা কশাই। নইলে অমন সোমথ কানি মেয়েটাকে কেউ এমনি ফেলে রেখে যায়!" বলে সে চরণকে বলল, "মনটা খারাপ গাইছে, চল তো এট্টুস দেখে আসি।" বলে সে মাঠের পথ ধরল।

আর মাঠের উপর তখন দেখা যায়, অন্ধকারে কুন্ডু এদিকে আসছে দ্রুত-পদে —নিঃশব্দে।

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

আট

সেকালের ইংরেজ-উপনিবেশ সমাজে প্রচলিত বচন ছিল "সিভিলিয়ান্‌স্‌ আর সিভিল ডেভিলস্‌ অ্যান্ড লইয়ার্স্‌ আর লায়ার্স্‌" (সিভিলিয়ানরা সব ভদ্রবেশী শয়তান আর আইনজীবী মাত্রেই মিথ্যাবাদী)। কিন্তু তবু সিভিলিয়ানদের খাতিরের অন্ত ছিল না, কেন না তাঁরাই ছিলেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। দেশী লোক সিভিলিয়ান হলে তাঁরা প্রায় সাহেবজাতের সমকক্ষ গণ্য হতেন আর খাতিরও পেতেন সেই অনুপাতে। কিন্তু তাঁদের কেউ শয়তান মনে করত না; দেশের লোক সত্যিই তাঁদের শ্রদ্ধা করত একেবারে অন্তর থেকে; তার কারণ, সেকালের দেশী সিভিলিয়ান প্রত্যেকেই প্রায় ছিলেন সত্যিকারের শ্রদ্ধেয় লোক।

কর্মজীবনে চারুচন্দ্র দত্ত ছিলেন সেই পুরনো ঐতিহ্যের অধিকারী। সিভিলিয়ানগিরি করেছিলেন তিনি পুরো সিভিলিয়ানী রীতিতেই, কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে; সামান্য মানুষ যারা তাদের সামান্য মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ শুষে নেয় চাকরি। চারুবাবু অসামান্য ছিলেন, চাকরিকে ছাড়িয়ে তাঁর ব্যাপক মনুষ্যত্ব অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই চাকরির গোড়ার দিকেই অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তখনকার বিপ্লবীদলে; সরকারি চাকরির ছদ্মবেশে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টার তিনি হলেন যোগসূত্র। এর পর মানিকতলার বাগানবাড়িতে যখন সদল অরবিন্দ ধরা পড়লেন তখন সাক্ষাৎ প্রমাণাভাবে পুলিসের কবল থেকে বাঁচলেও তাঁর চাকরি নিয়ে হল বিষম টানাটানি। বছর কয়েক ঝুলে থাকার পর অতিকষ্টে তিনি আবার সিভিলিয়ানী পদে বাহাল হয়েছিলেন। কিন্তু খুঁটিনাটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর নটখটির অন্ত ছিল না। এই সব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর "পুরানো কথা"য়। বাংলায় এই রকম সার্থক আত্মজীবনী বিরল। পাঠকসমাজে পরিচয়-এর কদর অনেকখানি বাড়িয়েছিল চারু-বাবুর "পুরানো কথা"। এমন স্বচ্ছন্দ, সবল ও সরস চলতি বাংলা চারুবাবুর আগে বা পরে কজনই বা লিখেছেন? "পুরানো কথা"র প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল পরিচয়-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়, আগেই তা বলেছি। মুগ্ধ হয়ে আমরা পড়লাম :

> "উত্তরাধিকারসূত্রে আমি বর্ধমান জেলার লোক।... এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর-পারে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ি। .. পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ির দেউড়ির চালায় লুকান শ'খানেক মরচে-পড়া সড়কীর মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখে-ছিলাম এক সময়ে সেগুলো ব্যবহারে লাগত বলে মনে করলে দোষ

হয় না। আমরা শাক্ত-বংশ বটে কিন্তু সড়কী দিয়ে ত আর পাঁঠা-বলি হয় না।"

পিতৃকুলের সঙ্গে টেক্কা দিত মাতৃকুল।

"আমার মামার বাড়ি রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে ডাকাতে রায়না এই নামে। বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে জমীদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা একথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই, কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সেকালের গ্রাম্য জমীদারের দোষগুণ সবই তাতে ছিল, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ ছিলেন।...দাদামশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমীদারের সঙ্গে দাঙ্গা করা।...এই রকম কোনও শুভ-লগ্নে তাঁর কুকরী দেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব কিন্তু তাতে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য্য অনার্য্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাঙ্গলা দেশ।"

চারুবাবুর বাবা কালিকাদাস দত্ত ডেপুটি চাকরিতে ছিলেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, নবীন সেন প্রভৃতির সহযোগী। কৃতিত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে চাকরি করে তিনি পুরস্কার পেলেন কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ানি। চারুচন্দ্রের জন্ম ঐ রাজ্যেই।

"আর দেশের কথা বলব না। ক্রমশঃ প্যাক্স ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমী নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরীর পথে বাহির হয়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হল না। ...জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন। স্বাধীনতা জিনিষটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভান্ড দুই মধু পানের পর মুনিবে গোলামে কোনও তফাৎ থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন।"

এই 'খেলাঘরে' রাজ্যের তখনকার রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ সম্বন্ধে চারুবাবুর অপরিসীম শ্রদ্ধা যে পরিণত বয়সেও অক্ষুণ্ণ ছিল "পুরানো কথা"য় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"..ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা।"

এই মহারাজ নাকি গর্ব করে বলতেন, "আমি কোচ, আমি অনার্য্য, আমার আর্য বলে গণ্য হবার কোন সাধই নাই।" এই কথা উল্লেখ করে চারুবাবু লিখছেন :

"ভাই বাঙ্গালী, তুমি আর্য্য নও, তুমি অনার্য্য, তোমাদের দেশে এলে আর্যদের জাত যেত। তুমি কুরুপান্ডবদের বংশধর বলে নিজেকে জাহির করে লোক হাসিও না। তোমার পূর্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, যারা সমুদ্রগর্ভ হতে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার করে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক করেছে। তোমার পূর্বজ গারো, কোচ, মেচ যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী করেছে। তোমার ডিঙ্গা, তোমার ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে যে সব মাল্লারা সাতসমুদ্র পাড়ি

> দিত তারাই তোমার পূর্বপুরুষ, ভীম অর্জুন নয়। "সত্যি বলতে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার কদর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্তি দেখবে। ভয় নেই। পাঁজী পুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চল।"

চারুবাবুর মন ছিল প্রায় পুরোপুরি রোম্যাণ্টিক, কিন্তু উপরের ঐ উদ্ধৃতিতে আভাস পাওয়া যায় তাঁর বলিষ্ঠ বাস্তবতাবোধের। চারুবাবুর কথায় যাঁরা সায় দেবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাঁর এই উক্তি :

> "কেন যে এই গরীব বাঙ্গালা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন-মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার কোন গুণই আমরা দেখতে পাই না, কি বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপী পরে হিন্দী বলতে বলতে, দেশ উদ্ধার করতে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত।"

দেশ উদ্ধারের পালা শেষ হয়েছে, কিন্তু হিন্দির ধুম চলেছে বেড়ে। অবশ্য হিন্দি ভাষা চারুবাবুর জিভে আটকাত না। ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রায় সাত-আটটি ভাষায় তিনি ছিলেন দক্ষ। বোম্বাই প্রদেশে হাকিমির কাজে অনেক সময়ে স্থানীয় উপভাষায় তাঁকে সাক্ষ্য নিতে হত। এ-সব ক্ষেত্রে দোভাষীর সাহায্য নেওয়াই প্রচলিত বিধান। কিন্তু চারুবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই নতুন নতুন উপভাষা আয়ত্ত করে ফেলতেন বলে দোভাষীর উপর কদাচিৎ তাঁকে নির্ভর করতে হত।

চারুবাবু নিজে যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি তাঁর জুটেছিল মেধাবী সতীর্থ। এঁদের মধ্যে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সহপাঠী ছিলেন: ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী। জ্ঞানবাবু ছাড়া এ'রা সকলেই 'সার' উপাধি লাভ করেছিলেন। এ'রা সবাই গত হয়েছেন, কিন্তু দলের তিনটি রত্ন এখনও জীবিত : ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র, ডাক্তার মনীন্দ্রনাথ বসু (বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) ও শ্রীযুক্ত সি. কে. সরকার।

কুচবিহারে বাল্যকাল কাটানোর ফলে চারুবাবু অতি অল্প বয়সেই ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসেন, কেন না ঐ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ের বিয়ের ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছিল এই প্রাচীন কোচ রাজ্যে চারুচন্দ্রের বাবা পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিলেন। পিতার প্রভাব পুত্রের উপর কতটা বর্তেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে :

> "একদিনকার কথা মনে আছে, কলকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিস করে সবাই গান- শুনতে বসেছিলেন, বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, 'এল কৃষ্ণ এল ঐ, বাজায়ে বাঁশরী'। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।"

এই ব্রাহ্ম প্রভাবের পাশাপাশিও খানিকটা প্রতি-প্রভাব হিসাবে ছিল জাতীয় গৌরব। তার জোর ছিল আরও অনেক বেশি।

> "সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিন্‌কি যে একদিন ভীষণ দাবানল হয়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে, তা তখন কে জানত। একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃষ্টানী গির্জের মতন কেন গড়া হল, ভেতরের পুজো-পদ্ধতি বা মোটামুটি খৃষ্টানী চালের কেন করা হল? মহর্ষির "খৃষ্ট বিভীষিকার" কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিষটা ঠিক হজম হত না।"

ব্রাহ্ম সমাজের এত কাছে এসেও চারুবাবু ও সেই সময়কার উচ্চ শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের আরো অনেকে কেন ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি, তার কারণ তখনকার ব্রাহ্মসমাজের এই বিজাতীয়তা। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ এই ত্রুটি অনেকটা শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু মধ্যবিত্তের মন জাতীয় গৌরবের প্রভাবে তখন অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছে নব্য হিন্দুয়ানিতে। জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্ম নেতারা যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তাঁরা টানতে পারেন নি সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের প্রচেষ্টায়। পরাধীন দেশের নানা পরস্পরবিরোধী প্রভাবের সমন্বয় করার মতন মতবাদের জন্ম তখনো হয় নি, ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় হল দিশাহারা।

> "কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ তখন বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল, এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এ'দের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুণ কলকাতার প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের অনেক কাটাকাটি হয়ে যাবার পর যেমন এক পলিতিক দল উঠে আস্তে আস্তে দু'রকমের গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমাদের কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিক দল হিতবাদী কাগজ বের করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন দুই গোঁড়াদলকেই "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচ!" শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আকাশ ছেয়ে ফেললেন। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ দু'ই রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিত-বাদীর দল রইলেন না, কারণ হিতবাদী প্রথম-দুই একজন সম্পাদকের পরই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায় এরকম কেউ আমাদের সময়ে ছিল না। যারা ইংরেজকে শত্রু ভাবত তারাও বিক্টোরিয়াকে মহারাণী বলে মানত।......আমাদেব ছাত্রজীবনে রাজ-নৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নাই।"

খাঁটি বাঙালী ছিলেন চারুবাবু মনে মনে, কিন্তু তখনকার দিনের আরো অনেকের মতন ভিক্টোরীয় ভব্যতার প্রভাবে তিনি আচার ব্যবহারে হয়েছিলেন প্রায়

খাঁটি সাহেবের মতনই। এর পর বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ানের ছাপ পেয়ে ভিক্টোরীয় ভব্যতার প্রভাব আরো পাকা হল। অবশ্য তিনি স্বেচ্ছায় সিভিলিয়ানি বরণ করেন নি—করেছিলেন অভিভাবকবর্গের চাপে। কিশোর চারুচন্দ্রের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রেজিল গিয়ে ব্রেজিলীয় সৈন্যবাহিনীর কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, কেন না তখন ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদলে বাঙালীর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন ছিল অন্যরকম। চারুচন্দ্র সুরেশ বিশ্বাসের নামে চিঠি লিখলেন তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে ও বিলাত রওনা হবার সময় ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য যে-কটি টাকা পেয়েছিলেন তা সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেন ব্রেজিল পাড়ি দেবার পাথেয়-স্বরূপ। কিন্তু অল্পদিন পরে উত্তর এল সুরেশ বিশ্বাস আর ইহজগতে নাই। অভিভাবকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল: চারুবাবু মনোনিবেশ করলেন সিভিলিয়ানী পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে। তারই পাশাপাশি চলল রাজনীতির চর্চা, স্বাধীন দেশের আবহাওয়ার প্রবলতর উৎসাহে।

এই সময়ে নামকরা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। সার ডিনস ওয়াচ্চার সঙ্গে তখন বিলেতে গিয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও গোখলে। বিলেত-প্রবাসী তরুণ ভারতীয় ছাত্রেরা উৎসাহে এঁদের অভ্যর্থনা করল।

> "ওয়াচ্চা ও সুরেনবাবু ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। তাঁরা আমাদের মতন অর্বাচীন বালকের দলকেও অবজ্ঞা হেনস্তা করেন নাই। কিন্তু গোখলে নিজে তখন ছেলেমানুষ, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদিগকে বিদ্রূপবাণে এমনই জর্জরিত করেছিলেন যে, আমরা আর বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁষি নাই। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল তাঁর বাঙ্গালীর উপর, কি বলব, হিংসা না বিদ্বেষ? আমি ভুলি নাই। বহুকাল পরে যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, সব ভারতের ঋণ পরিশোধ করেছিলাম।[৮]

এই ঋণ পরিশোধের বৃত্তান্ত ঠিক জানি না। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, তারই অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে চারুবাবু "কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন" সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি একশ পাতার বই লেখেন। অনুমান হয় গোখলে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই বইটিতে তিনি বলে গিয়েছেন। অনুমান, কেন না বইটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি। সুতরাং, গোখলের উপর চারুবাবুর রাগ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা বলার অধিকার আমার নাই। কিন্তু পাঠকদের প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে লর্ড কার্জন যখন "মনুমেন্টেল লায়ার" (বিপুল মিথ্যাবাদী) বলে বাঙালীদের গালি দিয়েছিলেন তখন ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিল-এ তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন এই গোখলে।

ভিক্টোরীয় ভব্যতা ইংরেজি-শেখা ভারতবাসীর শুধু আচার-ব্যবহারের ব্যাপার ছিল না, একেবারে অন্তরে প্রবেশ করেছিল। ১৮৯৭ সাল ভিক্টোরিয়ার জুবিলী-

উৎসবের বছর। লণ্ডনের ভারতসভার পক্ষ থেকে মহারাণীকে মানপত্র দেবার আয়োজন চলছিল। সিভিল সার্ভিসের উমেদার তরুণ চারুচন্দ্র ও তাঁর লণ্ডন-প্রবাসী বন্ধুরা মিলে তাতে প্রবল আপত্তি জানালেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। দাদাভাই নৌরজি তখন লণ্ডনে ছিলেন, তিনি এই হঠকারী তরুণ-সংঘকে আমলই দিলেন না।

> "এই সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর সত্যি অসন্তুষ্ট হতেন, তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস দলের কর্তা, আর কংগ্রেসের ধর্ম ত ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদিগকে কোন আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন দুটী অর্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না। আমরা মোহিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।"

সুরেন বাঁড়ুজ্যে তো "স্পষ্টই আদেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন আমরা দেশে ফিরে একটা এক্সট্রিমিস্ট (গরম) দল গড়ে তুলি"। সেই সঙ্গে সুরেনবাবু এই কথাও বলেছিলেন প্রকাশ্যে তিনি ওদের গালাগাল দেবেন।

দেশে ফেরার আগেই পরবর্তী ভারতীয় গরম দলের এই তরুণ অগ্রদূতেরা একটা ছোটখাটো গরম দল গড়ে তার নাম দিলেন 'নবভারত সভা'। এই দলের মুরুব্বিদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত আইরিশ সিন ফেন দলের নেতা হাতকাটা দশ বছর জেলখাটা মাইকেল ডেভিট, সোশ্যালিস্টদের নায়ক হাইণ্ডম্যান, মজুর-আন্দোলনের পুরোধা দুর্দান্ত টম ম্যান। ডেভিট প্রস্তাব করলেন যে বছরে আট লাখ টাকা পেলে বিলিতি পার্লামেন্টের আটটা আইরিশ আসনে তাঁরা আটজন ভারতবাসীকে বসাতে রাজি, কেন না আইরিশ দলের অর্থাভাব ছিল দারুণ। এতে আইরিশ নেতা জন রেডমণ্ড পর্যন্ত নাকি সায় দিয়েছিলেন এই শর্তে যে যা-কিছু বিলিতি ব্যাপার তাতে এই আটজন ভারতীয় প্রতিনিধি আইরিশ পার্টির হুকুম মেনে চলবেন, কিন্তু ভারত-সংক্রান্ত সব বিষয়ে তাঁরা হাত তুলবেন ভারতীয়দের পক্ষে। "ও কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, 'ও রকম কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধারসাধন হবে না।' বোধহয় 'অভদ্র' কথাটাও বলেছিলেন। তখন বিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় ঢুকেছে কিনা।"

অন্তরে এই ভব্যতা ও বাইরে সিভিলিয়ানী ভেক ধারণ করে যুবক চারুচন্দ্র দেশে ফিরলেন ১৮৯৯ সালে। "পুরানো কথা" বই হয়ে বেরিয়েছে ঐ পর্যন্ত। এর পরেও "পুরানো কথা" পরিচয়-এ অনেকদিন ছাপা হয়েছিল। শেষ কিস্তি বেরোয় ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে।

সিভিলিয়ান হওয়া ছিল কপালের লিখন, তাই প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বাপের সুপুত্তুর হয়ে চারুবাবু দেশে ফিরে চাকরি শুরু করলেন। তিনি শিথিল প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাই রাজকার্যে শৈথিল্য ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তবু সরকারের সুপুত্তুর যে তিনি হতে পারেন নি, সেকথা আগেই লিখেছি। "পুরানো কথা"র উত্তর-অংশে তাঁর সিভিলিয়ানি ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কাহিনী আছে। পেনসন অর্জনের জন্যে যতখানি দরকার তার একদিন বেশি চাকরি তিনি করেন নি। ১৯২৫ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। এই সময়ে তাঁর ভাই ও তার অল্পদিন পরে একমাত্র কন্যা মারা যান। দারুণ পারিবারিক শোকের ধাক্কায় তিনি কাবু হলেও একেবারে নুয়ে পড়েন নি। ক্রমে এই ধাক্কা সামলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর সাহিত্যজীবন। পরিচয়-এর "পুরানো কথা" ছাড়া তাঁর কয়েকটি সমালোচনা ও দু'একটি গল্প বেরিয়েছিল। তাঁর ছাপা বই বেরিয়েছিল চারটি : 'কুক্করাও', 'মায়া', 'দেবাবু', 'দুনিয়াদারী'। দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ অর্থাৎ ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "কুক্করাও" বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> "বাংলার কথা-সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায় 'বাঙালীর ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ'।
>
> "এমন সময় চারুচন্দ্রের 'কুক্করাও' বইখানা হাতে এল। লেখক মজলিষি মানুষ, তার উপরে দূর-প্রদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরা। যা দেখেছেন তার মধ্যে সমস্ত মন দিয়ে প্রবেশ করেছেন। বোঝা যায় মারাঠায় তিনি ঘরের লোক ছিলেন। এই ঘরের লোক হবার শক্তি সকলের নেই। যাদের আছে তাদের কথা বলবার শক্তি কম। চারুবাবু বিদেশের লোকসমাজে রস পেয়েছেন এবং গল্পে সেই রস দিয়েছেন ঢেলে। তাঁর এই কথাগুলিতে দূর-দেশ ও দূর-কালের স্বাদ চমৎকার মিলে গেছে। একেই বলে খাঁটি গল্প। এই রকম গল্প পথিকদের কাছে শোনা যেতে পারে পথের ধারের আসরে। একে গল্পগুজব বলে না বেটা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়ার লোককে নিয়ে কানাকানি।"

চারুবাবুর পরিচয় এর চেয়ে ভালভাবে আর কে দিতে পারবে?

[ক্রমশ

সিংভুমের অভ্রখনি

অসিত রায়

সারা পৃথিবীর বাজারে আজ যে-পরিমাণ অভ্র প্রতি বছর আমদানি হয়, ভারতবর্ষ একাই তার ৭০ ভাগ উৎপাদন করে। এই ৭০ ভাগের প্রায় সবটাই হল আন্তর্জাতিক অভ্র-বাজারের সবচেয়ে সেরা পণ্য—যার নাম রুবি মাইকা।

সিংভূম ও ছোটনাগপুরের বিজন অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চার লক্ষ অর্ধ-উপবাসী নরনারী ও শিশু ভূগর্ভের অন্ধকারে দৈনিক দশ ঘন্টা পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের সোনার ফসল এই অভ্র।

সারা ভারতে উৎপন্ন অভ্রের ৮০% ভাগ হল বিহারী অভ্র। কিন্তু বিহারে তো নয়ই, সারা ভারতবর্ষেও এই বিপুল সম্পদের প্রায় কিছুই ব্যয় হয় না। সবটাই চলে যায় বিদেশে; কারণ, আমাদের দেশে নাকি অভ্রের চাহিদা নেই।

সত্যিই চাহিদা হবে কেমন করে? দামোদরের বাঁধ আর তার বিরাট জলবিদ্যুৎ-শিল্প আজও স্বপ্ন। ভারি শিল্প গড়ে তোলার পথে দেশের অগ্রগতি একেবারে নেই বললেই চলে। সেজন্য আজও এদেশে অভ্রের বাজার গড়ে উঠল না। তাই এই বিপুল সম্পদ দেশী-বিদেশী মালিক আর ফড়েদের হাত দিয়ে জাহাজ বোঝাই হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে আমেরিকা আর ব্রিটেনের বন্দরের উদ্দেশ্যে। এই সর্বনাশা বাণিজ্যটা এতই গা-সওয়া হয়ে গেছে যে, একটা সীমাবদ্ধ গন্ডীর বাইরে এর আলোচনা একেবারেই হয় না বললেই চলে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা না হলে এই আত্মঘাতী বাণিজ্যের স্বরূপ ধরা পড়বে না।

ভারতের অভ্রখনির ইতিহাস বিচিত্র। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধার আগে পর্যন্ত অভ্রের দিকে মনোযোগ দেবার সময় পাননি ভারত সরকার। তাই সম্পূর্ণ উদাসীনতা অবলম্বন করে অভ্রখনির কাজ চলত। কিন্তু আমাদের দরকার না পড়লেও আমেরিকা ও ব্রিটেনের দরকার পড়ল অভ্রের। কারণ ওদেশে তখন যুদ্ধ-শিল্প গড়ে উঠেছে প্রচন্ড বেগে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন হল অভ্রের।

আধুনিক যুদ্ধশিল্পের গোড়ার কথা হল বিদ্যুৎ। ভারি ভারি ডায়নামো, বৈদ্যুতিক কনডেনসার, ফার্নেস; এবং সেই সঙ্গে শক্তিশালী বিমানবহর, মোটর, হেভি ডিউটি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ, হাই কম্প্রেশন মোটর—এসব নিয়েই আধুনিক যুদ্ধের প্রস্তুতি। কিন্তু এই প্রত্যেকটি যন্ত্রের জন্য অভ্র না হলেই নয়। মেশিনের

চাকা ঘুরছে—তাকে চালু রাখতে লুব্রিক্যান্ট হিসেবে অভ্র দিতে হবে। ইঞ্জিনের বয়লারে অভ্র দরকার। রেডিও সেট, ওয়্যারলেস সেট, সাউন্ড বক্স—অভ্র না হলে অকেজো। এক কথায় অভ্র না পেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি করা রীতিমতো কঠিন।

ওদিকে আবার যুদ্ধ বাধতে না বাধতে জার্মানী কৃত্রিম অভ্র তৈরি করে ফেলল। এই কৃত্রিম অভ্র বা সিনথেটিক মাইকা পাল্লা দিতে লাগল খনির আসল অভ্রের সংগে। সেজন্য বাধ্য হয়ে আমাদের তৎকালীন প্রভুরা অভ্রের দিকে সুনজর দিতে বাধ্য হলেন, আর সংগে সংগে এল ভারতীয় অভ্রশিল্পের ফেঁপে ওঠার পালা।

'৪২ সালের আগস্ট মাসে যখন মহাযুদ্ধের আগুন সমস্ত ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারতে এল "জয়েন্ট মাইকা মিশন"। মিশন এসেই ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সারা ভারতে যত অভ্র উৎপন্ন হবে তা সমস্তই তাঁরা একচেটেভাবে কিনে নেবেন এবং ভারত সরকার মিত্রপক্ষের একটা নির্দিষ্ট দামে সে-অভ্র বিক্রি করার ব্যবস্থা করবেন। দাম ঠিক করতে বেশি সময় লাগল না। তারপর পশ্চিমের সংগে রপ্তানি বাণিজ্যের পথ আরো ভালভাবে খুলে গেল।

'৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় পূর্ব-শর্তমতো জয়েন্ট মাইকা মিশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ইওরোপের যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধের শেষ দিক থেকেই ভারতের অভ্রের বাজারে মন্দার ঢেউ লাগল। এবারে ভারত সরকারের টনক নড়ল। ডি. ই. রুবেন সাহেবের অধীনে এক অনুসন্ধান কমিটি বসানো হল অভ্রশিল্পের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিছুদিন ধরে যথা-রীতি অনুসন্ধানের পর কমিটি রিপোর্ট দিল যে, ভারতের অভ্র মিত্রপক্ষের এক অতি গুরুতর সামরিক খনিজ বা স্ট্রাটেজিক মিনারেল; তাই এ-শিল্পের কিছু উন্নতি সাধন করা দরকার। এই স্ট্রাটেজিক মিনারেল কথাটা উচ্চারণ করার খুবই তাৎপর্য ছিল মনে হয়। কারণ, দেখা গেল যে, যুদ্ধপরবর্তী সামরিক মন্দার ঢেউ কেটে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই অভ্রের বাজার বেশ গরম হয়ে উঠল। অবশ্য, এই বাজার গরমের মূলে ছিল ব্রিটিশ, বিশেষ করে আমেরিকান ফার্মগুলো।। এরা যুদ্ধের সময়ই ভারতের সংগে অভ্রের বাণিজ্য করার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিল। এবার ভারতে আমেরিকার নিজস্ব ফার্ম খোলা হল এবং বেশির ভাগ ভারতীয় অভ্রবাহী জাহাজ আটলান্টিক পাড়ি দিতে শুরু করল।

নিচে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকায় অভ্রের বার্ষিক রপ্তানির মূল্য দেওয়া হল। এ থেকে উপরের কথা কয়টি আরো পরিষ্কার হবে:—

বছর	রপ্তানি অভ্রের মূল্য
১৯৩৮	১,১৩,২৫,০৪৬ টাকা
১৯৩৯	১,৫৪,০৬,০২৫ "

বছর	রপ্তানি অভ্রের মূল্য
১৯৪০	১,৬০,৪৮,৯৪৫ "
১৯৪১	২,৬৫,৬০,৮০৮ "
১৯৪২	২,৮৯,৭৯,২৭০ "
১৯৪৩	২,৯৮,২৭,৬১৯ "
১৯৪৪	২,৭০,০১,৪৫৮ "
১৯৪৫	২,৪৪,৭৭,০১২ "
১৯৪৬	৩,০৯,৪৬,৯৬২ "
১৯৪৭	৪,৬৫,৮৯,১৬৩ "
১৯৪৮	৬,১৪,৪০,১০১ "

যে-কোন পাঠকই বুঝবেন এ-অঙ্কের অর্থ কী? ১৯৩৮/৩৯ সালের চেয়ে ১৯৪৮ সালে ভারত প্রায় ছয় গুণ বেশি অভ্র রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এক অতিপ্রয়োজনীয়-কাঁচামালের প্রয়োজন বিরাট পরিমাণে মেটাচ্ছে বিহারের অভ্র।

অভ্র দেখতে কেমন?

অনেকেই হয়তো জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না একথাও সত্য। একটা পাতলা কাচ আর একটা অভ্রের পাত—এ-দুয়ের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। তফাত হল যে, কাচ অনমনীয় আর অভ্র নমনীয়। তা ছাড়া কাচের মধ্যে কোন স্তর নেই। কিন্তু একটা অভ্রের গোটা পাতই বহু অতিসূক্ষ্ম স্তর দিয়ে তৈরি এবং এগুলো বেশ খালি হাতে ছাড়ানো যায়।

অতিসূক্ষ্ম একটা অভ্রের পাত যে-শক্তি ধরে তা সত্যিই বিস্ময়কর। শত শত ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তি এই সূক্ষ্ম পাত অনায়াসে সইতে পারে—লীকেজ-এর কোন ভয় নেই, গলবে না, পুড়বেও না। তাই বৈদ্যুতিক ফার্নেসের প্রচণ্ড উত্তাপকে ঠেকাতে এই সূক্ষ্ম পাতই যথেষ্ট। তা ছাড়া এর শুভ্রতা, স্বচ্ছতা, নমনীয়তা এবং রাসায়নিক দৃঢ়তা (কেমিক্যাল ইনার্টনেস) একে এত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। তার উপর আবার আছে বর্ণবৈচিত্র্য—কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, কেউ বা বাদামী কিংবা গোলাপী—যা অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু। এই সমস্ত গুণ এবং মসৃণতা, দাগ-ত্রুটিহীনতা ও অখণ্ডতার উপর নির্ভর করে অভ্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এ ছাড়াও কারখানায় সাইজ-করে-কাটা অভ্র আবার আয়তন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বিহারে এইভাবে অভ্রকে বারোটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এবং বিহারী পদ্ধতিই বিশ্বের সেরা পদ্ধতি।

এই বিভিন্ন শ্রেণী ছাড়াও প্রচুর গুঁড়ো অভ্র পাওয়া যায়। এগুলো কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

খনি থেকে অভ্র তুলে ঝাড়াই-বাছাই করতেই তার শতকরা ৭০ ভাগ টুকরো গুঁড়ো হযে নষ্ট হয়ে যায়। ইওরোপ-আমেরিকায় এই সব গুঁড়ো অভ্র থেকে শেলাক নামক একরকম আঠার সংযোগে উচ্চচাপের সাহায্যে বড় বড় অভ্রের চাদর বা পাত তৈরি করা হয়। এর চলতি নাম, মাইকানাইট।

এই শেলাক আঠার সঞ্চয় আমাদের দেশেও প্রচুর এবং কাঁচামাল হিসেবে এ-জিনিস বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

কিন্তু এদেশের অভ্রখনির চারপাশে প্রচুর গুঁড়ো ও দাগধরা অভ্রের স্তূপ জমা হয়ে রয়েছে এবং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। কারণ, আমাদের দেশে মাইকানাইটের চাহিদাও নেই, ও-শিল্পেও নেই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্রখনির দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু অভ্রখনি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কেন, সামান্য ধারণা পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশেরই নেই। অভ্রখনি ও অভ্রের ব্যবসা সম্বন্ধে খবর প্রায় ইচ্ছা করেই চেপে যাওয়া হয় নানা কথার আবরণে। আসল কারণ হল অন্য। অভ্রশিল্প সম্বন্ধে দেশের লোকের জ্ঞান না থাকাটাই খনিমালিকদের বাঞ্ছনীয়। এবং এ-সম্বন্ধে কোন কিছু জানবার সমস্ত সুযোগ থেকে সাধারণকে বঞ্চিত রাখাই মালিকদের উদ্দেশ্য। কেন?

অন্যান্য খনির চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক অভ্রখনি। পশ্চাৎপদ অর্থনীতি, পশ্চাৎপদ খনি-শিল্প (মাইনিং) আজও আমাদের দেশে পুরোপুরিভাবে চালু আছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রা এখনো সভ্য মানুষের স্তরে ওঠেনি। কিন্তু বেড়ে চলেছে আন্তর্জাতিক বাজারে অভ্রের চাহিদা ও সেই সঙ্গে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ। এই পশ্চাৎপদ মাইনিংপদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও কী করে উৎপাদন বাড়ছে? উন্নততর যান্ত্রিক উপায়ে নয়, ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রমশক্তি নিঃশেষে নিংড়েই এই উৎপাদন-পরিমাণ বাড়ছে। তাই এ-গলদ চাপা দেবার জন্য যত্নের সীমা নেই।

কোডার্মা-অভ্র বিহারের অন্যতম প্রসিদ্ধ অভ্র। কোডার্মা অঞ্চলের মাটির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত বিহার মাইকা বেল্ট। এর কাছাকাছি রয়েছে অনেক ছোট-বড় পেগমাটাইট (একপ্রকার আগ্নেয়-শিলা; এর সঙ্গে থাকে বড় বড় অভ্রের চাপ আর সেই সঙ্গে কোয়ার্ট্জ ও ফেল্‌ড্‌স্পার নামে দুটো খনিজ) শিরাউপশিরা ছড়িয়ে আছে। এ-অঞ্চলের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো আগে বিলাতী মালিকের হাতে ছিল। বর্তমানে এগুলো প্রায় সমস্তই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত।

কিন্তু এই পরিবর্তনে আশান্বিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ, মূল গলদ

ঠিকই আছে। অভ্রখনির কার্যপ্রণালী ও আনুষঙ্গিক মারাত্মক অবস্থা এখনো বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি।

অভ্রের উৎপাদন হয় প্রধানত খনি থেকে। কিন্তু এ-ছাড়া আরো একরকম ব্যবস্থা ছিল। একে বলে উপরচালা মাইনিং।

আগে চলত, সুযোগ পেলে আজকালও চলে, উপরচালা মাইনিং-ব্যবস্থা। উপরচালা ব্যবস্থায় মাইনিং করা আরো লাভজনক। কারণ সত্যকার গভীর খনি খুঁড়তে কিছু অসুবিধা আছে। প্রথমত, গভীর খনি খুঁড়তে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন—এতে খরচ বেশি। দ্বিতীয়ত, কতদূর পর্যন্ত অভ্র পাওয়া যাবে, অর্থাৎ কতটা পরিমাণ অভ্র কতদিন ধরে পাওয়া যেতে পারে এবং অন্যান্য অসুবিধা কী কী হতে পারে ইত্যাদি জানা দরকার। তার জন্য আবার প্রয়োজন ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিকদের পিছনে—"বাজে খরচ"। তৃতীয়ত, খনি বেশি গভীর হলেই তা "ইণ্ডিয়ান মাইন্‌স্ অ্যাক্ট"-এর আওতায় পড়ে। ফলে খনিমালিকদের সমস্ত ব্যাপারে সরকারী হাঙ্গামা সহ্য করতে হয়।

কিন্তু এত সব না করে যদি অভ্রের সন্ধান পাওয়া মাত্র আদিম যন্ত্রপাতির সাহায্যে শস্তা মজুরিতে জমিটা আঁচড়ে নেওয়া যায়, তা হলে কাজ একদম নির্ঝঞ্ঝাট। এই শস্তায় কিস্তিমাতের অভ্যাস দেশী খনিমালিকদের মজ্জাগত। এ-অভ্যাস তাঁরা আজও ছাড়েননি। এবং সিংভূমের জঙ্গলে সুযোগ পেলেই আজও এ-রকম মাইনিং চলে।

উপরচালা মাইনিং-এ গর্তটা বড়জোর দশ-পনেরো হাত হলেই চলে। কপি-কলের সাহায্যে ঝুড়ি করে অভ্র ওঠানো হয়। শ্রমিকরা কাজ করে একরকম বিনা পয়সায়।

কতটা কাঁচামাল উঠল, তার হিসেব রাখার কোন দরকার নেই; কারণ, যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। শুধু কি তাই? কাজ শেষ হয়ে গেলে গর্তগুলো মাটি আর আবর্জনা দিয়ে এমন করে বুজিয়ে দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে ভূতাত্ত্বিক অনু-সন্ধানের সমস্ত সূত্র চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। কোডার্মার সমস্ত "সংরক্ষিত বনাঞ্চল বহুদিন ধরে উপরচলা মাইনিং করে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় অভ্র-ব্যবসায়ে একটা চমক্‌প্রদ খবর আছে। খবরটি হল—"যত অভ্র উৎপন্ন হয়, রপ্তানি হয় তার চেয়ে বেশি"। কেমন করে হয়? অভ্র-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত না থাকলে এর সত্যিকার কারণ জানা প্রায় অসম্ভব।

তবে সরকারীভাবে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তা থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

খনির থেকে অভ্র তুলে ঝাড়াই-বাছাই করার পর টুকরো অভ্রের যে বিরাট স্তূপ পড়ে থাকে, দেশী খনিমালিকেরা তা সযত্নে খনির চারপাশে সাজিয়ে রাখেন। এই সব স্তূপ থেকে খনি-অঞ্চলের অধিবাসীরা (যারা নাকি বেশির ভাগই চোর) ভালো অভ্র খুটে খুটে উদ্ধার করে এবং ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মারফত চালান দেয়। এইভাবে উদ্ধার-করা অভ্রের পরিমাণ এত বিরাট যে, সরকারী হিসাবের অনেকগুলো অঙ্ক এর ফলে বদলে যায়। এরই নাম, অভ্রচুরি।

একবার চুরি গেলে সে অভ্রকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কারণ, সনাক্ত করবার কোন উপায় নেই। কুলিরাই অভ্রচুরির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয় চিরাচরিত প্রথামতো। সরকারী মতে এইসব চোরগুলোর জন্যই অনেক ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠান নাকি বছরের পর বছর ক্ষতিস্বীকার করে শেষে দেউলে হয়ে গেছে।

এই সমস্যা নিয়ে ভারত সরকার ও খনিমালিকেরা অনেকদিন থেকেই বিব্রত। কারণ, এই চোরাই অভ্র বাজারের দাম কমিয়ে দেয়। ফলে, শিল্পের ক্ষতি হয়, মুনাফার হার যায় কমে।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটি এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেন। কমিটির অনেকের মতে, প্রথমত, ছোট ছোট খনিমালিক ও ব্যবসায়ীদের এ-শিল্প থেকে হঠিয়ে দিতে হবেঃ হয় আইন করে, নয়তো প্রতি-যোগিতা করে; এবং সমস্ত শিল্পটি দু'চারজন বিশ্বস্ত শিল্পপতির অধীনস্থ করতে হবে। কারণ, খুদে-মালিকরাই নাকি যত নষ্টের গোড়া। বলা বাহুল্য, কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন একজন নামজাদা পুরনো সরকারী কর্মচারী—মিঃ লুকাস, আই. সি. এস.। দ্বিতীয় উপদেশ হল—খনি-অঞ্চলকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা।

এভাবে খনি-মালিকেরা আজকাল বিশেষ উপকার পেয়েছেন।

অভ্র মাটির নিচে প্রচুর পরিমাণে আছে জানতে পারলেই গর্ত খোঁড়া শুরু হয়। এ-কাজের জন্য লোক আসে কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে। কেউ ঠিকে কাজ করে, তবে রিজার্ভ আশানুরূপ হলে তারা সকলেই পাকাভাবে কাজ নেয়।

'নিউম্যাটিক ড্রিলার' দিয়েই আজকাল বেশির ভাগ জায়গায় খনি খোঁড়া হয়। প্রথমত, ড্রিলার দিয়ে একটা সংকীর্ণ গর্ত খুড়ে তার ভিতরে ঠেসে দেওয়া হয় জেলিগনাইট বা গান-পাউডার। প্রকাণ্ড লম্বা একটা পলতে বাইরে বেরিয়ে থাকে। একজন শ্রমিক সেটাতে আগুন ধরিয়ে আসে সন্তর্পণে। তারপর বারুদের বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয় খনি।

এ-রকম ব্লাস্টিং করা হয় কয়লাখনিতেও। কিন্তু কয়লাখনিতে 'সটল' ও থামের ব্যবস্থা থাকায় বিস্ফোরণের সময় শ্রমিকরা একটা সুবিধা মতো গ্যালারিতে

অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু অভ্রখনি একটা খাদ বা সুরঙ্গ মাত্র—আড়াল নেবার কোন উপায় নেই। তাই বিস্ফোরণের ফলে একরাশ মাটি ও পাথর যখন ভেঙে পড়ে, তখন তার কল্যাণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্ত সভ্য-জগতের অজ্ঞাতসারে মাটির তলায় দুচারজন শ্রমিকের সমাধি প্রায়ই হয়। এ-সব খবর অবশ্য খবর-কাগজের অফিস পর্যন্ত পৌঁছয় না।

খনি থেকে তোলাব পর তাকে ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ-সব কারখানা সাধারণত খনির নিকটেই গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খনি ও কারখানামালিক একই ব্যক্তি বা কোম্পানি।

অভ্রখনির মতো সিংভূমের অভ্র-কারখানাগুলোও ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবু এখানকার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রা মনুষ্যত্বের নিম্নতম পর্যায়ে। এবার আসা যাক এ-অঞ্চলের খনি ও কারখানার কাজের ব্যবস্থার আলোচনায়।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের দিন। খনিটা কোডার্মারই কোন নামজাদা খনি। এর মালিক কলকাতারই নামকরা কোন কোম্পানি।

একটা লম্বা খাড়াই সুরঙ্গ ধরে খনির ভিতরে নামলাম। সিঁড়ির কোন বালাই নেই—বাঁশের মই। মই-এর প্রত্যেকটি ধাপ বেশ পিছল, কারণ ছাদ থেকে এর উপর দিনরাত টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে সমস্ত সময়। খনির ভিতরে গভীর অন্ধকার। পথ চলার জন্য হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। অতি সাবধানে পা না ফেললে না ফস্‌কে মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি সম্ভাবনা ষোল আনা। কারণ, একবার পা ফস্‌কে মই থেকে পড়লে সংকীর্ণ সুরঙ্গ পথের তলায় কত ফিট নিচে কোন্ লেভেলে আছাড় খেতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ-অবস্থায় একহাতে জ্বলন্ত মোমবাতি, আর অন্যহাতে পিছল মই ধরে নামা যে কতখানি কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়। অসুবিধা আরো বেশি মোমবাতির জন্যে; প্রতিমুহূর্তে একটি করে উত্তপ্ত তরল মোমের ফোঁটা গায়ে বা হাতে এসে পড়ে এবং ফোস্কা পড়ায়।

এক, দুই, তিন করে প্রায় তেরটা লেভেল নিচে নামা হল—অর্থাৎ প্রায় ২০০ ফিট। সেখানে যা দেখলাম তা সত্যিই অপূর্ব।

একটা বিরাট ঘরের মতো জায়গায় ছাদ, দেওয়াল সমস্তই অভ্রের। বাতির আলোয় তার গা থেকে সুন্দর গাঢ় লাল আভা ঠিকরে পড়ছে। একেই বলে খাঁটি "রুবি বেড" রং, এরই জন্য এর আদরের নাম "বেঙ্গল রুবি"।

চোখের ধাঁধা কাটতে দেখি জনকয়েক শ্রমিক সেখানে কাজ করছে। তাদের হাতিয়ার আদিম যুগ থেকে কোন অংশে বদলায় নি—সেই গাঁইতি আর শাবল। প্রত্যেক শ্রমিককে একটা করে মোমবাতি দেওয়া হয়, কিন্তু তা-ও আবার বুঝে-সুঝে খরচ করতে হবে। দুচারটে মোমবাতির ফিকে আলো সেই জমাট অন্ধকারকে যেন ব্যঙ্গ করছে খনির ভিতরে "ইলেক্‌ট্রিফিকেশন"-এর প্রশ্ন অবশ্য উঠেছিল। এখন সেটা

ভালভাবেই ধামা চাপা পড়েছে। শ্রমিকদের পরনে একটা করে ছেঁড়া ময়লা কাপড় —খালি গা। সেখানে পনের-ষোল বছরের ছেলেরাও কাজ করছে।

কার্যরত একটি শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম—"কত করে রোজ পাও?" সর্দার নিকটে থাকায় উত্তর দিতে প্রথমটা বেশ ভয় পেল। একটু আড়ালে গিয়ে চাপা গলায় বলল, "চোদ্দ আনা বাবুজী।" যারা খুব পুরনো তারা পায় এক টাকা রোজ। বছরে দু'এক আনা করে রোজ বাড়ে। তা-ও সকলের জন্যে নয়।

ভিতরে দুরন্ত গরম—বাতাস চলাচলের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। খাবার জল মেলে না। এক একটা "ব্লাস্টিং"-এর পর গন্ধকের উগ্র গন্ধ ও ধোঁয়ার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তার উপর আবার প্রাণান্তকর ওঠা-নামা। তবুও খনি-শ্রমিকেরা এখানে নাকি আরামে কাজ করে, (সরকারী বিশেষজ্ঞ ও খনিমালিকদের অভিমত) এবং এই মাহিনাতেই নাকি এদের চলে যায়। যদিও কোডার্মায় চালের দর সাধারণ সময়েও ২৫।৩০ টাকা থাকে।

খনি-শ্রমিকদের ইউনিয়ন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ও জিনিসটা এ-অঞ্চলে এখনো প্রায় অজানা। মাঝে মাঝে ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা হয়. কিন্তু মালিকপক্ষের চোখ রাঙানিতে বেশিদূর এগোয় না।

কারখানার কাজ হল খনির কাঁচামালকে যন্ত্রশিল্পের উপযোগী করে দেওয়া। খনির থেকে তুলে আনা অভ্রকে মাটি, পাথর আর কাঁকর থেকে বাছাই করে পরিষ্কার করা। তারপর পরিষ্কৃত অভ্রকে কাস্তের মতো একরকম যন্ত্রের সাহায্যে মাপ মতো কাটা হয়। সাইজ অনুসারে তাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সবশেষের কাজ হল প্যাকিং। কাঠের বাক্সে প্যাক করে সীল করে রপ্তানী করা হয় প্রধানত আমেরিকায়।

কোডার্মার একটি বিশিষ্ট কারখানার একটু বিবরণ দেওবা হল নিচে।

এ-কারখানার কয়েকশ শ্রমিক দৈনিক কম করে নয়-দশ ঘণ্টা করে কাজ করে যদিও খাতায় লেখা হয় আট ঘণ্টার কাজ। ব্যাপারটা এমনই যে কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই জানে না যে তারা দৈনিক ক'ঘণ্টা করে কাজ করতে বাধ্য এবং কত ঘণ্টা তার অতিরিক্ত সময় খাটছে। তাই অতিরিক্ত-রোজের মজুরি সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই শ্রমিকদের তরফে। কারণ, তারা ধরে নিয়েছে তাদের কাজের ঘণ্টা হল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সারাদিনে খাবার ছুটি মেলে কিছুক্ষণের জন্য। কতক্ষণ তা বলা মুশ্‌কিল। কারণ, শ্রমিকদের কথা বিশ্বাস করলে খাবার সময় আধঘণ্টা; ম্যানেজার আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের কথা সত্যি হলে সে-সময় দেড় ঘণ্টা। অবশ্য এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী কিংবা পনেরো-ষোল বছরের ছেলে। এ ছাড়া আছে বৃদ্ধ, যুবা এবং বছর পাঁচ-ছয়ের বাচ্চারা। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেদের

বলা হয় শিশু-শ্রমিক। এদের প্রত্যেক কারখানাতেই রাখা হয় আর এদের সংখ্যাও বাড়ান হয় যথাসম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ, এদের মজুরি কম এবং দ্বিতীয়তঃ, ছোট-বেলা থেকে কাজ শেখাতে পারলে বাধ্য ও শিক্ষিত (স্কিল্‌ড) শ্রমিক হিসেবে এদের তৈরি করা যায়।

আক্ষরিক জ্ঞানের বিচারে অবশ্য এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রমিকদের বিচার চলে না। কার্যকুশলতাই এর বিচার। সর্দার ও ম্যানেজারের সতর্ক নজর এড়িয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, প্রায় পাঁচিশ শ্রমিকের মধ্যে লেখা পড়া জানে মাত্র চারপাঁচজন।

শ্রমিকরা মজুরি পায় দিন হিসাবে। শিশু ও কিশোররা পায় দৈনিক দশ আনা করে, মেয়েরা পায় বার আনা হিসাবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কেরা এক টাকা হিসাবে।

কুড়ি-প'চিশজন শ্রমিক পিছু একজন করে সর্দার থাকে। সারাদিন একটা বেত বা লাঠি হাতে সে শ্রমিকদের কাজের খবরদারি করে। ক্লান্ত হয়ে কাজে একটু ঢিলে দিলে বা পরস্পরের মধ্যে একটু গুনগুন শুরু করলেই সর্দারের বেত কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই কড়াকড়িটা শিশুশ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেশি।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, একমাত্র বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন বহিরাগত দর্শক এখানকার কারখানায় ঢোকার সুযোগ পান না। কারখানায় ঢুকলেই সঙ্গে থাকে মালিকের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী যিনি দর্শককে বিভিন্ন বিভাগগুলো ঘুরিয়ে দেখান এবং জিজ্ঞাস্য যা কিছুর উত্তর দেন।

কারখানার মধ্যে একটা বিভাগে গুঁড়ো বা খুব ছোট টুকরো অভ্রকে চালুনি দিয়ে চালা হয় বাছার জন্য। চালুনিটা বেশ বড়, দুধারে কাঠের ফ্রেম আঁটা। দুটি ছেলে চালুনির দুধারে বসে ও মাঝখানে ফালক্রামের উপর ভর দিয়ে চালুনি ওঠে আর নামে। জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থেকে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর। কারণ, অভ্রের পাউডারে বাতাস ভর্তি। কিন্তু ওই ছেলে দুটি সারাদিন ধরে ওখানে সমানে কাজ করে চলেছে—তবু ফুস্‌ফুস্‌ জোড়া ওদের সুস্থ আছে!

তবু বিহারের অভ্র-শ্রমিকদের তৎপরতা এবং কাজের উৎকর্ষ আজ আন্তর্জাতিক বাজারে সাড়া জাগিয়াছে। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের আশীর্বাদ থেকে এরা বঞ্চিত, উৎপাদিত সম্পদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবি করবার শক্তি তাদের নেই, সমস্ত দিক থেকে এদের জীবন বিপর্যস্ত, কিন্তু তবুও এরা আন্তর্জাতিক অভ্র-শিল্পের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। এর প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলবে বিহারের যে কোন অভ্র-কারখানায়। পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চা ছেলে একটা প্রমাণ (স্টান্ডার্ড) মাইকা ফিল্‌ম-এর 'কোয়ালিটি' নির্ণয় করে একমুহূর্তের মধ্যে খালি চোখে ও খালি হাতে। এই প্রমাণ—ফিল্‌ম-এর বেধ বা থিকনেস হল ০.০০১ ইঞ্চি। এই তীক্ষ্ন দৃষ্টি ও নিপুণ হাত এদের পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রমিক করে তুলেছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা

ও ব্রেজিল থেকে কাঁচা অভ্র ভারতে পাঠান হয় শুধু "স্প্লেসিং" ও "স্প্লিটিং"-এর জন্যে। আর আমাদের বিহারী শ্রমিকরা সে অভ্রকে তৈরি করে দেয় যন্ত্রশিল্পের উপযোগী করে।

তাই এদের দেখলে আর এদের সঙ্গে কথা বলে এদের জীবনযাত্রার নির্মম দারিদ্র্যের কথা শুনলে যেমন একদিকে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হই, তেমনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে আনন্দ হয়। আগামী যেদিন রাষ্ট্রশক্তি নিশ্চিতভাবে চলে যাবে বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর হাত থেকে এদের হাতে, যেদিন উৎপাদক ও উৎপাদিত সম্পদ, এ দুয়ের মধ্যে কোন তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেদিন এরাই ভারতের শিল্প ভারতের খনিসম্পদকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে পারবে। তার জন্য ভাবতে হবে না। সে শক্তি, সে বুদ্ধি এরা এর মধ্যেই অর্জন করেছে—এই আদিম-যুগীয় শিল্পপদ্ধতি ও দারুণ বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেই।

পুস্তক পরিচয়

ধ্বন্যালোক ও লোচন ॥ আনন্দ বর্ধন ও অভিনবগুপ্ত (মূল ও সটীক অনুবাদের লেখক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য) ॥ প্রকাশক: এ. মুখার্জি এণ্ড কোং ॥ দাম পনেরো টাকা ॥ পৃষ্ঠা ২৭৫+৪০০ ॥

বলাকা-কাব্যপ্রবাহ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন ॥ প্রকাশক: এ. মুখার্জি এণ্ড কোং ॥ দাম সাড়ে চার টাকা ॥ পৃষ্ঠা ২১৮ ॥

কবিগুরু ॥ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক: ওরিয়েন্ট প্রেস এণ্ড পাবলিশিং হাউস ॥ দাম তিন টাকা বারো আনা ॥ পৃষ্ঠা ১৭৬ ॥

সাহিত্য-প্রবাহ ॥ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক: এ. মুখার্জি ॥ দাম তিন টাকা ॥ পৃষ্ঠা ১৮৭ ॥

শিল্পলিপি ॥ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥ প্রকাশক: এ. মুখার্জি ॥ দাম তিন টাকা ॥ পৃষ্ঠা ১৬৫ ॥

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য দুটি বড় পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে তৃতীয় পর্বের দ্বারে উপস্থিত। অবশ্য প্রাক্-বঙ্কিম সমালোচনা-সাহিত্য এর মধ্যে গণ্য নয়। প্রথম পর্বটা বঙ্কিমী পর্ব। তার প্রধান মাপকাঠি বঙ্কিমের আদর্শবাদী নীতিবাদ। বঙ্কিমের নীতিবাদ অবশ্য শুধুমাত্র পূর্বতন সমাজের দেউলে নীতিবাদ নয়। কারণ, বঙ্কিম নিজেও ছিলেন স্মৃতিকার। তা ছাড়া, বঙ্কিমের সমালোচনা তৎকালীন বাঙালী লেখকের রুচি গঠনে, সাহিত্য কী ও কী সাহিত্য নয়, এই মূল সত্য নিরূপণে ছিল অসামান্য কার্যকরী। এই আদর্শবাদী নীতিবাদের পরে আসে—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-পর্ব —দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বও আদর্শবাদী সমালোচনার পর্ব, তবে রসবাদী আদর্শবাদের। আর রসবাদী বলেই রবীন্দ্রপদ্ধতি হচ্ছে ইম্প্রেশনিস্টিক অর্থাৎ প্রাতিবিম্বিক বা প্রাতিভাসিক। সাহিত্য যখন 'সহৃদয়-বেদ্য', ভালো লাগা বা মন্দ লাগাই তখন রসবাদের শেষ কথা। সমালোচনা তারপরে হয়ে দাঁড়ায় ভালো লাগাকে নিজের মতো করে ভালো প্রকাশ করা। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের মতো জন্মস্রষ্টার হাতে সমালোচনা হয়ে ওঠে নতুন একটা সৃষ্টি-উদ্যোগ। এবং দু-একজন ছাড়া অন্য সকলের হাতে সমালোচনা হয়ে উঠল বাগ্-বিতণ্ডার। তথাপি রবীন্দ্রনাথেরই কালে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্ভবত সমালোচনায় একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নীতি ও বিদগ্ধ রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'সবুজ পত্রে' রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তবতা' ও শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র যখন অমন প্রাঞ্জল ভাষায় ও পরিচ্ছন্ন

বিশ্লেষণে ভারতীয় রসবাদের (আনন্দবর্ধনের রসধ্বনিতত্ত্বের) সন্ধান দিলেন, তখন রসবাদকেই কাব্যের চূড়ান্ত কথা বলে 'সবুজ পত্রের' যুগের পাঠকেরাও মেনে নিতে দ্বিধা করেননি।

কিন্তু 'কালান্তর' আসছিল ('কল্লোল'-যুগে নয়), সেই কালান্তরের তাড়নাতেই। 'পরিচয়ের' সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙালী লেখকেরা ও পাঠকেরাও নতুন করে সাহিত্য-জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। শুধু জিজ্ঞাসা নয়, সন্ধান, বিচার, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা সাহিত্য-নির্ণয়েও (ফরমুলেশন) অগ্রসর হন। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। সাহিত্যকে 'সহৃদয়-বেদ্য' বলে জিজ্ঞাসা চুকিয়ে দেবার দিন তাতে নিঃশেষ হয়নি। তবে এগিয়ে চলেছে তার-পরেও তথাপি সে জিজ্ঞাসা—শিল্প ও সাহিত্যের কি কোনো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (অবজেক্টিভ) মানদণ্ড নেই, যেমন আছে বিজ্ঞানের? থাকলে কী তা? অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্বকে বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক সমালোচনার পর্ব, বা সমালোচনার বৈজ্ঞানিক পর্ব। সবাই জানেন বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, কাজেই সমালোচনায় এই পর্বকে বাস্তবতার পর্ব বলাই সমুচিত।

বলা বাহুল্য এ-পর্বের যা মুখ্য তত্ত্ব তা পরিচয়ের কেন, বাঙালী পাঠকসমাজের আজ অবিদিত নেই। তা হচ্ছে এই যে, সাহিত্য শুধু ভালো-লাগা আর ভালো-না-লাগা—এই ব্যক্তিগত খেয়ালের দ্বারা বিচার্য নয়। সে বিচার নিশ্চয়ই আছে। কেন ভালো লাগে, ভালো লাগারও বিশেষ রূপটা কী—এ-সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাসকুটও একেবারে নিরর্থক নয়। একেবারে নিরর্থক কি আরও পূর্বতন কোনো সমালোচনা-নীতি—এ্যারিস্টটলের, টেনের, ম্যাথু আর্নল্ডের কিংবা ভারতীয় রস-শাস্ত্রের নানা আচার্যদের? কিন্তু সাহিত্যের বক্তব্যটা কী—এই হল মুখ্য প্রশ্ন। এ নিয়ে অনেক তর্ক। 'পরিচয়ের' পাঠক এ-প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'কবিতায় বক্তব্য'। সাহিত্যের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা জানি, জীবন-সত্যের উদ্ঘাটন। ভাববাদীরা অনেকেই তা শুনে সোৎসাহে বলবেন, 'ঠিক, ঠিক'। কিন্তু বস্তুবাদীরা অমনি বলবেন, 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে'। জীবন মানে একটা ভাবশক্তি নয়; দেশ-কালে বিধৃত জীবদের জীবলীলা, অর্থাৎ 'জীবন-সত্য' মানে শুধু মানবিক সত্যও নয়, সমাজ-সত্য। অনেকেই যখন তা মানতে কুণ্ঠাবোধ করবেন, তখন আরও পরিষ্কারভাবে বলা দরকার—সমাজ যদি শ্রেণী-বিভক্ত হয়, এ সমাজ-সত্যের উদ্ঘাটন মানে হল—সমাজের অন্তর্নিহিত উৎপাদন শক্তির যা প্রয়োজন তা উদ্ঘাটন। উৎপাদন-শক্তির বিশেষ স্তরে প্রয়োজনও বিশিষ্ট। অতএব, সেই পর্বের সাহিত্যেরও বিশেষ বক্তব্য হয় সেই প্রয়োজনীয় সত্য। জগতে যখন বিপ্লবের যুগ তখন সাহিত্যের বক্তব্য হয় বৈপ্লবিক সত্য। বাস্তবতার রূপ হবে তখন বৈপ্লবিক বাস্তবতা। এবং যে-দেশে সমাজ-বিপ্লব সংসাধিত হয়েছে, সে-দেশে এই বৈপ্লবিক বাস্তবতা আর এক স্তর উপরে উঠবে, তা পরিণত হবে 'সমাজবাদী বাস্তবতায়'।

এই সূত্র থেকে অবশ্য এ সত্যও পরিষ্কার—সাহিত্যের বক্তব্য ও বিজ্ঞানের বক্তব্য এক হলেও তার প্রকাশ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান ছাড়া) নৈর্ব্যক্তিক পথে অগ্রসর হয়। সাহিত্য সত্য উদ্ঘাটন করে যে পথে সে পথ কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নয়। বিশিষ্ট কালের মানুষের জীবন, এবং বিশিষ্ট মানুষের (লেখকের, শিল্প-স্রষ্টার)

চেতনার মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয় —পরে সাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়। আর শেষ কথা—সাহিত্যের উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যকে 'রস-সৃষ্টি' বললে বা বাঙালী পাঠকের বোধগম্য ভাষায় 'আনন্দ-দান' বললে অর্ধেক বলা হয়। কারণ, সে শিল্পের রসসৃষ্টি ও আনন্দ-সৃষ্টি হচ্ছে বাস্তব-সৃষ্টির দ্যোতনা—জীবন-সত্যের সন্দর্শনে বা উপলব্ধি লাভে পাঠক-শ্রেণীর চেতনা যে গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। রসোপভোগ বা আনন্দবোধও অনেক সময়ে তা করে। কিন্তু রস সত্যের উদ্ঘাটন না করে সত্যের অপনোদনও করতে পারে; তখন চেতনার উজ্জীবন না হয়ে ঘটবে চেতনার আচ্ছাদন (শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ডস্টয়েভস্কি. সার্ত্রে)। রস সেখানে আসব; আনন্দ সেখানে আফিমের আরাম—বড় জোর চিত্ত-বিনোদন। কিন্তু চেতনা যখন প্রবুদ্ধ হয় তখন কর্মেও মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়, প্রমাণ গর্কী বা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন-শক্তি শিল্প-সাহিত্যে প্রধানত মানসিক সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে, আবার শিল্প ও সাহিত্য রূপে ফিরে সমাজেব উৎপাদন শক্তিকেই প্রসারিত করে দেয় সুপারস্ট্রাকচার হিসাবে—শিল্পের এই শক্তির আভাস স্তালিন দিয়েছেন তাঁর ভাষাবিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনায়। শিল্পের এই শক্তিরই নাম বাঙলা আলঙ্কারিক ভাষায় আমি বলব 'সৃষ্টির (মানব-সৃষ্টির) অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ক্ষমতা'। আর একমাত্র এই অর্থেই বলতে পারি আর্ট ক্রিয়েটস লাইফ—যে-আর্ট এক্সিভেটস ম্যান, কিন্তু তার চেয়ে গোড়ার কথাটা হল লাইফ ক্রিয়েটস আর্ট। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল তাই এলিভেশন—শুধু এ্যাফেক্ট করা নয়; চেতনাব এলিভেশন, কর্মের প্রেরণা—ইন্‌স্পিরেশনও। অবশ্য—শিল্প-সাহিত্যের এই বক্তব্য ও উদ্দেশ্য শিল্প ও সাহিত্য সিদ্ধ করে বিশেষ পদ্ধতিতে। সেইটাই রূপায়নের দিক। মুখ্যত তা বক্তব্যানুসারী, বক্তব্যের অনুগামী। কিন্তু তা অসার্থক হলে বক্তব্য অপরিস্ফুট থাকবে। শিল্প ও সাহিত্য তখন শিল্প ও সাহিত্য নামের অযোগ্য হবে। আর, যেখানে শিল্প ও সাহিত্য যত সার্থক সেখানে তার বক্তব্য ও রূপায়ন দুইই অবিচ্ছেদ্য. অখণ্ড যেন অর্ধনারীশ্বর।

সাহিত্যিক বাস্তবতার এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে যে ত্রুটি অনেক রইল, তা অনেককেই পীড়া দেবে। কিন্তু এই বাস্তব দৃষ্টিক্ষেত্রের সামান্য আভাস না দিলে আজিকার দিনে সাহিত্যের মূল্যায়ন বা সমালোচনা-সাহিত্যেবও দর কষায় আরও ত্রুটি থাকবে। কারণ, এদেশের ভাববাদী সমালোচকেরা আপনাদের ভাবের ধোঁয়াতেই মশগুল। আধুনিক বস্তুবাদে যে জড়বাদ নেই, এ সংবাদও তাঁরা রাখেন না। অপর দিকে, এদেশের বস্তুবাদ এখনো এত অপুষ্ট যে, সুপারস্ট্রাকচার বা মানসপ্রধান সৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয়ে তা এখনো অনভ্যস্ত; কখনো 'আক্ষরিক' (মেকানিস্টিক), কখনো রূপায়নিক (ফরম্যালিস্টিক) বিভ্রান্তিতে বস্তুবাদকেই বাতিল করে আমরা ভাববাদী হয়ে পড়ি। বিশেষ করে. শিল্পে-সাহিত্যে বস্তুবাদী সমালোচনার দিক নির্ণয় হলেও সাধারণ স্বীকৃত পথ ও পাথেয় নির্ণয় এখনো আমাদের দেশে হয়নি, আলোচনার মধ্য দিয়েই তা স্থির হয়ে আসবে।

ভাববাদী সমালোচনার মধ্যে আমাদের দেশে রসবাদেরই প্রাধান্য সর্বস্বীকৃত। একদিক থেকে তা 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক'-এর সগোত্র হলেও রসবাদ তার

চেয়ে গভীরতর ভাববাদ। অন্যদিকে ইওরোপীয় 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্‌ সেক' মতবাদ এক অর্থে চূড়ান্ত ফরম্যালিজম-এ পৌঁছয়; অন্য অর্থে চূড়ান্ত ভাববাদেও (রসবাদ যেখানে পৌঁছেছে) পৌঁছয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজে কায়িকধর্মী (ম্যানুয়াল ওবার্কার) অপেক্ষা ভাবুকের (ব্রেন-ওয়ার্কার) প্রতিষ্ঠা অতিমাত্রায় অধিক ছিল। অতএব, দেখা যাবে—ভারতীয় শিল্প-ও সাহিত্য-চিন্তায় অধ্যাত্মবাদের (যেমন, রসের 'অলৌকিকত্ব') জয়জয়কার। এবং যেখানে অধ্যাত্মবাদ উগ্র নয়, সেখানেও চিন্তায় অন্যরূপ ভাববাদ (যেমন, আলঙ্কারিকদের নানা তত্ত্ব) পল্লবিত। ভরতের 'নাট্য-শাস্ত্র' হতে এই ধারা নানাভাবে এখনো বর্তমান। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও রবীন্দ্রনাথের রসবাদ তারই আর এক বিকাশ।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের চরম কীর্তি অলঙ্কার-শাস্ত্রে আনন্দ বর্ধনাচার্যের 'ধ্বন্যালোক' ও অভিনব গুপ্তের টীকা 'লোচন'। বাঙালী শিক্ষিত পাঠক কয়েক বৎসর যাবতই এই দুই পণ্ডিতের নাম শুনেছেন, সংস্কৃতবিদ্‌ ইংরেজি লেখকদের লেখায় না হোক, অন্তত শ্রীঅতুল গুপ্তের কৃপায় এঁদের বিবৃত তত্ত্বও তাঁরা কতকাংশে জানেন (ছাত্রদের জন্য 'কাব্যালোক'—শ্রীসুধীর দাশগুপ্ত রচিত পাঠ্যপুস্তক)। যা জানেন তাতে কৌতূহল নিবৃত্ত না হয়ে বৃদ্ধি পায়। তারই প্রমাণ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর সহযোগী (বাঙলার অধ্যাপক?) শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচিত 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচনে'র মূল ও সটীক অনুবাদ। এ দুঃসাধ্য কর্মে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়ে বাঙালী সাধারণের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন অর্জন করেছেন, এবং এ বিরাট গ্রন্থের প্রকাশকও ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

আমরা বেশ জানি, বাঙলার সাহিত্য-সমালোচনায় নতুন যুগ এসেছে। এখন রসবাদের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ 'অলৌকিকত্ব' অস্বীকৃত। বস্তুবাদী কান্তিবিদ্যায় (এস্‌থেটিক্‌স্‌) যেটুকু গ্রাহ্য সেটুকু গ্রাহ্য হবে। কিন্তু কী গ্রাহ্য আর কী গ্রাহ্য নয়, তা গভীর অধ্যয়ন ও গভীরতর বিচার-সাপেক্ষ। বাঙলায় এই গ্রন্থ, যা আপাতদৃষ্টিতেও অগ্রাহ্য, পেয়ে বস্তুবাদীও কৃতজ্ঞ হবেন। তার এক-আধটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আরও দু-একটি কথা নিবেদন করছি, সহজবুদ্ধিতেও যা বোঝা যায়।

তত্ত্ব জিনিসটা জন্মে পরে, তথ্যকে বিশ্লেষণ করেই তার জন্ম। সমালোচনা-সাহিত্যও জন্মে তেমনি সাহিত্যের পরে; সাহিত্যকে বিচারবিশ্লেষণ করেই তার উদ্ভব। যে ধরনের সাহিত্য যেখানে যেদেশে প্রচলিত তারই উপর গঠিত হয় তার সমালোচনা-সাহিত্য। আনন্দবর্ধনাচার্য নবম শতাব্দীর (কাশ্মীরের) অসামান্য প্রতিভাবান পণ্ডিত। অভিনব গুপ্তও একাদশ শতাব্দীর (কাশ্মীরের) অসামান্য মেধাবী মানুষ। এঁদের সামনে মূল তথ্য ছিল সংস্কৃত (ও প্রাকৃত) সাহিত্য; এবং পূর্ব আলঙ্কারিকদের তাত্ত্বিক ঐতিহ্য। ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্য ভারতীয় সভ্যতার দোষগুণের স্বাক্ষর বহন করেছে। এ সভ্যতায় বস্তুবাদ চাপা পড়েছে এবং ভাববাদ ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু সভ্যতা ভারতের বাইরেও নানা দিকে বিকাশ লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতের পরে তো তার বিকাশ অসাধারণ; আর সেই বিকাশ ভবিষ্যতেও থামবে না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যেও নানা দিকে নতুন সৃষ্টি হয়েছে; আরও নতুন নতুন দিকেও হবে। তদনুসারে

সাহিত্য-সমালোচনাকেও তা নতুন তথ্য জুগিয়ে আবার সংশোধিত ও পুষ্ট করবে। স্থূল দৃষ্টান্ত এবার উল্লেখ করা যাক—ভারতীয় নবম বা একাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা যেসব সাহিত্যকে উপাদান ভিত্তি করে করুণ ও হাস্যরসের বিচার করেছেন, তা কত সামান্য। সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্য শাসকবর্গের সাহিত্য, তাতে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ নয়। শাসকের প্রমাণ সাইজে তার মানুষ ও ভাব কাটা। এ ছাড়া সংস্কৃত-সাহিত্যে ট্র্যাজিডি নেই। তাতে হাস্যরসের যে দৃষ্টান্ত মেলে তাও স্থূল। এ-কালের হিউমার-এ যে অপূর্ব-মহৎ কৌতুক-রস মেলে তার কোনো আস্বাদন সংস্কৃত-সাহিত্যে লাভ করা কি সম্ভব? এবং তা না লাভ করলে কী করে সম্ভব এ-রসের স্বরূপ বোঝা? করুণ রসের যে উন্নয়ন সার্থক ট্র্যাজিডিতে ঘটে, বা হাস্যরসের যে উন্নয়ন এ-কালের হিউমার-এ ঘটে তা শুধু মাত্রাগত নয়, গুণগত। এই জন্যই কোলরিজ-ব্রাডলির ছাত্ররূপে ডাঃ সুবোধ সেন-গুপ্ত শ্রীঅতুল গুপ্তের অতি-সরলীকৃত ভাববাদ ও রস-ব্যাখ্যান গ্রহণ করতে ('কাব্য রসের ছলে উপদেশ দেন, এ-কথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে এ-ও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্তি দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে না।' ইত্যাদি) আপত্তি করেছেন। এবং ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখিত-ও (সংস্কৃত কাব্যালোচনায় 'সামগ্রিক ভাবাবহের' অভাব এবং 'ব্যক্তিত্ব-রহস্যের স্বচ্ছ দর্পণে আভাসিত সার্বভৌম ব্যঞ্জনার' অভাব) দুটি আংশিক-ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। নিশ্চয়ই এই ঐতিহাসিক বোধ নিয়ে লৌকিক জগৎ ও অলৌকিক (?) রস-লোকের সম্বন্ধ বিচারে অগ্রসর হলে তিনি 'বাচ্য, ব্যঙ্গার্থ ও হৃদয়-সংবাদ' প্রভৃতি রসবাদী তত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শিতায় যতটা আশ্চর্য হতেন, ততই বুঝতেন 'এহ বাহ্য'।

মানুষের সভ্যতায় মানুষের সৃষ্টিশক্তি বাস্তব-জীবনকেই ক্রমাধিগত ও ক্রমবিকশিত করেছে; শিল্প ও সাহিত্য সেই মানবীয় সৃষ্টিরই একটা দিক (অন্যদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক কারুবিদ্যা প্রভৃতি); বাস্তব-সমাজ সত্যই (আধ্যাত্মিক চেতনা নয়) মানস-সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়, 'ধ্বন্যালোক' প্রভৃতি ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের 'বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব' ও অলঙ্কার-তত্ত্ব আসলে সেই 'সাধারণীকরণের' বা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চমৎকার বর্ণনা। এবং মানস-সৃষ্টি আবার ফিরে সেই বাস্তব সমাজ-সত্যকে বিকশিত করে। বাস্তব থেকে মানস-লোকের মধ্য দিয়ে আবার বাস্তবেই তার পথ। তবে এ-পথ উৎক্রমণের (স্পাইরাল) পথ। এবং এই সমাজ-সত্য হচ্ছে দেশে-কালে বিধৃত শ্রেণী-সংঘর্ষের সত্য। কিন্তু রস (ভাব-বিভাব-সঞ্চারীভাবের ব্যঞ্জনা) তাই সমাজের ও জীবনের মৃতকল্প ও সৃষ্টিবিমুখ সত্যকেও উপাদান করে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যকে, সত্য উদ্ঘাটন ও সৃষ্টি, প্রতারিত করতে পারে; কিংবা জীবন্ত ও সৃষ্টিমুখী সত্যকে গ্রহণ করেও মূল উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করতে পারে, প্রতিক্রিয়ার পক্ষেও হতে পারে, প্রগতির পক্ষেও দাঁড়াতে পারে। সৃষ্টির পক্ষেও হতে পারে, বি-সৃষ্টি বা অপসৃষ্টির পক্ষেও হতে পারে। রসবাদ তাই যথেষ্ট নয়। এ-কালের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে অগ্রাহ্য করে নবম শতাব্দীর 'ধ্বন্যালোক'কেই আশ্রয় করলে পশ্চাদ্বর্তী হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র যুগ আমরা জানি—প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। কবি

বলেছেন, "দ্বিতীয় ('এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো') ও তৃতীয় ('আমরা চলি সমুখ পানে') কবিতা যখন লিখচি তখন কিছু খবর না পেলেও আমার মন যেন জগতের কোনো এক মহা-অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল।" ইওরোপীয় যুদ্ধ বাধল এর আড়াই মাস পরে। এই কবিতার আইডিয়া কি তবে অলৌকিক? না এর সৃষ্ট রস অলৌকিক? যাঁরা বস্তুবাদী, তাঁরা জানেন, এটা কবির চালিয়াতিও নয়, জালিয়াতিও নয়। 'মানবের এক মহাযুগসন্ধি সমাগত' এ সংবাদ তখনকার দিনে অনেক অসাধারণ মানুষ বুঝেছিলেন। তা মামুলীভাবের বোঝা নয়। তার মধ্যে যাঁরা মানুষের মহানায়ক তাঁরা সেজন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন লেনিন। কবিও প্রস্তুত হয়েছিলেন কবির নিজ পথে; তার প্রমাণ তাঁর কবিতা; অন্যদিকে কিপলিং-আদি সাম্রাজ্যবাদীদের ঢক্কানিনাদ। সমাজ-সত্যেরই প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের মানসে পড়েছিল। ভোর না হতে তিনি পেয়েছিলেন ভোরের খবর। একে 'অন্তর্দৃষ্টি' বললে অন্যায় হবে না, কিন্তু বাস্তবের অন্তর্দৃষ্টি। এ-শক্তি অসাধারণ, কিন্তু অলৌকিক নয়।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্যপ্রবাহে' রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' সম্বন্ধে নিজের আলোচনা ('শান্তি-নিকেতনে' প্রকাশিত শ্রীপ্রদ্যোৎ সেনের অনুলিখনসমূহ সম্বলিত) গ্রথিত হয়েছে। এ আলোচনায় কবির এমন অনেক কথা আছে যা শুধু 'বলাকা' প্রসঙ্গে নয়, নানা বিষয়ে অশেষ মূল্যবান। 'নিবেদন', 'বলাকার জন্ম-কথা', 'বলাকার ছন্দ', 'গ্রন্থভূমিকা' ও 'কবিতা-ব্যাখ্যা'—এ-সবের মধ্য দিয়ে রসবাদী রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে কবিতার মর্মোদ্ঘাটন করেছেন তাতে ভাববাদের মর্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নি। করা তাঁরও সাধ্যাতীত, যখন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার একটা মূল কথা 'বলাকা'য়ও প্রতিধ্বনিতঃ 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' এবং এ আলোচনায় কবি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "মনে করবেন না যে, ইহলোকের পরে পর-লোকের জীবনে আমার বিশ্বাস নেই।" (পৃঃ ৭১)। "আমি কিন্তু পূর্ব-জন্মবাদী" (পৃঃ ২০৬)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির দোহাই দিতে হয় না রসের অলৌকিকতায়। এবং 'বলাকা'র যে পাঠক পরলোকে ও পরজন্মে বিশ্বাস করেন না, কাব্যরসের অলৌকিকত্বেও বিশ্বাসী নন, তাঁর নিকট বলাকার কোনো রস অগ্রাহ্য নয়। স্থূল জড়বাদের সঙ্গে বস্তুবাদের তফাত এইখানেই। এবং অলৌকিকতা-বাদের আশ্রয় না নিলে বরং 'বলাকা'র কবিতাকে চিরপ্রবহমান প্রাণধারার স্তর হিসাবে জীবন-সত্যের, এ যুগের সমাজ-সত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ বলে গ্রহণ করাই সহজতর হয়। এবং ছন্দ-সম্বন্ধে, লিরিক কবিতার (পৃঃ ৭৮) সম্বন্ধে, বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগ, অতীতের ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ, ইত্যাদি অজস্র বিষয়ে এ গ্রন্থে কবির এত মহামূল্য উক্তি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তা লাভ করে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। (অবশ্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিজের সংযোজনও তাতে কতটুকু আছে, তা একটা প্রশ্ন)। বিশেষ করে অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষে 'বলাকা'র 'কবিতা-ব্যাখ্যা' যে বিশেষ আদরণীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ভাববাদী কবির ভাববাদী ব্যাখ্যা যে কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে তার একটি অদ্ভুত প্রমাণ অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিগুরু'।

এই সুরকির সাহিত্যিক স্থির করেছেন. "আজ সাহিত্যে আছে শুধু আধুনিক মনোবিকার ও মনো-বিকলন". এবং "সংগীত নাই. আছে জ্যাজ; চিত্রকলা নাই, আছে সুর-রিয়ালিজম; নাটক নাই, আছে সিনেমা ফিল্‌ম; জীবনে প্রেম নাই, আছে উদগ্র কামনা; বন্ধু বা বঁধু নাই. আছে কমরেড; ধর্ম নাই. আছে পাওয়ার পলিটিকস ও পার্টি পলিটিকস।" তবে পাঠক-সাধারণের হাসবার কারণ নেই। কারণ, আছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং "রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি জগদ্‌গুরু।" (পৃঃ ১৮-১৯) 'রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মবাণী' হল, (ক) অনির্বচনীয়তার উপলব্ধি (খ) ছন্দঃ স্পন্দন; রবীন্দ্র-কাব্যের প্রয়াস "আত্মোপলব্ধির প্রয়াস বা সাধনা"। যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্র-সাধনার একটা 'ছক'ও তৈরি করে দিয়েছেন (পৃঃ ৪০), তাতে দেখা যাবে 'ভাব', 'মহাভাব' ও 'ভাবাভাব'—এই তিন কদমে রবীন্দ্র-সাধনা 'প্রভাত-সংগীত' থেকে একেবারে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত পাঁচ যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ছান্দসিক হিসাবে ছক্‌-রসিক হবেন, তা বোঝা যায়। তাঁর ব্যাখ্যায় রসোপলব্ধিরও অভাব নেই. অভাব শুধু মাত্রাবোধের। ছন্দোবিদের পক্ষে ত অমার্জনীয়। তবে ছন্দোবিদ্‌ হয়েও তিনি ভাব-বায়ুগ্রস্ত এটা পাঠকের দুর্ভাগ্য। "আজকের জীবনে প্রেম নাই. আছে উদগ্র কামনা", ইত্যাদি অভিজ্ঞতা সত্য হলে লেখকেরও দুর্ভাগ্য বৈ কি।

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে আঠারটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য-প্রবাহে' একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে তা নানা সময়ে নানা পত্রে লিখিত—কোনো কোনোটি মাত্র দু-তিন পৃষ্ঠার, কোনো কোনোটি একটু দীর্ঘ। কিন্তু মূল্যায়নের দিক থেকে তাদের যে কি গুরুত্ব আছে তা হয়তো পরীক্ষার্থী ছাত্ররা বুঝবেন, সাধারণ পাঠক বুঝবেন না। তবে অধ্যাপকসুলভ একটা ভাববাদের দৃষ্টি এবং দৃষ্টিহীনতায় তিনি পূর্ব-বর্তী অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সগোত্র—যদিও সেরূপ বিশ্লেষণ ও রসগ্রাহিতা এ-সব প্রবন্ধে নেই।

অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'শিল্পলিপি'ও প্রবন্ধেরই সংকলন। কিন্তু একবারের মতো তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন—অধ্যাপনা জীবনের সত্যই হয়তো পরিপন্থী নয়। এ প্রবন্ধ ছয়টি ভাববাদী সমালোচকেরই লিখিত। কিন্তু তাঁর মন এখনো ক্লাস-রুমে সীমিত হয়নি, দৃষ্টি ভাববাদের দ্বারা একেবারে স্তিমিত হয়নি। তাতে জিজ্ঞাসা আছে এবং একটা সরসতাও আছে। মোটের উপর তিনি যতটা চান ততটা পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য পরিচ্ছন্ন করেই প্রকাশ করতে পারেন। যেমন, 'রস-বিকলন ও মনোবিকলনে' তিনি তাঁর কথা পরিষ্কার করে বলেছেন—পরম বিস্ময়ই পরম রহস্য এবং এই 'রহস্যবোধ যুক্ত না হইলে কোনো ভাবই রস হয় না'। বিস্ময়বোধ অবশ্য রোমাণ্টিক কাব্যেরই প্রধানতম আশ্রয়। কতদূর পর্যন্ত ডাঃ দাশগুপ্ত অগ্রসর হতে প্রস্তুত তার খানিকটা আভাস (প্রমাণ নয়) এর থেকে পাওয়া যায়। তিনি 'রিয়ালিজম'-এর বিশ্লেষণে যথার্থ সিদ্ধান্তই করেছেন—'রিয়ালিজম' শুধু মাত্র 'রোমাণ্টিসিজমের' প্রতিবাদী নয়। কারণ, জীবন সর্ব-যুগেই এক বিস্ময়, তারও মধ্যে এ-যুগের মতো মহৎ বিস্ময় আর কোন্‌ যুগের জীবনে ছিল? যে রোমাণ্টিসিজম্‌ এই জীবন-বিমুখী, পলাতক, তা-ই বাস্তববাদে অগ্রাহ্য। কিন্তু

তিনি যে বলতে চান—বাস্তববাদ শুধু-মাত্র 'যুগ-সত্য-বাদ', তা ঠিক নয়. তা জীবন-সত্য-বাদও। তাঁকে নইলে বলতে হবে প্রধানত তা শুধু 'যুগ-সত্য-বাদ'ও নয়, সমাজ-সত্য-বাদ, অবশ্য. এ সত্য তো তাঁর অবিদিত নেই। তার প্রমাণ তাঁর 'যুগধর্ম ও যুগশিল্প', 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব'। কিন্তু তিনি তথাপি সমাজ-সত্যের শাণিত অস্ত্রধারী রুদ্র-রূপই দেখেছেন, সৃষ্টিমুখী সমাজ-শক্তি যে অমৃতপাত্র নিখিল বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মুখে তুলে ধরতে উদ্যোগী, সেই বিশ্ব-লক্ষ্মীর রূপ তাঁর চোখে পড়ে না। দ্বন্দ্বটা কিন্তু এখানেও—শিল্প-সাহিত্যের উত্তরাধিকার কি শতকরা একজন শাসক-শ্রেণীর ভাবুক রসিকের, না, সে উত্তরাধিকার শতকরা নিরানব্বই জনের, সৃষ্টির অধিকারী জনতার?

লাল মাটি ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্. কলিকাতা-৬ ॥ সাড়ে চার টাকা ॥

"লাল মাটি আমার মা। অনেক ইতিহাসের রক্তস্বাক্ষরের সীমন্তিনী তুমি—অনেক প্রাণ-সাধনার তুমি মহাভৈরবী। আজও তোমার সাধনা শেষ হয়নি. আজও গৈরিক মাটিতে তোমার রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস. আজও কালবৈশাখীর ঝড়ে দিকে দিকে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্ন-ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি। আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী আজ তলোয়ার হয়ে জ্বলছে; আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুক্নপুরের নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শেষ শিখা।

আমার জন্মভূমি—আমার লাল মাটি। আমাদের রক্তদামামার তালে তালে. তোমার রাঙা টিলার চূড়োয় চূড়োয় আজ নবযুগের স্পর্ধিত পদধ্বনি।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল মাটি' শেষ হয়েছে এই অর্ঘ্যে। লেখকের দিক থেকে এই অর্ঘ্যে আছে লেখকের আন্তরিক ভাবাবেগের সাক্ষ্য ও তাঁর স্বাভাবিক কবিমনের স্বাক্ষর। লেখার দিক থেকে এই শেষ প্রণামে আছে এ-গ্রন্থের পট-ভূমিকার নির্দেশ, তার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ—বাঙলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা : 'রাঢ়বঙ্গ' যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে—সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লাল মাটি. 'বরেন্দ্রভূমি'—লাঙলের ফালে ফালে ওঠে শিলামূর্তি। পাল-বংশ গেলে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' মাথা তোলে; সে-বিদ্রোহ "বাংলার মাটিতে" প্রথম সার্থক গণ-বিপ্লব—শূদ্র শক্তির উদ্বোধন। "শত শত বছর পরে আগামী পৃথিবীর সূচনা এ'কে দিয়ে গেছে কাল-পুরুষের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে।" তাই হাজার বৎসর পরে তার পদধ্বনি শুনছেন লেখক—'কৈবর্ত বিদ্রোহের' নবজন্ম—মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে দুটো ঝড় আবার—যমুনা আহীর ও তার আধা-বাঙালী গোয়ালারা, বুড়ো সোনাই মংগল ও টক্রুক্ মাঝির ব্যাটা ধীরুয়া ও সাঁওতালেরা, হোসেনের দল আর তুরীরা একদিকে; অন্যদিকে হিজলীবনের কুমার ভৈরবনারায়ণ, পালনগরের পাঠানদের নেতা ফতেশা পাঠান। মালিনী নদীর ভাঁড়ার মুখে বাঁধা চাই বাঁধ। মালিনী নদীর বর্ষাস্ফীত জল ভাঁড়ার মুখে ঢুকলে কালা পুখরীর তুরীদের চাষ-ফসল.

সব ভেসে যায়। ভাঁড়ার মুখে জল না ঢুকলে মারা যায় ভৈরবনারায়ণের জলকর। ওঁরাও, তুরী, সাঁওতাল, 'বালিয়া' মুসলমানের দল সব এক-জোট হয়ে এসেছে বাঁধ বাঁধতে, আর একজোট হয়ে এসেছে ভৈরবনারায়ণ, ফতেশা পাঠান তাদের দমন করতে। তৈরি হল রক্তমাখা বাঁধ;—হয়ত সে-বাঁধ পুলিস এসে আবার ভাঙবেও; কিন্তু যে-সূর্য উঠছে সে-সূর্য সে-দিনও জেগে থাকবে।

'লাল মাটি'র কাহিনী প্রধানত এই। এই কাহিনীর প্রাধান্যের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে তার মানুষেরা,—তাদের মধ্যে যাদের নাম আমরা এখনো শুনি নি—তারা হল পূর্বতন রাজ-বন্দী রঞ্জন ('শিলালিপি'র যে নায়ক) কৃষক সমিতির সংগঠক নগেন সরকার ও তার বোন উত্তমা, আর মোসলেম লীগের দাঙ্গাবাদী তরুণ নেতা ইসমাইল, আর 'নুর-এ-পাকিস্তানের' স্বপ্ন-পাগল কর্মবীর আলিমুদ্দিন মাস্টার। এ-কথা ঠিক 'লাল মাটি'তে সাধারণভাবে চরিত্র প্রাধান্য অর্জন করতে পারে নি, গ্রন্থের কাহিনী প্রাধান্য অর্জন করেছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পদে পদে সাক্ষাৎকার ঘটে সে-কাহিনীতে। সোনাই মণ্ডল, যমুনা আহীর, জলিস আর রসিদ খাওয়া, এরা কেউ ইসমাইল বা ফতেশা বা ভৈরবনারায়ণের থেকে কম সত্য নয়, কিন্তু মনে দাগ কেটে যায় (নাটকীয় হলেও) কালো শশী আর উত্তমা; রাজ-বন্দী রঞ্জনও তাদের তুলনায় বড়ো বাঁধা-ধরা কর্মীপুরুষ—এ-জাতীয় চরিত্র নিয়ে এই মুশকিল। কিন্তু সমস্ত উপন্যাসের উপর রূকনপুরের দীপস্তম্ভের মতো জ্বলছে একটি চরিত্র আলিমুদ্দিন মাস্টার—ভাবী পাকিস্তানের যারা প্রেরণা, আগামী বাঙালী জীবনের যারা শ্রেষ্ঠ প্রতি-শ্রুতি —যারা শুধু উপন্যাসের কাহিনী নয়, জীবনের সত্য—একথা সেদিনও প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ঢাকার পাকিস্তানী বন্দুকের সম্মুখে। শুধু এই একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেই নারায়ণবাবু আজ বাঙালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হতে পারতেন, নিজেকেও মনে করতে পারতেন সার্থক। কিন্তু নারায়ণবাবুর প্রয়াস আরও বৃহৎ। এ-কালের এক বৃহত্তম সত্য প্রকাশে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তিনি 'কৈবর্ত বিদ্রোহের' নবরূপায়ণ করতে বসেছেন। সহজ সার্থকতায় তাঁর তৃপ্তি কোথায়? সেদিক থেকে তাঁর কাহিনী-রচনা ত্রুটিহীন নয়। সে-ত্রুটি কৃষক সংগ্রামের দিক থেকে নয়, সাহিত্য-বস্তুর দিক থেকে। যেমন 'লাল মাটি'তে চরিত্রসমূহ আপনার স্বাচ্ছন্দ্যে যতটা বিকশিত হয়েছে তার অপেক্ষাও মনে হয় তাঁর বক্তব্যের মাপ-জোক অনুযায়ী বেশি নিয়মিত (স্কিমেটিক্) হচ্ছে। অথচ ক্যারু মার্ডনার ও কালো শশী কাহিনীও এ-প্রসঙ্গে অবান্তর। দ্বিতীয়ত, নাটকীয় বোধ তীক্ষ্ণ থাকায় নাটকীয় ঘটনা বিন্যাসের প্রতি তাঁর দুর্বলতা দেখা যায়। বিশেষ করে, ভৈরবনারায়ণ, কালো শশী প্রভৃতি মানুষগুলি ভালো ফুটলেও কতকাংশে 'নাটকীয়' চরিত্র থেকে গিয়েছে। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের দরদী হৃদয়ের ছাপ পেযে এবং অপূর্ব ভাষার সম্পদে 'লাল মাটি' সহজেই রসো-ত্তীর্ণ। কিন্তু শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়ের প্রয়াসও যেমন বড়, তাঁর নিকট তাঁর সমকালীন বাঙালীর প্রত্যাশাও তেমনি বড়। সেই বড় কীর্তির দাবি পূর্ণ না হতে আমরা নারায়ণবাবুকে নিষ্কৃতি দেব না, নারায়ণবাবুও পাবেন না আপনার কাছ থেকে আপনি মুক্তি।

গোপাল হালদার

যুগের আলো (মার্কসবাদের গোড়ার কথা)॥ অনল রায়॥ ২০৮ পৃষ্ঠা॥ পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ, কলকাতা ১২॥ দাম দু টাকা॥

আজ আমাদের দেশে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের জানবার আগ্রহ খুবই বেড়ে গিয়েছে। একদিকে মার্কসবাদী নেতৃত্বে সোভিয়েট, মহাচীন ও পূর্ব-ইওরোপে মেহনতী মানুষের অপ্রতিহত অভিযান, অন্যদিকে আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নিজের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ফলে আজ এদেশে মার্কসবাদের ব্যাপক প্রচার হওয়া স্বাভাবিক। তাই, আজ বাজারে মার্কসবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন বই বের হলেই তার চাহিদা অন্যান্য বইয়ের তুলনায় হয় অত্যন্ত বেশি।

শ্রীঅনল রায়ের 'যুগের আলো' বইটির সম্প্রতি বেশ প্রচার হয়েছে। তার প্রধান কারণ, লেখক স্বচ্ছ ভাষায় মার্কসবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর বইটি সুপাঠ্য হয়েছে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে লেখক পড়াশোনা করে তা সকলের বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই উদ্যম প্রশংসনীয় এবং এরকম বইয়ের প্রচলন যাতে হয় তার দিকে আমাদের প্রগতিশীল আন্দোলনের দৃষ্টি রাখতে হবে।

মার্কবাদকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করবার দুটি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হল মার্কসবাদকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা। মার্কসীয় আন্দোলনের ইতিহাস স্তরে স্তরে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা —সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় উপায় হল, মার্কসবাদের মূল বিষয়গুলি প্রত্যেকটি আলাদাভাবে নিয়ে সেগুলির ব্যাখ্যা করা। লেখক ঠিক করতে পারেন নি কোন্ পথ অনুসরণ করবেন, একবার তিনি ঐতিহাসিক উপায় অবলম্বন করেছেন, আবার কোথাও কোথাও তা ছেড়ে দিয়ে মার্কসবাদের মূল বিষয়গুলি আলাদাভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন শ্রেণীসমাজের বিকাশ তিনি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কোনও সাম্প্রতিক ঘটনা বা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, ফলে বইটি পড়লে মনে হয় কেমন যেন খাপছাড়া কতকগুলি প্রবন্ধ একত্রে ছাপা হয়েছে। যাঁরা মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রথমেই এই বইটি পড়বেন তাঁদের এতে অসুবিধা হবে এবং মার্কসবাদ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ছবি তাঁরা পাবেন না।

লেখক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়েছেন। বইটিতে কমিউনিস্ট পার্টি কী, তার ভূমিকা কী, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নি। কৃষকসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা এতে বাদ পড়ে গিয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের বিপ্লবী গুরুত্ব দেখানো হয় নি। লেখকের মতে বিভিন্ন দেশে বা কালে মার্কসবাদী আন্দোলনের কর্ম-কৌশল ও আন্দোলনের রূপ নির্ভর করে শুধু সেই দেশের বা সেই সময়ের জনমতের উপর।

"গণমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্তালিন এই সব দেশের মার্কসবাদীদের বলেছিলেন, বড় পুঁজি, সমস্ত শক্তি ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জনগণের সম্মিলিত মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে।.. গণমত সম্বন্ধে সজাগ বলেই, সাম্যবাদ চরম লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন

পরিবেশে, কমিউনিস্ট আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।" (১৬৮ পৃঃ)

এইভাবে দেশে দেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের কর্মকৌশলের তফাত বিচার করা ভুল হবে, কারণ, কর্ম-কৌশল আসলে নির্ভর করে বিপ্লবের স্তর, দেশের বাস্তব অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তির উপর। তাছাড়া, সর্ব-নিম্ন ও সর্বোচ্চ কর্মসূচীর মধ্যে তফাত সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেননি।

মালিক-শ্রমিকের যে মূল শ্রেণী-সংঘর্ষ তারই পরিপ্রেক্ষিতে আবার কোন বিশেষ অবস্থায় অন্যান্য শ্রেণীর সম্বন্ধ বিচার করতে হয়; সে-বিষয়ে কোন উল্লেখ করা হয় নি বইটিতে। এই কারণে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তফাত ঠিক মতো বোঝানো হয় নি এবং ফলে জন-গণতন্ত্রের কোন আলোচনা এই বইতে স্থান পায় নি। অথচ, এই সব বিষয় আলোচনা না করলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে আজকের দুনিয়ার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের সঙ্গে মালিক-শ্রমিকের মূল বিরোধ, বা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষের কী সম্বন্ধ তার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে আমাদের দেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে না। তাই শুধু এই বই পড়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কর্মসূচীর মার্কসবাদী বনিয়াদ পাঠকের পক্ষে বুঝতে পারা মুশকিল হবে।

বইটিতে এমন কয়েকটি ভুল রয়েছে যা সহজেই সংশোধন করা যায়। ১৩-র পাতায় লেখা হয়েছে যে মধ্য-যুগের শেষে "ইংলণ্ডে এক নূতন আইনের বলে দরিদ্র চাষীরা অনেকেই তাদের জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।" ইংলণ্ডে 'এনক্লোজারস' এই রকম আইনের বলে হয় নি। ১৬-র পাতায় বলা হয়েছে যে ইংলণ্ডে রাজারা জমিদারদের দমন করবার উদ্দেশ্যে দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

এটা ঠিক কথা নয়।

৮৩-র পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, "উৎপাদনী শক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর সমস্ত সমাজের শ্রেণীবিভাগ, চেতনা ও কৃষ্টি নির্ভর করে এই সত্যই (ইক-নমিক ইনটারপ্রিটেশন অফ হিসট্রি) বৈজ্ঞানিক মার্কস আবিষ্কার করেছেন সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।" কিন্তু মার্কসের আবিষ্কার হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এবং তা শুধু ইকনমিক ইনটারপ্রিটেশন অফ হিসট্রি নয়।

৯১-র পতায় বণিক সমাজের উৎপাদনের সূত্র (ফরমুলা) বলা হয়েছে :

"M—C—M"

কিন্তু আসলে এই সূত্র হল :

"M—C—M¹"

৯৭-র পাতায় "ওনারশিপ অফ ক্যাপিটাল"-এর বাংলা করা হয়েছে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'। ১০১-র পাতায় "জেনারেল ক্রাইসিস অফ ক্যাপি-টালিজম"-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'ধনিক সভ্যতার চিরন্তন সংকট'। ১৪৬-র পাতায় ট্রুম্যানকে সোশ্যালিস্ট বলা হয়েছে।

লেখকের ভাষা ও লেখার ভঙ্গি সম্বন্ধে সমালোচনা করতে হলে বলতে হয় যে যদিও ভাষার উপর তাঁর দখল আছে তবু বাংলাতে মার্কসবাদ যাঁদের জন্য লেখার বিশেষ প্রয়োজন—বাঙালী কৃষক ও শ্রমিক—তাঁদের পক্ষে এই বইয়ের ভাষা মোটেই সহজবোধ্য হয় নি। তা ছাড়া, অনেক জায়গায় বড্ড বেশি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৬-র পাতায় "লায়নস শেয়ার"-এর বাংলা অনুবাদ করা

হয়েছে 'সিংহভাগ'। ২০৪-এর পাতায় "আয়রন জ্যাকেট"-এর বাংলা হয়েছে 'লৌহ জ্যাকেট'।

এই সব ভুলত্রুটি সত্ত্বেও বইটিতে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে যা মার্কসবাদ প্রচারে সাহায্য করবে। উপরে বইটির যে-সমালোচনা করা হল তার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করে দিলে বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রগতিশীল আন্দোলনের বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে দেখা দেবে।

নিখিল চক্রবর্তী

কবি-কথা ॥ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ॥ সুপ্রকাশন ॥ ৩ সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা —১৯ ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

শান্তিনিকেতন আশ্রম ॥ শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা—১॥ এক টাকা ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চোদ্দ-পনের বছর ধরে যাঁরা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর অন্যতম। কবির সহকারী হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি থেকেছেন দীর্ঘদিন ধরে—যার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ :

"লেখার যত আবর্জনা,
জেনে রেখো সকলে
সমস্ত রয় কর-মশায়ের দখলে।"

ব্যক্তিগতভাবে জানা সেই রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ, টুকরো ঘটনা কর-মহাশয় সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলেছেন এই 'কবি-কথা' বইটিতে। ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উপভোগ্য ব্যক্তিগত বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি বইয়ে। সুধীর কর মহাশয়ের বইটি সেই ধরনের বইয়ের তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথ, মনিব রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি নানা দিকে থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের চিত্তাকর্ষক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই 'কবি-কথা'য়, কিন্তু এই সব বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য সুন্দর পরিচয়টুকু—যে-রবীন্দ্রনাথ দরদে-হাসিতে, স্নেহে-অভিমানে, ছোটখাটো দুর্বলতায়, নানান্ অদ্ভুত খেয়ালের বাতিকগ্রস্ততায় আমাদের মতোই আর-পাঁচজন সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি।

স্বাস্থ্য-বাতিকগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ : "হাতের কাছে টেবিলের উপর সাজানো থাকত অষ্টপ্রহর বায়োকেমিক ওষুধের শিশিগুলো, খানিকক্ষণ পরে-পরেই বাঁ হাত উপুর করে নিয়ে ডান হাতের তেলোয় ঠুকে মুখে পুরতেন ঐ শিশি থেকে চার-পাঁচটি করে সাদা গুটিকা।" ..."একবার কে বললে, রোজ রোজ আমলকী ছেঁচে খাওবা উপকাবী। আশ্রমে আমলকী গাছ মেলা, তলায় তলায় ফলের ছড়াছড়ি। গুরুদেব হুকুম দিলেন, রোজ তাঁকে আমলকী ছেঁচে দিতে হবে। কিছুদিন পরে কলকাতায় আশ্রমের অভিনয়.. সঙ্গে নিলেন আমলকী। চাকরদের প্রধান কাজই দাঁড়ালো, এতো-এতো আমলকী ছেঁচা।"—ফলে

শয্যাশায়ী হয়ে কলকাতায় নাটকের অভিনয় প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। একবার রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমস্ত উপকরণ বাহুল্য ঘুচোবেন, "সাদাসিদেভাবে থাকবেন। কম্বল হবে শয্যাসম্বল।... গদি উঠিয়ে পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল পেতে তৈরি হল বিছানা। শুধু কি তাই, মেজেয় কম্বল, জানলায় কম্বল। কম্বলে জোড়াসাঁকোর ঘর ভরা। এদিকে কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল ছট্‌ফটানি।—ধেয়ে ফেল্লেরে ছার-পোকা! ঝাড়ু বিছানাপত্তর, রোদে দে, ধুয়ে দে গরমজলে, শিগ্‌গির মেরে ফেল্ ওই আপদগুলোকে, ইত্যাদি। করা হল সবই। কোথায় ছারপোকা! আসল কথা, কম্বলের কুট্‌কুটে রোঁয়া-ফোটার জ্বালা। গা উঠল চুলকুনিতে ফুলে। তাঁর ধারণা —এ ছারপোকারই খোঁচা।" শেষ পর্যন্ত ছারপোকার সেই কাল্পনিক আপদ দূর করতে রবীন্দ্রনাথকেই আপাদমস্তক ফ্লীট্ দিয়ে স্নান করতে হল! বীরভূমের শুকনো আবহাওয়ার গরীব মানুষদের খোড়োঘরকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার উপায় ভাবতে ভাবতে দেয়ালগুলোর মতো ছাদটাকেও মাটি দিয়ে গড়বার আইডিয়া এল কবির মাথায়—"ভুবন-ডাঙ্গা থেকে গৌরদাস মণ্ডল এল মিস্ত্রী। তৈরি হল তার থেকে 'শ্যামলী'।.. আগুনের হাত থেকে বাঁচা গেল তো পড়া গেল জলের হাতে। বর্ষায় ছাদ যায় ধ্বসে।"

এই রকম আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে 'কবি-কথা'য় যা পড়তে পড়তে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য উপভোগের একটা চমৎকার আমেজ জমে মনে। সুধীর কর-মহাশয়ের লেখায় একটি প্রসন্ন প্রসাদ-গুণ আছে—এই ধরনের বইয়ে যে-জিনিসটা না থাকলে চলে না। তাছাড়া, 'কবি-কথা' বইটি শুধু যে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ মিটাবে তাই নয়, রবীন্দ্র-জীবনী ও রচনাবলীর ছাত্র-দেরও খানিকটা কাজে লাগবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার ঐতি-হাসিক অনুষঙ্গ বলা আছে বইটির নানা জায়গায়—'গল্পসপ্তক'-এর বৈষ্ণবী, 'যাত্রী'র সেই জার্মান বৈজ্ঞানিক-দম্পতি কোপেরবার্গ, 'বাঁশরী'র 'পুরন্দর'-এর 'ক্ষিতীশ'-এ রূপান্তর, রচনারত রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভৃত্য বনমালীর ইতস্ততঃ ভাব দেখে কবিকণ্ঠে 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন' গানটির জন্ম, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আছে শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আসরের বর্ণনা—যেখানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে শিল্পী-গুণী-মনীষীর দল এসে জড়ো হতেন বিশ্বভারতীর সেই আশ্রম-প্রাঙ্গণে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্'।

শান্তিনিকেতনে সেই আশ্রম পত্তনের গোড়াকার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বইটিতে। অঘোরনাথ ছিলেন ভুবনডাঙায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত আদি আশ্রমের প্রথম ভারপ্রাপ্ত আশ্রম-রক্ষক। শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠার একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ তিনি লেখেন ১৩০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর আগে—'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' নামে সেই বিবরণীটি এই বইয়ের প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'শান্তিনিকেতনের কথা' লিখেছেন অঘোরনাথের দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ যিনি সেখানকার আদি আশ্রমিকদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্র-নাথ সর্বপ্রথম যে-সব সহকর্মীদের নিয়ে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের একজন। পরে অন্যত্র চলে গেলেও, শেষ বয়সে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই ফিরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। খুব অল্পদিন আগে (২০শে জুন) জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে। অঘোরনাথ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ দু'জনেই শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁদের লেখা এই ইতিহাস যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে সন্দেহ নাই।

অঘোরনাথ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতে, অজিতকুমার চক্রবর্তী-লিখিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' জীবন-চরিতে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যের ভুল আছে এবং এমন কোন কোন মন্তব্য আছে যাতে সাধারণের মনে কিছু ভুল ধারণা হতে পারে। প্রধানতঃ অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা ওই বইটির ভুল সংশোধনের চেষ্টাতেই এই বইটি লেখা। সন-তারিখ-ইত্যাদিব তথ্য আর অন্যান্য মতামত নিয়ে ইতিহাস-কারদের মধ্যে বিতর্ক থাকতেই পারে। —যেমন, দেবেন্দ্রনাথের আশ্রম প্রতিষ্ঠার তারিখ ১২৬৯ সাল না ১২৯৪ সাল, প্রায় ন' বছর আশ্রম চলার পর তার কাজ ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন, ১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ আশ্রমকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে-ছিলেন কেন, দ্বারিক সর্দার ডাকাতি ছেড়ে চাকরি করতে এসেছিল কি-না, দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-বেদী কখন তৈরি হয়েছিল, ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত যাই থাকুক না কেন, এই 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বইটির আসল আকর্ষণ কিন্তু সেই সব বিতর্কের জায়গায় নয়। আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের আগ্রহ জাগায় বইটির সেই সব জায়গা যেখানে বর্ণনায় পাই—প্রায় এক-শো বছর আগেকার ভুবনডাঙার দিগন্তপ্রসারী ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে প্রহরীর মতো মাথা-উঁচানো একটা ছাতিম গাছ, উপাসনা-বেদী গেঁথে তুলবার জন্যে মাটি খুঁড়তে গিয়ে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল মানুষের মাথার খুলি, কয়েকমাইল দূরে তান্ত্রিকদের সাধনকেন্দ্র কঙ্কালীতলা, ইত্যাদি।

'শান্তিনিকেতন আশ্রম' তথ্য-সন্ধানীর পক্ষে নিশ্চয়ই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বই। বাঙলার সবচেয়ে গর্ব করার মতো একটি সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপত্তনের ইতিহাস অনেক নতুন তথ্য নিয়ে বিবৃত হয়েছে এই বইটিতে।

THE POPULAR ASPECT OF SOVIET ART : A. I. Zamoshkin. Foreward by Arun Sen. Six annas, 12, Ritchie Road, Calcutta—19.

কয়েকমাস আগে দিল্লীতে (এবং পরে বোম্বাই আর কলকাতায়) যে সোভিয়েট চিত্র-ভাস্কর্য-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, সেই উপলক্ষ্যে এ-দেশের দর্শকদের কাছে সোভিয়েট আর্টের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে জামোশ্‌কিন্‌ এই ছোট পুস্তিকাটি লেখেন। সম্প্রতি শ্রীঅরুণ সেন তাঁর নিজের লেখা একটি ছোট মুখবন্ধ সংযোজন করে এই পুস্তিকাটি নিজে ছেপে বের করে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

জামোশ্‌কিন্‌-এর প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত সুলিখিত। সোভিয়েট শিল্পের মূল প্রেরণা যে সোশ্যালিস্ট্‌ রিয়ালিজম্‌, লেখক সহজ ভাষায় তার ব্যাখ্যা

দিয়েছেন এ-দেশের সাধারণ চিত্র-দর্শকের কথা মনে রেখে। সোভিয়েট শিল্প একান্তভাবেই গণমুখাপেক্ষী। সেখানে সাম্যবাদী সুখী সমাজ গড়ে তোলার বিরাট কর্মসমারোহে শিল্পীও একজন বিশিষ্ট আর সম্মানিত কর্মী।—আমাদের সমাজে শিল্পীকে জনকতক ধনী ক্রেতার রুচির দিকে দৃষ্টি রেখে ছবি আঁকতে হয়, কিন্তু সোভিয়েট সমাজে সমগ্র জনসমষ্টি শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক।—সুতরাং সেখানকার শিল্পীর ওপর বিশেষ কতকগুলি দায়িত্ব বর্তায় : শিল্পী একদিকে যেমন জনসাধারণের শিল্পরসগ্রহণের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে ছবি আঁকেন অন্যদিকে তেমনি ক্রমশঃ জনসাধারণের শিল্পরুচিবোধের মানকেও উন্নত করে তোলেন তাঁর চিত্ররচনার মধ্যে দিয়ে। চিত্রকলাকে জনতার পক্ষে গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে সোভিয়েট শিল্পীরা লোকশিল্পের রূপরীতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করছেন। ফলে, লোকশিল্প আর স্টুডিও-শিল্পের মধ্যে ব্যবধান সেখানে ক্রমশঃই ঘুচে যাচ্ছে।—এইটেই জামোশ্‌কিন্‌-এর মূল বক্তব্য এবং সোভিয়েট শিল্পের এই 'পপুলার' বা গণমুখাপেক্ষী দিকটির কথা তিনি বলেছেন সহজভাবে খুব একটা গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে না গিয়ে।

শ্রীঅরুণ সেনের ছোট কিন্তু মূল্যবান মুখবন্ধটুকু পাঠককে জামোশ্‌কিন্‌-এর বক্তব্য গ্রহণে আরও সাহায্য করবে। সোভিয়েট শিল্পীদের রচনাবলীর থেকে আমাদের কি শিক্ষা গ্রহণীয়, সেদিকেও তিনি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু, মাত্র ষোল পৃষ্ঠার এই বইয়ে এতো অজস্র ছাপার ভুল থাকাটা নিশ্চয়ই উচিত ছিল না।

রবীন্দ্র মজুমদার

শান্তির স্বপক্ষে

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন

মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন, কুও-মো-জো প্রমুখ চীনের শান্তি-আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এগারো জন নেতার আহ্বানে জুন মাসের ৩রা থেকে ৬ই তারিখে পিকিংয়ে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২০টি দেশের শান্তি-আন্দোলনের ৪৭ জন নেতা এক প্রস্তুতি-সম্মেলনে মিলিত হন। এই প্রস্তুতি-সম্মেলন সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে পিকিং শহরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন আহ্বান করে।

এই প্রস্তুতি-সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, কোরিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, কানাডা, চিলি, মেক্সিকো, সিংহল, থাইল্যান্ড, ভিয়েটনাম, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড ও মালয়ের প্রতিনিধিরা। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-দল ছিলেন, অধ্যাপক কোশাম্বী, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও "প্রীত-ল্যারী"-সম্পাদক সর্দার গুরুবক্স সিং। দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এস. এস. ইউসুফ।

প্রস্তুতি-সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী ব্যক্তিরা যে ছিলেন, সেটাই সব নয়। যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁরা হলেন এই ২০টি দেশের ব্যাপক শান্তি-আন্দোলনের অথবা গণ-আন্দোলনের অতি-পরিচিত ও বিশ্বাসভাজন নেতৃবৃন্দ।

তাঁরা যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছেন, তা থেকে সুস্পষ্টভাবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই সম্মেলনের অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাঁরা ব্যক্ত করেছেন, "এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৬০ কোটি জনগণের একাগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ বিপন্ন হবে পড়েছে যুদ্ধ এবং সামরিক প্রস্তুতির বিভীষিকায়।"

যে এশিয়ার জনগণ সর্বান্তকরণে যুদ্ধকে ঘৃণা করে, নিজেদের সার্বভৌমত্ব অর্জন করে সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তুলতে চায়, সেই এশিয়ার বুকে আজ ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের মহড়া চলছে। নৃশংসতম মারণাস্ত্র ও জীবাণু-যুদ্ধের প্রয়োগে বে-সামরিক নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগণ চায় এর শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং তার জন্য তারা সমবেতভাবে সংগ্রাম করে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম।

আগামী সম্মেলনের জন্য নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয়গুলি প্রস্তুতি-সম্মেলনে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে:

"(ক) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা, এবং শান্তিরক্ষা; যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং অস্ত্রসজ্জার প্রসারের বিরোধিতা করা, যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি ও জাতিবিদ্বেষ প্রচার নিষিদ্ধ করা; শান্তি-আন্দোলনের জন্য স্বাধীনতা দাবি; আণবিক, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; বে-সামরিক জনগণ ও নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণ ও ধ্বংসের বিরোধিতা করা। আন্তর্জাতিক আইন-গুলি পালন করার জন্য জোর দেওয়া।
(খ) সমভিত্তিতে পরস্পরের পক্ষে উপযোগী, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিকাশ করা; বাণিজ্যিক বাধা-নিষেধের বিরোধিতা করা; জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন; শিশু ও নারীদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা।
(গ) জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জা এবং আক্রমণের ঘাঁটিরূপে জাপানকে ব্যবহারের বিরোধিতা।
(ঘ) ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে কোরিয়া প্রশ্নের মীমাংসা এবং ভিয়েৎনাম, লাও, কাম্বোডিয়া, মালয় এবং অন্যান্য স্থানসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত সমাধান।"

উক্ত বিষয়গুলি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের কাছে আজ অত্যন্ত জরুরি। ভারতের জনসাধারণেরও তাই তাঁদের শান্তির মহান ঐতিহ্য নিয়ে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন। ভারতের চারদিকে যুদ্ধাবস্থা, ভারতের কাঁচামাল থেকে শুরু করে নানা সম্পদের উপর সমরলিপ্সুদের হস্তক্ষেপ, পাক-ভারত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতে যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি, ভারতের অর্থনৈতিক সংকট, সব-কিছুই ভারতের জনগণের শান্তি ব্যাহত করছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি, ও যুদ্ধের স্বপক্ষে মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস নানাভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক বিনিময় বিভিন্ন দেশের ভিতর আজও প্রসার লাভ করতে পারছে না।
তাই ভারতের জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহা-সাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলনে। ভারতীয় প্রস্তুতি-কমিটির নেতৃত্বে এবং শান্তি-সংসদ ও অন্যান্য সর্বপ্রকার গণসংগঠন ও বিশিষ্ট জননায়ক, চিন্তানায়কদের সহ-যোগিতায় গড়ে উঠছে প্রাদেশিক প্রস্তুতি-কমিটি; জনসাধারণের ভিতর এশিয়ার শান্তি-সম্মেলনে ঘোষণাপত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এশিয়ার শান্তি সংহত করছে।

লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অধিকতর অংশগ্রহণ ও ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় ভারত তার নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তিরক্ষায়। ভারতবর্ষের শক্তি এই মহান কর্তব্য সাধন করতে পারে।

প্রস্তুতি-সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের ভাষায় আমরাও আহ্বান জানাই, "শান্তির জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া অপেক্ষা করা যায় না। শান্তিকামী জনগণের ঐক্যের ভিতর দিয়াই শান্তিকে জয় করিতে হইবে।

যদি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করা যায়, তবে তাহাতে বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপুল সাহায্য হইবে। আসুন, আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে এবং আরও ব্যাপক ভিত্তিতে মিলিত হই। আসুন, আমরা দৃঢ়চিত্তে একযোগে সংগ্রাম করি, আসুন, শান্তিরক্ষার মহান দায়িত্ব আমরা আমরা আরও দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করি।

আক্রমণ ও যুদ্ধের পাশবিক শক্তিগুলির পরিবর্তে মানবিক যুক্তি এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের যে জয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

হরিদাস নন্দী

শারদীয় পরিচয়

এ-বছরে শারদীয় 'পরিচয়' মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে। এ-সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখবেন : বিনয় ঘোষ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, প্রেমচান্দ্, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি; গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক; কবিতা : বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মৃগাঙ্ক রায় প্রভৃতি। দেশী ও বিদেশী বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানি ছবি এ-সংখ্যার এক বিশেষ আকর্ষণ হবে। আয়তন : দু-শো পাতারও বেশি, দাম দেড় টাকা। এজেন্টরা ৩১শে আগস্টের আগেই অর্ডার পাঠান।